প্রেত-তর্পণ।

উপন্যাস।

শ্রীসুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য

প্রণীত।

প্রথম সংস্করণ।

কলিকাতা,

৫০।১ কালীপ্রসাদ দত্তের ষ্ট্রীট, "সাহিত্য-প্রচার" কার্য্যালয় হইতে

শ্রীনবকুমার দত্ত কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

১৩১৪।

মূল্য ১॥০ দেড় টাকা।

৫০।১ নং কালীপ্রসাদ দত্তের ষ্ট্রীট, "অবসর প্রেস" হইতে

শ্রীপঞ্চানন মিত্র দ্বারা মুদ্রিত।

প্রেত-তর্পণ।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

হরিদ্রাগ্রামের দক্ষিণ পাড়ায় অজিতনাথের ক্ষুদ্র বাড়ী। বাড়ীর সম্মুখে খরবাহিনী স্রোতস্বতী ইচ্ছামতী নদী,—দুইকূল পরিপ্লাবিত—যৌবন-মদে উচ্ছ্বসিত; উপরে বিশাল আকাশ ঘন শ্যাম মেঘে সমাচ্ছন্ন। বর্ষণের আর অধিক বিলম্ব নাই।

নদীর দিকের জানেলা উন্মুক্ত করিয়া, অজিতনাথ মধ্যাহ্ন কালের নিঃসঙ্গ দিবা অতিবাহিত করিতেছিল।

অজিতনাথের বয়স পঞ্চবিংশতিবর্ষ উত্তীর্ণ করিয়াছে,—এখনও যৌবনের শত আশা তাহার বক্ষে কম্পিত হয়, এখনও নিঃসঙ্গ শয়নে তাহার প্রাণ ব্যাকুলিত হইয়া নিশি যাপন করিয়া থাকে। সংসারে সে, একা।

বাল্যকালেই তাহার পিতা মাতা তাহাকে সংসারের কোলে রাখিয়া স্বর্গধামে চলিয়া গিয়াছিলেন, এবং দূর গ্রামবাসী মাতুলালয়ে শিশুকালে প্রতিপালিত ও শিক্ষিত হইয়া তারপরে নিজের বাড়ী হরিদ্রাগামে আগমন করতঃ জনশূন্য ক্ষুদ্র আবাসে নিঃসঙ্গ অবস্থায় জীবনের দিনগুলা অতিবাহিত করিতেছিল।

অজিতনাথ উন্মুক্ত গবাক্ষ পার্শ্বে শয্যায় শয়ন করিয়া মেঘাচ্ছন্ন প্রকৃতির কোলে, উচ্ছ্বসিত ইচ্ছামতীর দিকে শূন্য নয়নে চাহিয়া চাহিয়া কি দেখিতেছিল। মেঘাচ্ছন্ন নিস্তব্ধ মধ্যাহ্ন,—জনশূন্য বাড়ী,—সর্ব্বত্র, নিস্তব্ধ।

সহসা আকাশে ঝড় উঠিল,—শ্রাবণ মাস; ইচ্ছামতীর স্ফীত বারি আকুল হইয়া নাচিতে লাগিল। ঝড়ের সঙ্গে জলও আরম্ভ হইল।

একখানা ছই ঘেরা ক্ষুদ্র তরণী সেই আকুল-উচ্ছ্বসিত বারি-রাশির মধ্যে হাবু ডুবু খাইতে খাইতে আসিতেছিল,—মাঝীগণ প্রাণপণে নৌকা রক্ষার চেষ্টা করিতেছিল;—নৌকা প্রায় কূলে আসিয়াছে কিন্তু কূলের আবেগ-কম্পিত জলের আছাড়ে নৌকা আর ঠিক থাকিল না, উলটাইয়া পড়িয়া গেল। মাঝীরা হাহা-কার করিয়া উঠিল।

অজিতনাথ শয্যা হইতে লাফ দিয়া উঠিয়া গৃহের বাহির হইল, এবং ছুটিয়া নদীতীরে গমন করিয়া, নৌকোত্তলন-রত ব্যতিব্যস্ত বিপন্ন মাঝীদিগকে জিজ্ঞাসা করিল,—"নৌকায় কি আরোহী আছে?"

মাঝী বলিল,—"ছিল বাবু। দুইজন স্ত্রীলোক। নৌকা

ঠিক্‌রাইয়া যাওয়ায়,—একজনকে পাওয়া যাচ্ছে না, একজনকে পাওয়া যাচ্ছে।

অজিতনাথ আর মুহূর্ত্ত বিলম্ব না করিয়া, জলে ঝাঁপ দিয়া পড়িল। যেখানে নৌকা উল্‌টাইয়াছিল, তাহারই পার্শ্বে জলতলে এক সুন্দরী রমণী পড়িয়া আছে। অজিতনাথ উচ্ছ্বসিত জলরাশির মধ্য হইতে অনেক কষ্টে রমণীকে উত্তোলন করিয়া তীরে লইয়া আসিল।

আর একটি রমণী মাঝীগণ কর্ত্তৃকই তীরে নীত হইয়াছিলেন। তিনি বয়সে প্রাচীনা,—নৌকার ছইয়ের মধ্যেই বাধিয়া ছিলেন, মস্তকে সামান্য একটু আঘাত লাগিয়া যে একটু ব্যথা পাইয়াছেন মাত্র। কিন্তু কন্যার অদর্শনে কূলে দাঁড়াইয়া বর্ষণাপ্লুত ধরণীর বক্ষে হাহাকার তুলিতেছিলেন। মাঝীগণ হয় উপস্থিত বিপদে, দিশেহারা হইয়া, নয় অনবধানতা বশতঃ জলমগ্না রমণীর সন্ধান করিতে পারে নাই। অজিতনাথ রমণীকে তুলিয়া তীরে আনিল।

রমণী যুবতী, কিন্তু কৈশোরের সীমা সবে মাত্র উত্তীর্ণ হইয়াছে,—বোধহয় বয়সে পঞ্চদশী হইবে। শিশির-স্নাত পদ্মিনীর মত যুবতীকে কূলে রক্ষা করিয়া অজিতনাথ একবার তাহার দিকে চাহিয়া দেখিল, তখনও ঝড় জলের বিরাম হয় নাই। বর্ষীয়সী রমণী বলিলেন,—"আমার নীরদ কি নাই?"

অজিত বলিল,—"আছে মা, শুশ্রূষা করিতে পারিলে বাঁচিতে পারিত। নিকটেই আমার বাড়ী, যদি আপত্তি না থাকে, এখনই সেখানে চলুন।"

রমণী কাঁদিয়া বলিল,—"চল বাবা, সংসারে আমার আর কেহ নাই। নীরদ আমার অন্ধের যষ্টি।"

মাঝীদের সাহায্যে অজিতনাথ মূর্চ্ছিতা যুবতীকে বহন করিয়া বাড়ী লইয়া গেল। মাতাও সঙ্গে সঙ্গে গেলেন।

যে ঘরে অজিতনাথ শয়ন করিয়াছিল, মূর্চ্ছিতা যুবতীকে সেই গৃহে লইয়া গিয়া সেই শয্যায় শয়ন করাইল।

যুবতীর নাম নীরদা। নীরদা তখনও মূর্চ্ছিতা। পরিধেয় বস্ত্র ভিজিয়া গাত্রে ঘনিষ্ঠ সংলগ্ন হইয়া গিয়াছে, তাহাতে বর্ণোজ্জ্বল-কান্ত-কান্তি ফুটিয়া বাহির হইতেছে; দেহ ঋজু, যুক্তকেশপাশ মুক্ত করিয়া দেওয়া হইল,—খট্টার উপর হইতে সেই নীবিড় ঘন কৃষ্ণ সংক্ষুব্ধ কেশরাশি আসিয়া মেঝেয় পড়িয়া বিন্দু বিন্দু জল নিষেক নিরত হইল। উপরে যেমন নবীন কৃষ্ণ মেঘের ঘটা, নিম্নে তেমনি গাঢ় কৃষ্ণ কেশের ছটা,—উপরে যেমন মেঘের কোলে সৌদামিনীর সোণার কিরণ, নিম্নে তেমনি সেই কেশকলাপের তলে প্রোজ্জ্বল চম্পক বরণ। রমণীর নয়ন-পদ্ম নিমীলিত,—নব-নলিন-সম্পুট অধর যুগল স্থির।

অজিতনাথ পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন, নীরদার উদরে জল প্রবেশ করে নাই। বুঝিলেন, সন্তরণে অনেকক্ষণ আত্মরক্ষার চেষ্টা করিয়া, সবে মাত্র অবসন্ন হইয়া ডুবিয়াছিল। তখনই গৃহান্তর হইতে শুষ্ক বস্ত্র আনিয়া, বর্ষীয়সীর হস্তে প্রদান করিয়া বলিলেন,—"আমি বাহিরে যাই, ভিজা কাপড় খুলিয়া ফেলিয়া এই খানা পরাইয়া দিন।"

তাহাই হইল। তার পরে অগ্নি জ্বালিয়া সেক দেওয়া হইতে লাগিল। অজিতনাথ মূর্চ্ছিতা নীরদার শিয়রে বসিয়া যথোচিত শুশ্রূষা করিতে লাগিল।

অনেকক্ষণ কাটিয়া গেল। অনেকক্ষণ পরে, মূর্চ্ছিতা নীরদা

এক দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিল। অজিতনাথ আনন্দোৎফুল্ল নয়নে নীরদার মাতার দিকে চাহিয়া বলিল,—"ভয় নাই, নিশ্বাস ফেলিয়াছেন।"

নীরদার মাতা নিয়ে বসিয়া কাঁদিতেছিলেন, তাড়াতাড়ি উঠিয়া নীরদার মুখের নিকটে আসিয়া দাঁড়াইলেন। নীরদা সেই সময়ে নয়ন মেলিয়া চাহিল। সম্মুখে মাতাকে দেখিয়া, পুনরপি নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিল,—"মা, আমি কোথায়?"

মাতা তাড়াতাড়ি অঞ্চলে কন্যার মুখ মুছাইয়া বলিলেন,— "মা, আমরা এখন অতি দয়াশীল ভদ্র লোকের ঘরে।"

নীরদা উঠিয়া বসিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না। অজিতনাথ ততক্ষণ দূরে সরিয়া গিয়াছিল।

ক্ষীণ কণ্ঠে নীরদা বলিল,—"মা, আমি এত দুর্ব্বল হইলাম কেন? আর এখানেই বা কেন আসিলাম?"

নীরদারমাতা নৌকারোহণ ও জলমগ্নের কথা বলিলেন। নীরদা নীরবে রহিল। অজিত রন্ধন গৃহে গমন করিল, এবং একবাটী দুগ্ধ গরম করিয়া আনিয়া, নীরদারমাতার হস্তে দিয়া বলিল,—"উহাঁকে পান করিতে দিন।"

নীরদা একবার অজিতনাথের দিকে ক্ষীণ দৃষ্টিতে চাহিল। তারপরে অতি কষ্টে ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিয়া, মস্তকে কাপড় টানিয়া দিল। অজিতনাথ বাহির হইয়া গেল।

দুগ্ধপান শেষ হইলে, নীরদারমাতা অজিতকে গৃহ মধ্যে ডাকিয়া বলিল,—"বাবা, তোমার যত্নে—তোমার চেষ্টায় নীরদা আমার জীবন পাইল, এখন আমাদের যাবার কি?"

"বেলা আর নাই, সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে;—এসময় আশ্রয়

ত্যাগ করা সুযুক্তি নয়। দেশের অবস্থা এখন বড় খারাপ : চোর ডাকাতে দেশ পূর্ণ।"

নীরদারমাতা বলিলেন,—"আমরা অধিক দূর যাব না। এই হরিদ্রাগ্রামের পাশের গ্রাম কাঞ্চন নগরে যাব।"

অ। কাঞ্চন নগরে কার বাড়ী যাবেন?

না-মা। কৃষ্ণগোবিন্দ সমাদ্দারের বাড়ী।

অ। সেখানে কেন?

না-মা। কৃষ্ণগোবিন্দ আমাদের গাঁয়ের জমিদার,—গাঁয়ে বর্গীর উপদ্রব হবে ব'লে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। তাই যে, যে দিকে পাইতেছে, পলায়ন করিতেছে। অনেকেই জমিদারের বাড়ীতে আশ্রয় লইতেছে। আমরাও তাই যাইতেছি।

অ। আপনাদের বাড়ী কোথায়?

না-মা। সাতগাছিয়া।

অ। সাতগাছিয়া এখান হইতে অনেক দূর,—শুনিয়াছি, সাতগাছিয়ায় অনেক লোকের বসতি আছে, অনেক ভদ্রলোকও আছেন,—বর্গীর ভয়ে সকলেই কি পলায়ন করিতেছে?

না মা। না পলাইয়া উপায় কি? বর্গীর সঙ্গে কে পারে?

অ। কে পারে? গ্রামের লোক একত্র হইলে পারে,—গ্রামের পাশের লোকদিগকে একত্র করিয়া পারে,—পলাইয়া কত দিন চলিবে?

নীরদা একবার তাহার টানা নয়নের কটাক্ষে অজিতনাথের মুখের দিকে চাহিল। নীরদারমাতা বলিলেন,—"সেরূপ চেষ্টা কেহ করে না। করিলে কি হয়, বলা যায় না।"

অজিতনাথ বলিল,—"ঐক্য হইলে কি না হয়? বর্গীরা

কোন্ মুল্লুক থেকে আসে, আর আমরা আমাদের দেশে বসিয়া তাহাদের দমন করিতে পারি না! তবে বাঙ্গালী পলায়নে যেমন মজবুদ, ঐক্য হইতে তেমন নয়।"

নী-মা। যাক্, বাবা,—এখন আমাদের যাবার ব্যবস্থা কর। রাত্রি জ্যোৎস্নাময়ী,—নদীর একটা বাঁক ঘুরিলেই কাঞ্চননগর,—সহজেই পঁহুছান যাইবে।

অ। আপনি বোধহয় কাঞ্চননগরে আরও আসিয়াছেন?

নী-মা। হাঁ, অনেকবার আসিয়াছি। কৃষ্ণগোবিন্দ বাবু আমাদের শিষ্য।

অ। সংসারে আপনার আর কে আছে?

নী-মা। আর কেহ নাই—এই একমাত্র কন্যা। কর্ত্তা কন্যাটিকে কুলীন ক'রে স্বর্গারোহণ করেছেন,—সে আজ পাঁচ বৎসরের কথা। জামাইটিরও আর সন্ধান নাই।

অ। যদি নিতান্তই না থাকা হয়, তবে চলুন ঘাটে যাই। আপনাদের যাহারা লইয়া আসিয়াছিল, যদি তাহারা নৌকা লইয়া ঘাটে থাকে, সেই নৌকাতেই যাইবেন, নচেৎ একখানি নগদা নৌকা ভাড়া করিয়া দিব।

নীরদা উঠিয়া দাঁড়াইল, নীরদারমাতা নীরদাকে সঙ্গে লইয়া গৃহের বাহির হইলেন, অজিতনাথ তাঁহাদের পশ্চাদনুবর্ত্তী হইল। তখন সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছিল।

অজিতনাথ নদীকূলে গিয়া কোন নৌকারই সন্ধান পাইল না। তখন নীরদারমাতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখন কি করা যায়, নৌকাও একখানাও দেখা যাইতেছে না। রাত্রিটা আমার বাড়ীতে কাটাইলে হইত।"

নীরদারমাতা স্বীকৃত হইলেন না। তাঁহার বুঝি একটু ভয় হইয়াছিল, সোমত্ত মেয়ে লইয়া অন্য মানবহীন এক বলিষ্ঠ যুবকের আশ্রয়ে থাকা কর্ত্তব্য নহে।

অজিতনাথ নৌকার জন্য কিঞ্চিৎ বিব্রত হইয়া পড়িলেন। তখন স্নানের ঘাটের উপরে বৈষ্ণবপাড়া হইতে ম্লান মৃৎ প্রদীপের মৃদু আলোক-ছটার সহিত কোন্ এক গায়কের সুকণ্ঠ হইতে গীত হইতেছিল,—

সন্ধ্যা হ'ল ঘরে চল রইলে কেন ভুলে!

স্তব্ধ সায়াহ্নে নদী-প্রান্তবর্ত্তী কোন্ সুকণ্ঠের মধুর কণ্ঠস্বর মুক্ত প্রকৃতির মধ্যে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িতেছিল, এবং তাহার প্রত্যেক ঝঙ্কারে একটি অস্পষ্ট বেদনার প্রতিধ্বনি, শান্ত সন্ধ্যার মর্ম্মবাহী সংযত আকাঙ্ক্ষার একটি অত্যন্ত মৃদু কল্লোল শ্রোতার সমবেদনা ও দীর্ঘ নিশ্বাস আকর্ষণ করিতেছিল।

উপরে নীল আকাশের পূর্ব্বকোণে পূর্ণিমার চন্দ্র উঠিয়া সোণার কিরণে জল স্থল ব্যাপ্ত করিল,—ইচ্ছামতীর উচ্ছ্বসিত বারিরাশি কল কল তানে বহিয়া যাইতেছিল,—জনশূন্য সেই নদীতটে চন্দ্রকিরণ মাখিয়া অজিতনাথ, নীরদা আর নীরদারমাতা দাঁড়াইয়া,—সহসা একখানা নৌকা ঘাটে আসিয়া উপস্থিত হইল। একজন মাঝী উঠিয়া আসিয়া, নীরদার মাতাকে অভিবাদন করিল। নীরদারমাতা সহর্ষে বলিলেন,—"এই যে, রতন দেখ্ছি। এতক্ষণ তোমরা কোথায় ছিলে?"

রতন বলিল,—"আজ্ঞে আমরা ঐ ওপারের শিমুল তলায় গিয়ে রান্না ক'রে খেয়ে এলাম।"

রতন নীরদাদিগের নৌকার মাঝী। নীরদার মাতা কন্যাকে বলিলেন,—"নৌকায় চল্ মা।"

নীরদা সেই প্রফুল্ল জ্যোৎস্নালোকে অজিতনাথের প্রফুল্ল মুখের দিকে একবার করুণ প্রীতিপূর্ণ চাহনিতে চাহিল। অজিত সেই চাহনির অর্থ বুঝিল, কেবল কৃতজ্ঞতা।

তারপরে মায়ে-ঝিয়ে নৌকারোহণ করিল। অজিত বলিল,—"তবে আমি যাই?"

নীরদারমাতা বলিলেন,—"এস বাবা, আশীর্ব্বাদ করি, সুখে থাক।"

রতন মাঝী নৌকা খুলিয়া দিল। ইচ্ছামতীর খরস্রোতে নৌকা নাচিতে নাচিতে চলিল,—নীরদা উৎকর্ণ হইয়া শুনিল, নদীতট হইতে অপরিচিত অজিতের সুন্দর কণ্ঠে সুমধুর তানে গীত হইতেছে,—

নিকুঞ্জ বিহারী মধুমুর অরি
হৃদয়-মোহন কালিয়া,
ঘুচাও স্বপন শমনবারণ
হৃদয়-নিকুঞ্জে আসিয়া।

দীনবন্ধু তুমি দীন হীন আমি
আছি সে ভরসা করিয়া,
দাওহে অভয় ও বিধুবদনে
কনক-কিরণে হাসিয়া।

জগদালো করা তব রূপ রাশি
দেখাও করুণা করিয়া,

আমি রাখিব হৃদয়ে তোমার মুরতি
জীবনে মরণে গাঁথিয়া।

জেগেছে জ্যোছনা বহিছে সমীর
অদূরে ডাকিছে পাপিয়া,
তোমারি কারণে আছি রাধানাথ
একূলে আকুলে জাগিয়া।

হাসি হাসি মুখে এস মনোচোরা
রেখেছি হৃদয় খুলিয়া,
চাঁদের কিরণ পরাণে রেখেছি
গগন হইতে পাড়িয়া।

তখনও নীরদাদের নৌকা দিগন্তের কোলে মিশে নাই, তখনও গায়কের সুকণ্ঠ-নিঃসৃত স্বরের সহিত গানের কথাগুলি নীরদাদের নৌকায় পঁহুছিতেছিল, নীরদা উৎকর্ণ হইয়া তাহা শুনিতেছিল,—কিন্তু কিয়ৎক্ষণ পরে আর শোনা গেল না। তখন নীরদা সমবেদনার একটা ক্ষুদ্র শ্বাস পরিত্যাগ করিয়া মনে মনে বলিল,—"অমন আকুল-আহ্বানে, অমন জ্যোৎস্নামাখা প্রাণে, যে আপন ঢালিয়া না দেয়, সে আর কেমন কঠিন!"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

কাঞ্চন নগরে কৃষ্ণগোবিন্দ সমাদ্দার সুবিস্তৃত জমিদারির মালিক এবং তাঁহার প্রভূত অর্থ ও তাৎকালিক নিয়মানুসারে বহুল জমিদারি পাইক এবং কিছু সৈন্য সামন্তও ছিল,—বলা কর্ত্তব্য, আমাদের এই আখ্যায়িকার সময় প্রায় চারিশত বৎসরের আগে।

কৃষ্ণগোবিন্দ সমাদ্দারের সুবিস্তৃত প্রাসাদের পশ্চাদ্ভাগে সুউচ্চ প্রাচীর আবেষ্টিত এক মনোহর উদ্যান। উদ্যানে ফল-পুষ্পের ছোট বড় বিবিধ বৃক্ষ রোপিত। মধ্যস্থলে এক ক্ষুদ্র দীর্ঘিকা,—দীর্ঘিকার নাম রামসাগর। কৃষ্ণগোবিন্দের পিতার নাম ছিল, রামগোবিন্দ সমাদ্দার। তাঁহারই নামে এই দীর্ঘিকার নাম রক্ষা করা হইয়াছে।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে,—সেই দীর্ঘিকার নীলজলের উপরে পাষাণ বেদিকায় দুইটি সুন্দরী যুবতী বসিয়া গল্প করিতে-ছিল। সান্ধ্যফুল্ল কুসুমের গন্ধ বহিয়া আনিয়া গন্ধবহ যুবতীদ্বয়ের প্রীত্যর্থে তাহাদের নিকট ঢালিয়া দিতেছিল, এবং চন্দ্রদেব নীল-আকাশে বসিয়া চন্দ্রিকা ঢালিয়া তাহাদের সোণার বরণে রঙ্গ ফলাইতেছিলেন।

পাষাণ বেদিকার উপরে বসিয়া যে দুইটি তন্বী যুবতী গল্প করিতেছিল, তাহার একটি নীরদা, অপরা কৃষ্ণগোবিন্দের কন্যা মহামায়া।

মহামায়া বলিল,—"যথার্থই তোমায় আমি ভালবাসি, তুমি

আমাদের গুরু কন্যা, আমি কিন্তু তোমাকে তেমনটি ভাবিতে পারি না,—সখীর মত, ভগিনীর মত, ভালবাসার মত ভাবি।”

নীরদা তাহার কোমলগণ্ডে অঙ্গুলীর টীপ দিয়া বলিল,—“আমিও তোমাকে তেমনি ভালবাসি। কিন্তু যদি জলে ডুবে মরিতাম, তবে আর দেখা হইত না।”

ম। বালাই তোমার শত্রু মরুক,—কিন্তু তোমার কথা শুনে, আমার যেন লজ্জা হ’চ্চে, সেই অপরিচিত পুরুষ জল থেকে তোমাকে বুকে ক’রে তুলে নিয়ে বাড়ী গেল,—তুমি তখন অজ্ঞান, ছিঃ।

নী। কিন্তু আমার হাত ত ছিল না,—জ্ঞান্ থাক্‌লে কি তার ঘাড়ে চাপ্‌তাম?

ম। সে লোকটাকে আমি চিনি।

নী। তার নাম অজিতনাথ।

ম। আগেও ব’লেছ,—বাড়ী হরিদ্রাগ্রামে, তাও ব’লেছ,—সেই জন্যই বল্‌ছি, আমি তাকে চিনি।

নী। তুমি তাকে কোথায় দেখেছ?

ম। আমাদের বাড়ী। শুনেছি, অজিতনাথ ব্রহ্মচারী। সে অবিবাহিত।

নী। অবিবাহিত হইতে পারে, কিন্তু ব্রহ্মচারী কিসে জানিলে? ব্রহ্মচারীর মত গেরুয়া কাপড় চোপড় ত নাই?

ম। শুনেছি। সে ব্রহ্মচর্য্য সাধনে নিরত। অজিতনাথ দেশের কল্যাণ জন্য অনেক খাটে—সে খুব বীর। সময়ে সময়ে আমাদের বাড়ী আসে,—বাবা তাকে যথেষ্ট ভাল বাসেন, আর খাতির-যত্ন করেন।

নী। তার সঙ্গে তোমার আলাপ পরিচয় আছে ?

ম। দূর! আমিত আর জলে ডুবিনি যে, তার কাঁধে উঠে, তার বাড়ী গিয়েছি।

নী। (মৃদু হাসিয়া) সে অপরাধটা আমারই হ'য়েছে বটে। যাক্, এখন চল বাড়ীর মধ্যে যাই।

ম। হাঁ, চল যাই। বাগানের ওপাশে ঐ বকুল গাছের দিকে অনেক গুলি রজনীগন্ধা ফুটেছে, তুলিয়া আনি,—তুমি যাবে না, এখানে একটু ব'স্‌বে ?

নী। আমি বসি, তুমি ফুল তুলে আন।

রাজহংসীনিন্দিত গমনে মহামায়া উঠিয়া গেল। নীরদা জ্যোৎস্নালোকে চাহিয়া দেখিল, মহামায়া দূরে বকুলগাছের আড়ালে গিয়া, রজনীগন্ধা ফুলের গাছের সারির নিকটে বসিয়া পড়িল,—তারপরে ভাল করিয়া আর দেখা গেল না, সেখানে বসিয়া কি করিতে লাগিল। তবে মনে বুঝিল, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুষ্প বৃক্ষের শ্রেণী মধ্যে বসিয়া তাহাদিগকে ফুল শূন্য করিতেছে।

সহসা নীরদার পশ্চাদ্দিকে মনুষ্য পদ শব্দ হইল। সে চমকিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। চাহিয়া দেখিল, বহু মূল্যবান্ সুরুচি সম্পন্ন বস্ত্রালঙ্কারে ভূষিত এক অপরিচিত পুরুষ মূর্ত্তি তাহার পশ্চাদ্ভাগে দাঁড়াইয়া আছে।

নীরদা চীৎকার করিতে যাইতেছিল, পুরুষ হস্তোত্তলন করিয়া অপার্থিব, উদাস-গম্ভীর স্বরে বলিলেন,—"নীরদা, আমি তোমার অনিষ্ট করিতে আসি নাই, সমধিক ইষ্ট করিতেই আসিয়াছি,—স্থির হইয়া আমার কথা শোন।"

সে অপার্থিব মধুর গম্ভীর স্বর আশাপ্রদ ও ভয়নাশক। নীরদা কথঞ্চিত আশ্বস্ত হইয়া বলিল,—"আমার বড় ভয় হইতেছে, আপনি কে? চারিদিকে প্রাচীরাবদ্ধ এ বাগানে কি প্রকারে প্রবিষ্ট হইলেন? আপনার বেশ ভূষা বড় লোকের মত—আপনার কোমরে ছোরা, আপনি কে বলুন?"

পুরুষ বলিলেন,—"আমি এখন পরিচয় দিব না, তোমার ভাল করিব, আমার এক কাতর প্রার্থনা তোমাকে পূর্ণ করিতে হইবে।"

নীরদা আরও একটু দূরে সরিয়া গেল। বিস্ময়-চকিত স্বরে বলিল,—"আপনার কি প্রার্থনা আমি পূর্ণ করিব? আপনার অভিলাষ কি?"

পু। আমার অভিলাষ মন্দ নহে। আমি যাহা বলিব, তাহা কুত্রাপি প্রকাশ করিও না,—প্রকাশ করিলে তোমার অনিষ্ট হইবে। আমার অসাধারণ ক্ষমতা, আমার গতি ও দৃষ্টি সর্ব্বত্র। আমার সহিত তোমার সাক্ষাৎ হইয়াছে সে কথাও কাহাকে বলিও না।

নী। ক্রমেই আমার সন্দেহ ও ভয় বাড়িতেছে,—আমি মহামায়াকে ডাকি।

পু। ভয় নাই,—আমি যাহা বলিলাম মনে রাখিও। এখন আমার কথা শোন।

নী। তবে ব'লে ফেলুন। আমি আর দাঁড়াইতে পারিতেছি না। আপনি কি আমায় আগে চিনিতেন?

পু। চিনিতাম বৈ কি—আমি সবাইকে চিনি।

নী। তবে বলুন,—কি কথা বলিবেন।

নীরদা চাহিয়া দেখিল, ছোরার সম্মুখে বাটা বক্ষে মাথা,—তাহার রক্ত

পু। তুমি ও মহামায়া একটু পূর্ব্বে অজিতনাথের কথা বলিতেছিলে, না?

নী। হাঁ, বলিতেছিলাম,—আপনি তখন কোথায় ছিলেন?

পু। যেখানেই থাকি, আমি তোমাদের কথা সব শুনিয়াছি,—আগেইত বলিয়াছি, আমি সকলের সব কথাই শুনিতে পাই। এখন শোন,—অজিতনাথের সম্বন্ধে তোমাকে কিছু করিতে হইবে।

নী। আমি? আমি তার সম্বন্ধে কি করিব?

পু। আমি তোমার উপকার করিব—তোমাকে অনন্যসাধারণ ক্ষমতা দিব—আমার কথা শোন; নিকটে সরিয়া আইস, আমি যা বলি, তা কর.—অজিতনাথ সম্বন্ধে কি করিতে হইবে, আপনিই বুঝিতে পারিবে।

যেন কোন অজ্ঞানা আকর্ষণের বলে নীরদা ধাঁ করিয়া সেই পুরুষের সম্মুখীন হইয়া পড়িল। নতজানু হইয়া বলিল,—"কি করিতে হইবে বলুন?"

তখন সেই পুরুষ তাঁহার কটিদেশবিলম্বিত কোষ হইতে একখানি তীক্ষ্ণধার ছোরা টানিয়া বাহির করিয়া, নীরদার হস্তে প্রদান করিলেন। নীরদা চাহিয়া দেখিল, ছোরার সর্ব্বাঙ্গে কাঁচা রক্তমাখা,—তাহার হস্তও রক্ত-রঞ্জিত হইয়া গেল।

পুরুষ জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তোমার কি ইচ্ছা হইতেছে?"

নী। আমার অদম্য ইচ্ছা—আমি ব্রহ্মচারী অজিতকে এই ছোরার আঘাতে এখনই হত্যা করি। এ ইচ্ছা এতই প্রবল হইতেছে যে, আমি কিছুতেই আত্ম সংবরণ করিতে পারিতেছি না।

পু। অজিতনাথকে হত্যা করিতে হইবে। ঐ ছোরা তাহারই

হত্যাকার্য্য সাধনের জন্য দীর্ঘ দিন বহিয়া বেড়াইতেছি—পারিবে?

নী। হাঁ্যা—বোধ হয় পারিব।

পু। তবে আমি যাই,—প্রয়োজন হইলে, তোমাকে দেখা দিব।

নী। এ ছোরা কোথায় থাকিবে?

পু। আমাকে দাও, আমার কাছে থাকুক,—প্রয়োজন হইলে আমিই দিব।

নীরদা ছোরা ফিরাইয়া দিল, তখনও তাহার হাতে রক্তের দাগ ছিল,—সে শিহরিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"এ রক্ত কার?"

পু। আমার—সব বলিব।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

—০—

আকাশ নিস্তব্ধ, প্রকৃতি নিস্তব্ধ, দিগ্বধূ নিস্তব্ধ, কৃষ্ণপক্ষের নিশীথিনী নিস্তব্ধ—কেবল দিগন্ত বিস্তারী অন্ধকার বৃক্ষ লতা নদী তড়াগ পথ ঘাট সমস্ত আপন বিশ্বগ্রাসী ছায়ায় ঢাকিয়া লইয়া গম্ভীর ভাবে অবস্থান করিতেছিল।

চক্রধরপুরের ঝামাঘাটা নামক প্রসিদ্ধ শ্মশানে সেই ভীমান্ধকার ভেদ করিয়া এক চিতার আগুণ লক্ লক্ শিখায় আকাশ-পথে উঠিয়া যাইতেছিল, আর সেই প্রজ্বলিত চিতার অদূরে এক নির্বাপিত চিতার অর্দ্ধদগ্ধ কাষ্ঠগুলি ক্ষীণ আলোক তুলিয়া ভৈরব শ্মশানের অন্ধকার বিনাশেচ্ছায় যত্ন করিতেছিল।

শ্মশানতল-বিহারিণী ত্রিস্রোতা নদী কল কল রবে বহিয়া যাইতেছিল।

যে চিতার আগুন লহ লহ লোলজিহ্বা তুলিয়া দীপ্তিমান্ হইতেছিল, সেই চিতাগর্ভে একটি সুন্দর যুবকের দেহ দগ্ধ হইতেছিল। চিতার অদূরে সাত আটজন মনুষ্য দাঁড়াইয়া শবদাহ করিতেছিল—এবং তাহাদের আরও কিঞ্চিৎ দূরে তিনটি স্ত্রীলোক ও একটি পুরুষ বসিয়াছিল। তিনটি স্ত্রীলোকের মধ্যে যাহার বয়স সর্ব্বাপেক্ষা অল্প, সে বয়সে যুবতী, কুড়ি পার হয় নাই। যুবতী রোরুদ্যমানা। অপর দুই জনই প্রৌঢ়া। একজন বিবসা, আকুলা, শোক-বিধুরা, তথাপি কিঞ্চিৎ ধৈর্য্যশালিনী,—যে শব চিতায় দগ্ধ হইতেছিল, এই হতভাগিনী তাহারই জননী। আর রোরুদ্যমানা যুবতী তাহারই স্ত্রী, নাম বসন্তরাণী।

বসন্তরাণী স্বামীর সহিত সহমরণে যাইবে বলিয়া স্থিরসঙ্কল্প করিয়াছিল। কিন্তু গ্রামের লোক, পাড়ার লোকে আত্মীয়-স্বজন তাহাতে তাহাকে নিবৃত্ত করিয়াছে। স্বামি-বিরহ-বিধূরা সতীর প্রাণ কিছুতেই প্রবোধ মানিতেছিল না,—সাগর-সঙ্গম-ধাবিতা নদীর গতি বাঁধ দ্বারা স্থগিত করিলে, সে যেমন ফুলিয়া আরও বর্দ্ধিতবেগা হইয়া পড়ে, বসন্তরাণীরও তেমনই অবস্থা হইয়াছিল। তাহার শাশুড়ী তাই পুত্রশোকরূপ মহাবজ্র-বিদগ্ধ-হৃদয়া হইয়াও পুত্রবধূকে সান্ত্বনা করিবার জন্য কিঞ্চিৎ ধৈর্য্যশীলা হইয়াছিলেন। অপর স্ত্রীলোক, মৃতযুবকের পিসিমাতা, এবং যে পুরুষটি রমণী-গণকে রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছিল, সে গ্রামের বৃদ্ধ রামধন গোপ।

অবনতমুখী অপরাজিতার হৃদয়বেগ তখনও প্রশমিত হয় নাই। সে এক একবার চিতার দিকে কাতর-করুণ শোকের

দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিতেছিল,—চক্ষু বহিয়া জলধারা নির্গত হইতেছিল, আবার অবনত মুখে ভাবিতেছিল; আর ঘন ঘন অন্তঃস্থলভেদী দীর্ঘশ্বাসে ধরাতল বিদীর্ণ করিতেছিল।

বসন্তরাণীর শাশুড়ী সাশ্রুলোচনে, ভগ্নকণ্ঠে, শোকনিরুদ্ধ-স্বরে বলিলেন,—"মা, আর কেন বারে বারে চিতার দিকে চাহিতেছ? আমার আরও তিনটা ছেলে, এই শ্মশানের বক্ষে এমনি করিয়াই চিতার আগুনে পোড়াইয়াছি। আমি পোড়া-কপালী, সর্ব্বস্ব চিতার আগুনে পোড়াইয়াছি—তোমারও সিঁতার সিন্দুর হাতের লোয়া পোড়াইয়া গেলাম। আজ' আমার সর্ব্বস্ব গেল—সন্তান বলিতে আর থাকিল না। মা, আর চেও না—আর কেঁদ না। আমার মত পাষাণা হও—পাষাণে বুক বাঁধ।"

কাঁদিতে কাঁদিতে বসন্তরাণী বলিল,—"যখন এই শ্মশানে সব সন্তান পোড়াইয়াছ, তখন আমাকে কেন বাধা দিলে মা? আমি হতভাগিনী জীবন্ত থাকিয়া কেবল তোমার গলগ্রহ হইব। এখনও আমাকে বিদায় দাও—এখনও আমাকে অনুমতি কর—এখনও চিতার আগুন নিভে নাই; এখনও সোণা পুড়িয়া ছাই হয় নাই।"

বসন্তরাণীর শ্বশুড়ী বলিলেন,—"যদি তুমিও তোমার প্রাণের শান্তির জন্য সহমরণে যাও, তবে এ হতভাগিনীর কি উপায় হ'বে?"

বসন্তরাণী বলিল,—"সব জানি মা, সব বুঝি মা, কিন্তু কি করিয়া থাকিব? কাহার মুখ চাহিয়া থাকিব? কেনই বা থাকিব?—আমায় বলিয়া দাও মা, পাখী উড়িয়া গেলে খাঁচায় আর প্রয়োজন কি?"

বসন্তরাণীর শ্বা। বুঝি মা, কিন্তু হতভাগিনী আমি; আমি কাহাকে লইয়া—কাহার মুখ চাহিয়া থাকিব? ছেলেগুলিকে একটি একটি করিয়া যমের মুখে ডালি দিলাম। চোকের জল ঢালিতে ঢালিতে চক্ষুর দৃষ্টিহীন হইয়া উঠিয়াছে, প্রণারে নাড়ীছেঁড়া ধনেরা সব ফাঁকি দিয়া চলিয়া গেল। তাদের পাছে পাছে শক্তিও গেল—হাঁটু ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। এখন কে ক্ষুধায় এক মুঠা অন্ন দেবে? কে তৃষ্ণায় এক বিন্দু জল দেবে?

বসন্তরাণী। মা, সেই জন্যই এত আগুন বুকে করিয়াও চিতার আগুনে ঝাঁপ দিতে পারিতেছি না। তিনি গিয়াছেন,—আমি আছি, তিনি তাঁহার দাসীকে তাঁহার মাতার কাছে রাখিয়া গিয়াছেন; যদি তাঁহার মাতার সেবার জন্য না থাকি, তবে যদি তিনি রাগ করেন, এই ভয়ে চিতার আগুনে সেই শীতলস্পর্শ লাভ করিতে যাইতে পারিতেছি না। কিন্তু মা, আমার মনে হইতেছে, আমাকে লইয়া তোমার সুখ হইবে না।

বসন্তরাণীর শ্বা। ত্রিজগতে আর আমার কেউ নাই মা, এখন তুমিই আমার অন্ধের নড়ী। তুমি গেলে আমি অন্নজল অভাবেই মারা পড়িব।

যাহারা শবদাহ করিতেছিল, ঠিক্ এই সময়ে শবদেহ ভস্মে পরিণত হওয়ায়, তাহারা ডাকিয়া বলিল,—"দাহকার্য্য সমাপ্ত হইয়াছে, বউ মা আসিয়া অস্থি জলে দিন।"

শাশুড়ী-বউয়ে উঠিয়া শোকের দীর্ণ-বক্ষ চাপিয়া ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে চিতার নিকট উপস্থিত হইল। তখন ইন্ধনাভাবে চিতাবহ্নির প্রচণ্ডতা কমিয়া আসিয়াছিল। যাহারা দাহ করিতেছিল, তাহারা দগ্ধ-অস্থি বংশদণ্ডের সাহায্যে টানিয়া বাহির

কারণে, হতভাগিনী বসন্তরাণী কাঁদিতে কাঁদিতে স্বামীর অস্থি জলে ভাসাইয়া দিল।

তারপরে যথারীতি চিতাঙ্গারাদি ধৌত করিয়া সকলেই হরিধ্বনি করিয়া শ্মশান হইতে উঠিল। মধুর শান্তিপ্রদ হরিনাম শ্মশানের বাতাসে মিশিয়া যেন ভীতিপ্রদ ভাবে দিগন্তে ধ্বনিত হইল; সঙ্গে সঙ্গে বসন্তরাণীর শাশুড়ীর পুত্রশোকের হাহাকার-ধ্বনি দূরে গ্রামের নিশীথ-শয্যাশায়ী মানবের কর্ণে প্রবেশ করিয়া সুদূরপরাহত মরণের অমঙ্গলবার্ত্তা পঁহুছাইয়া দিল। বসন্তরাণীর স্তব্ধ শ্বাসের হাহাকার দূরের লোকে শুনিতে পাইল না,—কিন্তু সে আর চলিতে পারিতেছিল না। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডটা যেন তাহার পায়ের তলায় ঘুরিতেছিল। সমস্ত প্রকৃতিটা যেন যোট পাকাইয়া তাহার যথাসর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়া লইয়া আজি তাহাকে শূন্য করিয়া দিয়াছে। কাঁপিতে কাঁপিতে নয়নাসারে বক্ষঃস্থল বিধৌত করিতে করিতে সঙ্গিগণের সঙ্গে চলিয়া গেল।

তাহার সঙ্গিপুরুষগণ দুইতিনটা খড়ের আঁটিতে আগুন জ্বালিয়া আলো করিয়া চলিয়াছিল।

শ্মশান পরিত্যাগ করিয়া নদীতীরের পথ বহিয়া তাহারা পশ্চিম দিকে অনেক দূর চলিয়া গেল। তারপরে একটি সুন্দর ঘাটে নামিয়া সকলে স্নান করিল। তীরে অনেকগুলি খড় জ্বালিয়া আলো করিয়া রাখিয়াছিল।

কেহ স্নান করিয়া তীরে উঠিয়াছে, কেহ স্নান করিয়া জলে দাঁড়াইয়া মাথা মুছিতেছে, কেহ তখনও স্নান করিতেছে।

• বসন্তরাণী, বসন্তরাণীর শাশুড়ী ও তাহাদের আত্মীয়া এক এক ডুব দিয়া তীরে দাঁড়াইয়াছে; বৃদ্ধ রামধন গোপ তখনও

জলে ছিল,—হঠাৎ অতি তীব্রতর গতিতে গমনশীল অশ্বপদ-শব্দ তাহাদের কর্ণগোচর হইল। সশঙ্কিতচিত্তে পশ্চাৎ ফিরিয়া চাহিয়া দেখিল—কিন্তু গাঢ় অন্ধকারে অধিকদূর দৃষ্টি চলিল না। যতদূর আলো গিয়াছিল, ততদূরে কিছুই দেখা গেল না। তথাপি তাহারা ভীত-সঙ্কুচিত প্রাণে নদীর দিকে আরও একটু নামিয়া গেল। তাহাদের সঙ্গি-পুরুষগণের মধ্যে যাহারা তীরে উঠিয়াছিল, তাহারা বিস্ময়-চকিত দৃষ্টিতে শব্দ লক্ষ্য করিয়া চাহিয়া থাকিল।

অতি অল্পক্ষণের মধ্যেই এক বৃহৎ ও তেজস্বী অশ্বপৃষ্ঠে এক অনিন্দ্য-সুন্দরকান্তি যুবক তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। যুবকের মুখ পাংশুবর্ণ, দেহ কম্পিত—কিন্তু যোদ্ধৃবেশ; কটিতটে উন্মুক্ত তরবারি দোদুল্যমান্। অশ্বারোহীর অবস্থা দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়, অধিক দূরতর স্থান হইতে তাহারা ছুটিয়া আসিতেছে, এবং অশ্বারোহী বিপন্ন।

আলো ও মনুষ্যগুলি দেখিয়া অশ্বারোহী প্রাণপণে অশ্ববল্গা টানিয়া ধরিয়া কম্পিত-কণ্ঠে বলিল,—"ওগো, তোমরা কি আমায় রক্ষা করিতে পারিবে? আমার প্রাণ যায়।"

যে পুরুষগণ তীরে দাঁড়াইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে একজন বলিল,—"মহাশয়, আপনার কি হইয়াছে? নামিয়া পড়ুন, এখানে কোন ভয় নাই।"

শ্রান্তক্লান্ত অশ্ব হঠাৎ বল্গাকর্ষণে বেগ সামলাইতে না পারিয়া হুঁচোট খাইল,—শ্রান্তক্লান্ত অশ্বারোহী ঠিকরাইয়া মাটীতে পড়িয়া গেল। বহুদূর হইতে অশ্বারোহণে প্রাণপণ শক্তিতে ছুটিয়া আসায় নিতান্ত কাতর ছিল, তারপরে অশ্ব হইতে পড়িয়া যাওয়ায়

একেবারে অজ্ঞান ও মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। অশ্বটা আসিয়া দাঁড়াইল।

যাহারা স্নান করিয়া তীরে দাঁড়াইয়াছিল, তাহারা ছুটিয়া গিয়া যুবককে তুলিয়া আলোর কাছে লইয়া আসিল,—যাহারা জলে ছিল, তাহারাও এই ব্যাপারে তাড়াতাড়ি উঠিয়া তীরে আসিল।

যুবক সম্পূর্ণ হত-চৈতন্য। আলোর নিকটে আসিয়া সকলে উত্তমরূপে পরীক্ষা করিয়া দেখিল, যুবকের কোথাও বিশেষ কোন আঘাত-আদি লাগে নাই। কিন্তু তাহার চেহারা ও অস্ত্রের উপর চিহ্ন দর্শনে সকলেই চমকিয়া উঠিল,—তাহার কটিস্থ তরবারিতে বাদশাহী পাঞ্জা অঙ্কিত, এবং মস্তকের উষ্ণীষে বাদশাহী মুদ্রার ছাপ দেওয়া।

তাহার সুন্দর দেহকান্তি, মূল্যবান্ পোষাক, তেজস্বী অশ্ব, এবং এই চিহ্ন দেখিয়া সকলেই বিবেচনা করিল, এই যুবক নিশ্চয়ই কোন আমীর-ওমরাহের পুত্র হইবে; পথে কোন বিপদে পড়িয়াই ছুটিতেছিল।' তাহারা যত্ন করিয়া তাহার মূর্চ্ছাপনোদনের চেষ্টা করিতেছিল।

কিন্তু দুই দণ্ড অতীত হইতে না হইতে নিস্তব্ধ নিশীথিনীর বক্ষে কোলাহল তুলিতে তুলিতে দশ বার জন সশস্ত্র লোক অশ্বারোহণপূর্ব্বক সেই স্থলে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাদের ভীষণাকৃতি দেখিয়া সকলে কাঁপিয়া উঠিল। তাহাদের মস্তকে বড় পাকড়ী, হস্তে এক এক দীর্ঘ শড়কী। যুবককে সেই স্থলে দেখিয়া তাঁহারা অশ্ব হইতে নামিয়া পড়িল। এবং যুবকের মূর্চ্ছিত দেহের নিকটে আসিয়া একজন বলিল,—"হইয়াছে রে, শালা, এই স্থানে আসিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছে।"

আর একজন বলিল,—"নে, টেনে নে। এ শালারা কারা?"

অপর আর একজন বলিল,—"যাহারাই হোক্, তুই একটা শড়কীর খোঁচা দিয়ে ভুঁড়ী হস্‌কা।"

প্রথমে যে কথা কহিয়াছিল, সে বলিল,—"ওরে সে ছুঁড়ীটাও আছে রে।"

দ্বিতীয় ব্যক্তি বলিল,—আগে তারেই ধর্।"

একজন ছুটিয়া গিয়া বসন্তরাণীকে চাপিয়া ধরিল। বসন্তরাণী চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। বসন্তরাণীর শ্বাশুড়ী প্রাণভেদী স্বরে কাঁদিয়া উঠিল। রামধন গোপ বলিল,—"বাবা, তোমরা যারাই হও, উহাঁকে ছাড়িয়া দাও, ইনি বড় শোকাতুরা, ইহাঁর স্বামীর আজ, মৃত্যু হইয়াছে,—তাঁহাকে দাহ করে এই সবে স্নান করে উঠ্‌ছেন। দয়া কর—উহাঁকে ছুয়োনা।"

যে ধৃত করিয়াছিল, সে হাসিয়া বলিল,—"শালা. বদমায়েসী করিতে হইবে না। এ কে, তা আমরা জানি।"

আর মুহূর্ত্ত বিলম্ব করিল না, বসন্তরাণীকে লইয়া গিয়া অশ্বে উঠিয়া পড়িল। বসন্তরাণী মূর্চ্ছিতা হইয়া তাহার অঙ্কে ঢলিয়া পড়িল। অপর একজন মূর্চ্ছিত যুবককে অশ্বোপরি তুলিয়া লইল। তারপরে সকলে অশ্বে আরোহণ করিয়া যে পথে আসিয়াছিল, সে পথে তীরবেগে অশ্ব ছাড়িয়া চলিয়া গেল। কিন্তু শড়কীধারা আর কাহারও ভুঁড়ী হস্‌কাইয়া গেল না।

"বউ মা আমার কোথায় গেল,—হায়. তাহার কি গতি হবে! আমি অভাগিনী কেন তাহাকে পবিত্র চিতার আগুনে পুড়িতে দিলাম না" বলিয়া বসন্তরাণীর শ্বাশুড়ী চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিল। তাহার আকুল ক্রন্দনে বনের

বৃক্ষলতাগুলাও যেন কাঁদিয়া উঠিল, ত্রিস্রোতাও যেন আকুল হইয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

নীরদা অজিতনাথের নাম করিতে ভালবাসে, কিন্তু নাম করিতে গেলেই যেন তাহার প্রাণ চমকিয়া উঠে। অজিতনাথ-সম্বন্ধীয় গল্প করিতে ভালবাসে, কিন্তু গল্প করিতে গেলেই যেন প্রাণের অন্তস্তলে একটা অজানা-আকুল-আকাঙ্ক্ষার সুখেরবেদনা ফুটিয়া উঠে। নীরদা অজিতনাথের কথা, অজিতনাথের মূর্ত্তি, অজিতনাথের পরোপকার-বৃত্তি-সুধাধারা ভুলিতে চেষ্টা করে, কিন্তু ভুলিতে পারে না,—ভুলিতে গিয়া ভাবিয়া ভাবিয়া আকুল হইয়া মরে।

আরও এক সর্ব্বনাশ ঘটিয়াছে। নীরদা শুনিয়াছে, অজিতনাথ ব্রহ্মচারী—অজিতনাথ অবিবাহিত। হায়! সেও যদি ব্রহ্মচারিণী হইত, সেও যদি অবিবাহিতা হইত! কিন্তু সে দিবস বাগানে সে, কি বিভীষিকা দর্শন করিয়াছিল? সেই রুদ্ধপ্রাচীর-বাগানের মধ্যে অপরলোক কি প্রকারে প্রবেশ করিতে পারিবে? সেই পুরুষ যে ছোরা প্রদান করিয়াছিল, তাহার রক্ত নীরদার হাতে লাগিয়া গিয়াছিল, সে তাহা স্পষ্ট—অতি স্পষ্টরূপেই দেখিতে পাইয়াছিল, কিন্তু মহামায়াকে যখন সে, সে রক্ত দেখাইতে গেল—তখন মহামায়া কিছুতেই রক্ত দর্শনে সক্ষম হইল না। মহামায়া তাহার কথা শুনিয়াছে,

কিন্তু সেই আশ্চর্য্য পুরুষের কথা শুনিতে পায় নাই। অজিতনাথের কথা বলিয়াছে, মহামায়া তাহাও শুনিয়াছে,—সেই জন্য ত মহামায়া হাসিয়া বলিয়াছিল, "এই সুদৃঢ় প্রাচীরাবদ্ধ বাগানে একটি ক্ষুদ্র প্রাণীর প্রবেশের সম্ভাবনা নাই,—একটা মানুষ কোথা দিয়া আসিবে। সে সকল কিছুই নহে,—অজিতনাথের মূর্ত্তিখানা হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া বড় গোল পাকাইয়াছে।" তারপর, মহামায়া নীরদাকে কত ভৎসনা করিয়াছে—কতপ্রকারে সাবধান করিয়াছে। কিন্তু হায়! মহামায়ার হৃদয়পূর্ণ—সে হৃদয়ে পূর্ণভাবে তাহার স্বামীর মূর্ত্তি ও প্রেম বিরাজ করিতেছে। আর নীরদার প্রাণ শূন্য,—কোন্ কুলীন সন্তান এক কুলগ্নে তাহার স্বামী হইয়া চলিয়া গিয়াছেন! তারপর হৃদয় শূন্য ছিল,—সহসা সেই বিপদের সময়—সেই জলে ডুবিয়া মরণের সময় অজিতনাথ বাদ বড় সাধিয়াছে। হায়! কেন সে বাঁচাইল? কেন সেই রজনীকালে নদীকিনারে দাঁড়াইয়া প্রাণের কাণে সে সঙ্গীত-সুধা ঢালিয়া দিল? সে মূর্ত্তি কি মধুর,—সে হৃদয় কি পবিত্র,—তাহাতে আবার সে অবিবাহিত, সংযমী—ব্রহ্মচারী।

সেই নদীসৈকতে সে মূর্ত্তি নীরদার শূন্য প্রাণে বড় আলো বিস্তার করিয়াছিল,—যেন যুগযুগান্তের অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা এবং নিষ্ফল অন্বেষণ-ক্লেশ শুধু ক্ষণিকের মধ্যে সাফল্য লাভ করিয়াছিল। একটি অনন্যাসক্ত ক্ষুব্ধ লুব্ধ ক্লিন্ন হৃদয় আচ্ছন্ন প্রচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। সে শুভ মুহূর্ত্ত বড় আনন্দোজ্জ্বল, বড় বেদনা-প্লুত, বড় উচ্ছ্বাসাকুল, সুনিবিড় মিলন-বন্ধনের মধ্যেও যেন বিরহ-বেদনা বিজড়িত। কিন্তু সে সুখের বেদনা শুধু ক্ষণিকের

মধ্যে সংযত, সংহত। তার পর, সেই নির্ম্মম ব্রহ্মচারী জলতলে জলে-ভাসা তৃণের মত নীরদাকে নৌকায় ভাসাইয়া দিয়া চলিয়া গেল। যদি চিরদিনের মত যাইবে, তবে দেখা দিল কেন? নীরদা প্রাণের আকুলতায় তাহার দিকে চাহিয়াছিল, কিন্তু সে কেন নীরদার পরিক্ষীণাশা-দীপ-দীপ্ত মর্ম্মমন্দিরে সমাজ-রহস্যান্ধকারপূর্ণ বিজন নিশীথে অনন্ত সমুদ্র পার হইয়া মনোহরণ-অভিসারে দেখা দিয়াছিল? কোন্ গুণে দেখা দিয়াছিল, আবার কোন্ দোষে ত্যাগ করিল? সে ভাবিত, আমি বুঝি ভালবাসার কথা, প্রণয়ের আলাপ মনে মনে অনুভব করিতে শিখিয়া পর্য্যন্তই তোমার মত লোক চাহিতেছিলাম,—বুঝি তোমাকেই কল্পনায় গড়াইয়াছিলাম,—দীর্ণ বিদীর্ণ মর্ম্মোচ্ছ্বাসপূর্ণ এমন বেদনায় পরিপূর্ণ অনুরাগে দেখা দিয়া আবার মিলন-বন্ধনের অবসান করিল কেন?

নীরদার মনে হইত, না না—তাঁহার দোষ কি। আমি হতভাগিনী, কেন তাঁহাকে ডাকিয়া বলিলাম না,—তুমি আমাদের নৌকায় উঠিয়া আইস, তোমাকে ছাড়িয়া এ গ্রাম আমার পরিত্যাগ করা হইবে না। তিনি করুণা-পরায়ণ, অবশ্যই আমাকে করুণা করিতেন।

এক দিন মধ্যাহ্ন কালের একটা নিস্তব্ধ কক্ষমধ্যে বসিয়া নীরদা ঐরূপ চিন্তা করিতেছিল। যদিও এই চিন্তা তাহার হৃদয়ের সহচরী হইয়াছিল, কিন্তু তথাপি সে দিন সে চিন্তায় সে যেন বড় অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিল। সহসা তাহার সেই রক্তমাখা ছোরার কথা মনে পড়িল,—সে চমকিয়া উঠিল। সেই ছোরা দিয়া নীরদা অজিতনাথকে সংহার করিতে চাহিয়াছে!

অজিতনাথকে খুন,—কি ভয়ঙ্কর কথা! যাহাকে হৃদয়ে বসাইলেও প্রাণের আকাঙ্ক্ষা অতৃপ্ত থাকে, তাহাকে খুন? কিন্তু সে কি স্বপ্ন, না বিভীষিকা?

স্বপ্ন নিদ্রাকালে হয়! তখনত নীরদা সম্পূর্ণ জাগরিত ছিল। তবে কি বিভীষিকা? বিভীষিকা হইলে, তাহার সহিত কথোপকথন হইবে কি প্রকারে? ভাবিয়া চিন্তিয়া নীরদা কিছুই স্থির করিতে পারিল না,—তাহার সুন্দর গৌরবর্ণ মুখমণ্ডলে পাংশুবর্ণ ছাইয়া বসিল। সমস্ত কপোলদেশ ঘামে পূর্ণ হইয়া গেল।

ঠিক্ সেই সময় মৃদু মৃদু হাসিতে হাসিতে মহামায়া আসিয়া উপস্থিত হইল। মহামায়া আসিল, কিন্তু নীরদা তাহা জানিতে পারিল না। সে তখন চিন্তায় অত্যন্ত অভিনিবিষ্ট।

মহামায়া পশ্চাৎ হইতে আষাঢ়ের নবীন মেঘের ন্যায় নীরদার লুলিত কেশের অগ্রভাগ ধরিয়া এক টান দিল; বলিল,—"এত চিন্তার ঘটা কেন?"

নীরদার চমক ভাঙ্গিল, পশ্চাৎ ফিরিয়া চাহিল।

কিন্তু সে কথা কহিতে না কহিতে মহামায়া কুন্দদন্তে অধর টিপিয়া মৃদু হাসিয়া বলিল,—"কি ভাব্ছিলে, ব'ল্বো?"

নীরদা হৃদয়ের সংযম সংগ্রহ করিয়া বলিল,—"জ্যোতিষ পড়েছ না কি?"

ম। জ্যোতিষ না পড়ি, তবু তোমার মনের চিন্তা ব'ল্তে পার্‌বো।

নী। কি বল?

ম। তুমি ভাব্ছিলে।

নী। ঠিক্ ব'লেছ,—জ্যোতিষ শাস্ত্রে পণ্ডিত বটে।

ম। কি ভাব্ছিলে, তাও বল্ছি।

নী। ভাব্ছিলাম মহামায়ার রাঙ্গামুখ।

ম। মহামায়ার নয়—

নী। তবে কার?

ম। তা আমি ব'ল্বো না।

নী। কেন?

ম। আমার পাপ হবে।

নী। কি বল্লে পাপ হবে?

ম। যাকে ভাব্ছিলে, তা'র কথা। কেন পাপ হবে, তা বল্বো?

নী। বল না?

ম। কোন পরপুরুষের কথা নিয়ে আলোচনা কর্লে হিন্দুর মেয়ের পাপ হয়। তুমি অজিতনাথকে ভাব্ছো। কিন্তু একটা কথা—

নী। কি কথা মহামায়া?

ফুল্ল জ্যোৎস্নামাখা নদীর জলে গাছের ছায়া পড়িলে যেমন তাহা গম্ভীর অথচ আবিল ভাবে পূর্ণ হয়,—মহামায়ার মুখের ভাবও তদ্রূপ হইল। সে মৃদু গম্ভীর স্বরে বলিল,—"তুমি আমাদের গুরু কন্যা। তোমার হৃদয়ে এ পাপের ছায়া কেন? তুমি হিন্দুর মেয়ে, তোমার হৃদয়ে এ অসংযম কেন? তুমি ব্রাহ্মণের মেয়ে, তোমার এ ভুল কেন? তুমি অজিতনাথকে ভাব্ছিলে কেন?"

নী। কে বলিল, আমি অজিতনাথকে ভাব্ছিলাম?

ম। আমি বল্ছি।

নী। তুমি বুঝ্‌তে পার নাই।

ম। হ'তে পারে। কিন্তু আমার কাছে সত্য ক'রে বল দেখি, তুমি কি ভাব্‌ছিলে? আমি তোমার সখী, আমি তোমার সম্পূর্ণ হিতাকাঙ্ক্ষিণী সহচরী,—আমার কাছে সত্য করিয়া বল দেখি, তুমি কি ভাব্‌ছিলে?

নীরদার মুখে আরও কালি ঢালিয়া দিল। তাহার মুখের পাপের প্রলুপ্ত ছায়া যেন জাগিয়া পড়িল। সে ধরা গলায় ভরা আওয়াজে বলিল,—"না, মহামায়া; আমি অজিতনাথকে অন্য কোন ভাবে ভাব্‌ছিলাম না। আমি সেই আশ্চর্য্য পুরুষ, আর রক্ত ছোরার কথা ভাব্‌ছিলাম।"

ম। সে বিষয়ের চিন্তা তুমি ছাড়িয়া দাও। সে কোন কাজের কথাই নয়।

নী। কাজের কথা নয়, কিন্তু আমি স্পষ্ট সেই পুরুষকে দেখিয়াছি; স্পষ্ট ভাবে তাহার সহিত কথা কহিয়াছি,—স্পষ্ট-ভাবে সে আমার হাতে তাহার রক্ত ছোরা দিয়াছে।

ম। সব ভুল। আমি তোমার নিকটেই ছিলাম,—গাছের আড়াল হ'তে আমি তোমাকে স্পষ্ট দেখিয়াছি। তুমি আপন মনে কথা কহিয়াছ,—আপন মনে নত-জানু হইয়া বসিয়া পড়িয়াছ,—আপন মনেই সব করিয়াছ। কিন্তু কেন করিয়াছ, তা আমিও ভাবিয়া স্থির কর্‌তে পারিনি। যাক্, ওসকল বাজে কথা নিয়ে আর বেশী ভেব না। মনকে বাঁধ,—তুমি ওসব ভুলে যাও।

নী। হ্যাঁ ভুল্‌বো বৈ কি,—তবে সেই রক্ত ছোরার কথা মনে হ'লে আমার এখনও হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। আমি স্পষ্ট

সেই ছোরা হাতে করে সেই পুরষের নিকট ব'লেছি—এই ছোরা দিয়ে অজিতনাথকে হত্যা ক'র্‌ব।

ম। উহা মনের খেয়াল। অজিতনাথ তোমার হৃদয়ের অনেক খানি স্থান অধিকার ক'রে ফেলেছে কি না। এদিকে ভদ্র কন্যা—পাপের ভয়। কাজেই অমন একটা বিভীষিকা মনে এসেছিল। যাক্, এক নূতন কথা শোন।

নী। কি কথা মহামায়া?

ম। কাজির হাটে বাদশা নামদারের এক ফৌজদার সাহেব আছেন, জান?

নী। জানি না, তবে শুনিয়াছি।

ম। মেয়ে মানুষের শোনাকেই জানা বলে,—কোন্ মাগী আর ফৌজদার সাহেবকে দেখ্‌তে যায়?

নী। তবে জানি,—খবরটা কি বল?

ম। সেই কাজি সাহেবের ছেলেকে না কি পরীতে উড়িয়ে নিয়ে গিয়েছে।

নী। ছেলেটার বয়স কত?

ম। যুবা পুরুষ—কুড়ি বাইশ বৎসর হবে।

নী। পরীতে নিয়ে গেল কি,—আর কি হ'ল তা কে জানে?

ম। জানে না, তবে ঐরূপ একটা গুজব হ'য়েছে। দেশে সেই জন্যে হাহাকার উঠেছে;—অনেক খোঁজা খুঁজি হচ্চে।

নী। সে খবরে আমাদের প্রয়োজন কি বোন্? ফৌজদার সাহেব বড়লোক,—তাঁর অতুল প্রতাপ; পরীতেও তাঁর ছেলেকে রাখ্‌তে পার্‌বে না।

ম। খবরটা নূতন বলেই তোমাকে শুনাইলাম।

নী। তা ভালই করেছ। এখন একটু রামায়ণ পড়, শুনি।

তখন মহামায়া একখানা কার্পেটের আসনের উপর উপবেশন করিয়া হাতের লেখা রামায়ণ পুঁথি খুলিয়া পাঠ করিতে লাগিল, নীরদা বসিয়া শুনিতে লাগিল। তবে সে রামায়ণ শুনিতেছিল কি অজিতনাথকে ভাবিতেছিল,—তা ঠিক্ বলা যায় না।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

যে দিবস মধ্যাহ্নে মহামায়াতে ও নীরদাতে ঐরূপ কথোপকথন হইতেছিল, সেই দিবস প্রত্যূষে জমিদার কৃষ্ণগোবিন্দ সমাদ্দার ফৌজদারসাহেব কর্ত্তৃক আহূত হইয়া কাজির হাট ফৌজদার সাহেবের বাটীতে গমন করিয়াছিলেন।

তখন জমিদারগণ দেশের সর্ব্বে সর্ব্বা ছিলেন, তাহাদের অধীনে সৈন্য-সামন্ত থাকিত, এবং তাঁহারা বাদশাহকে কর প্রদান করিয়া অন্যান্য বিষয়ে স্বাধীনভাবে কার্য্য চালাইতেন। বাকী কর আদায়ের জন্য, বা দেশের শান্তিরক্ষার জন্য আদালতের আশ্রয় লইতেন না। তবে এখন যেমন করদ রাজাগণের দ্বারে দ্বারে এক এক জন রেসিডেন্ট সাহেব থাকেন, তখনও—আরঙ্গজেবের পর হইতে তেমনি জমিদারগণের বাটীর নিকটে নিকটে এক এক জন ফৌজদার থাকিতেন। এই ফৌজদারগণই শনিস্বরূপ হইয়া জমিদারগণের স্বাধীনতা সংহার করেন, এবং সেই স্বাধীনতার

সঙ্গে সঙ্গে বাদসাহগণেরও রাজশক্তি হীন হইয়া পড়ে। যেহেতু রাজায় প্রজায় সদ্ভাব ও বিশ্বাস না থাকিলে, এবং ন্যায্য অধিকারে বঞ্চিত হইলে ক'দিন রাজার রাজত্ব থাকে? রাজার পরিবর্ত্তন হয়। কিন্তু প্রজার সত্ব চির অক্ষুণ্ণ।

ফৌজদারসাহেবের তলবমতে কয়েকজন মাত্র পাইক সঙ্গে লইয়া কৃষ্ণগোবিন্দ সমাদ্দার অতি প্রত্যুষে কাজিরহাট গিয়াছিলেন।

সেখানে গিয়া ফৌজদার সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ হইল। ফৌজদার সাহেব বলিলেন,—"তুমি এদেশের জমিদার, তাই তোমাকে ডাকাইয়াছি। আমার একটি মাত্র ছেলে, সে আজ প্রায় কুড়িদিন নিরুদ্দেশ, লোকে বলিতেছে তাহাকে পরীতে লইয়া গিয়াছে—আমি কিন্তু তাহা বিশ্বাস করি না,—আমার বিশ্বাস, তাহাকে এই দেশের কোন দুষ্ট লোকে অপহরণ করিয়াছে। আমি অনেক অনুসন্ধান করিয়াছি, কিন্তু কোথাও তাহার সন্ধান পাই নাই। তাই তোমাকে ডাকাইয়াছি।"

কৃষ্ণগোবিন্দ সমাদ্দার বিনয়-নম্র স্বরে বলিলেন,—"তৎসম্বন্ধে আমাকে যাহা করিতে বলিবেন, আমি প্রাণপণে তাহা করিব।"

ফৌ। তুমি এদেশের জমিদার, চেষ্টা করিলে নিশ্চয়ই আমার ছেলেকে মিলাইতে পারিবে।

কৃ। চেষ্টা করিতে যে পথ অবলম্বন করা উচিৎ, তাহা আমি করিব; কিন্তু কি করিতে হইবে—অনুসন্ধানের কোন্ সূত্র অবলম্বন করিতে হইবে, তাহা আমাকে বলিয়া দিন?

ফৌ। যে যে পথ ভাল বিবেচনা করিয়াছি, সেই সেই পথ

ধরিয়া আমি অনুসন্ধান করিয়াছি—কিন্তু কোন ফল হয় নাই, তাই তোমাকে ডাকাইয়াছি। যেরূপেই পার—তোমাকে আমার ছেলে দিতেই হবে।

কৃ। অধীনের অনুসন্ধানে ত্রুটী হইবে না। কি অবস্থায় তিনি অদর্শন হয়েন?

ফৌ। রাত্রে ঘরে শুইয়াছিল, প্রভাতে উঠিয়া আর দেখা যায় নাই।

কৃ। আপনার পুত্রের বিবাহ হইয়াছে?

ফৌ। হইয়াছে।

কৃ। আপনার পুত্রবধূ কোথায়?

ফৌ। আমার বাড়ীতেই আছেন,—তিনি সে সম্বন্ধে কিছুই বলিতে পারেন না। তাঁহার নিদ্রিতাবস্থায় সে চলিয়া গিয়াছে।

কৃ। আমি প্রাণপণে তাহার অনুসন্ধান করিব।

ফৌ। কেবল অনুসন্ধান করিলে চলিবে না,—তাহাকে মিলাইয়া দেওয়া চাই-ই। যদি না পার, তোমার জমিদারী কাড়িয়া লইব। এমন অকর্ম্মণ্য জমিদার, বাদশাহ চাহেন না।

কৃষ্ণগোবিন্দ সেকথায় অনেক প্রতিবাদ করিয়াছিলেন; তিনি অনুসন্ধানের জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিতে পারিবেন, কিন্তু যদি প্রাপ্ত না হন,—তবে তিনি কি করিবেন? ফৌজদার সাহেব সে কথা শুনিলেন না। বলিলেন,—"নিশ্চয় জানিও, আমার ছেলেকে মিলাইতে না পারিলে, তুমি পথের ফকির হইবে।"

কৃষ্ণগোবিন্দ বিদায় হইলেন। কাজিরহাট ও কাঞ্চননগর প্রায় দশ ক্রোশ ব্যবধান। সন্ধ্যার অনেক পরে বাহির হইয়া-

ছিলেন বলিয়া, কাঞ্চননগরে পঁহুছিতে রাত্রি দ্বিপ্রহর হইয়াছিল। তিনি অশ্বারোহণে আসিতেছিলেন বলিয়া ঐ সময়ে গ্রামে পঁহুছিলেন, কিন্তু তাহার সঙ্গী পাইকগণ পদব্রজে তখনও পঁহুছিতে পারে নাই।

তখন গ্রাম সুপ্ত—নীরব নিস্তব্ধ। অশ্বটা অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হইয়াছে, নিজেও ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছেন,—তাই গ্রামের মধ্যে পঁহুছিয়া অশ্বকে অতি মৃদুভাবে পরিচালন করিয়া গৃহাভিমুখে যাইতেছিলেন। তখন গ্রামের সকলেই নিদ্রামগ্ন—কাজেই পথে কাহারও সহিত সাক্ষাৎ হইল না। ক্বচিৎ মাথার উপর দিয়া একটা নিশাচর পক্ষী পক্ষ-সাপট করিয়া উড়িয়া গেল,—ক্বচিৎ কৃষক-পল্লীর কোন বাড়ী হইতে একটা কুকুর ঘেউ ঘেউ করিয়া গৃহস্থকে সজাগ করিল।

যখন কৃষ্ণগোবিন্দ তাহার সেনানিবাসের সম্মুখ দিয়া যাইতেছিলেন, তখন দেখিতে পাইলেন,—দুর্গ-দ্বারের সম্মুখে দুইটী রমণী দাঁড়াইয়া আছে। দুর্গ-দ্বার ভিতর হইতে বন্ধ। এত রাত্রে দুইটি স্ত্রীলোক দুর্গ-দ্বারে কেন দাঁড়াইয়া?—তাঁহার মনে সন্দেহ হইল। ধীরে ধীরে অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া নিঃশব্দ-পদ-সঞ্চারে তাহাদের নিকটস্থ হইলেন।

জ্যোৎস্নালোকে স্পষ্ট দেখিতে পাইলেন, তাঁহার বাড়ীর দাসী বিশাখা, আর একটি অপরিচিতা রমণী। অপরিচিতা রমণী প্রৌঢ়া—বিশাখা নবীনা। যেবার তিনি বৃন্দাবনে গিয়াছিলেন, সেইবার বিশাখাকে নিরাশ্রয়া দেখিয়া বাড়ী আনিয়াছিলেন,—সে মথুরাবাসিনী আভিরিণী। কৃষ্ণগোবিন্দ প্রৌঢ়া রমণীর দিকে চাহিয়া শিহরিয়া উঠিলেন,—মূর্ত্তি যেন তাঁহার স্বর্গীয়া মাতার

সে মূর্ত্তি বামহস্ত দ্বারা বিশাখার বামহস্ত ধারণ। দক্ষিণহস্তের অঙ্গুলি আকাশের দিকে নির্দ্দেশ করিয়া কি দেখাইতেছে এবং কি বলিতেছে।

ন্যায়। সে মূর্ত্তি বাম-হস্ত দ্বারা বিশাখার বাম-হস্ত ধরিয়া দক্ষিণ-হস্তের অঙ্গুলি আকাশের দিকে নির্দ্দেশ করিয়া কি দেখাইতেছে এবং কি বলিতেছে। চকিত চঞ্চল ভাবে বিশাখা তাহাও শুনিতেছে।

কৃষ্ণগোবিন্দ হৃদয়-বেগ সম্বরণ করিতে পারিলেন না, আরও নিকটস্থ হইলেন। প্রৌঢ়া রমণী কৃষ্ণগোবিন্দের পায়ের শব্দ পাইয়া অতি দ্রুতপদে চলিয়া গেল। কৃষ্ণগোবিন্দ ছুটিয়া তাহার অনুসরণ করিলেন, কিন্তু রমণী আম্রবাগানের অন্ধকারে মিশিয়া কোথায় গেল, তিনি তাহা স্থির করিতে না পারিয়া ফিরিয়া আসিলেন, দেখিলেন, বিশাখা সেখানে দাঁড়াইয়া ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছে, তখন তিনি তাহার হস্ত ধরিয়া বাটীর মধ্যে লইয়া গেলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

—*—

বহির্ব্বাটীর সুসজ্জিত এক ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে স্ফটিকদীপে সুগন্ধি তৈলসিক্ত বর্ত্তীতে মৃদু আলোক জ্বলিয়া নিশার সমীর-সংস্পর্শে মৃদু মৃদু কাঁপিতেছিল,—আর সেই দীপাধারের অদূরে বড় লজ্জানম্র-ভীত-সঙ্কুচিত ভাবে বসিয়া বিশাখা মৃদু মৃদু কাঁপিতেছিল। তাহার আলুলায়িত কৃষ্ণ কেশরাশি কতক পৃষ্ঠদেশে, কতক অংসে, কতক বাহুতে, কতক গণ্ডে পড়িয়াছিল,—সে অনেক দিন বঙ্গদেশে আসিলেও এখনও তাহার পরিধান-বস্ত্র সেই আভিরীকন্যার ন্যায়—সেইরূপ সঙ্কোচ-বিকোচ বাগরা—সেইরূপ দেহসংলগ্ন

কাঁচলী,—সেইরূপ সূক্ষ্ম ওড়ানায় সর্ব্বাঙ্গ সমাচ্ছাদিত। বিশাখা আভিরী কন্যা,—যৌবনে আভিরীবালার চিরপরিচিত কবিত্ব-মাখা রূপরাশি তাহার সর্ব্বাঙ্গ দিয়া উছলিয়া পড়িতেছিল,—সেই আশ্চর্য্য ভাবের দীর্ঘ মুখছন্দ,—সেই আয়ত নীলেন্দীবরতুল্য কৃষ্ণতার নয়নদ্বয়,—সেই শুকচঞ্চু-বিনিন্দিত নাসার মাধুরী,—সেই পূর্ণোজ্জল গৌরবর্ণের মধুর ছটা—সকলই সেই পূর্ব্বতম আভিরীবালার উপমেয়। বিশাখা যদিও এবাড়ীর পরিচারিকা, কিন্তু সেই পরিচ্ছদে—অঙ্গরাগে একটু ধৃষ্টতা প্রকাশ করিত, একটু বাড়াবাড়ি করিত। কিন্তু চরিত্র অতি পবিত্র বলিয়া খ্যা- ছিল।

বিশাখা বসিয়া কাঁপিতেছিল ; কেন না, সে বড় অন্যায় কার্য্য করিয়াছে। এত রাত্রে—দুর্গের সম্মুখে এক অপরিচিতা রমণীর সহিত দাঁড়াইয়া সে কথা কহিতেছিল। আর সেই দৃশ্য স্বয়ং কৃষ্ণগোবিন্দ বাবু দর্শন করিয়াছেন,—হায়! তিনি কি মনে করিবেন! তাহার চক্ষু ফাটিয়া জল আসিতেছিল।

কৃষ্ণগোবিন্দ দুর্গদ্বার হইতে তাঁহাকে ধরিয়া আনিয়া এই গৃহে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়া বাটীর মধ্যে চলিয়া গিয়াছেন,—একটি কথাও তাহাকে জিজ্ঞাসা করেন নাই। হায়! তিনি যখন দুর্গদ্বারের নিকট যাইবার কারণ সিজ্ঞাসা করিবেন, এবং সেই রমণীর পরিচয় জিজ্ঞাসা করিবেন, তখন সে কি উত্তর দিবে? যাহা সত্য কথা, বিশাখা তাহাই বলিবে,—কিন্তু সে কথা কৃষ্ণ-গোবিন্দ বাবু কখনই বিশ্বাস করিবেন না।—কেহই বিশ্বাস করিবে না। কিন্তু বিশ্বাস না করিলে, বিশাখাকে তিনি কি করিবেন? মারিবেন,—তা মারুন, তিনি প্রভু—মারিলে ক্ষতি

নাই, কাটিলে ক্ষতি নাই,—কিন্তু কেন মারিয়াছেন, কি অপরাধে মারিয়াছেন—সে কথা শুনিলে লোকে তাহাকে অবিশ্বাসিনী মনে করিবে,—লোকে তাহাকে ভ্রষ্ট-চরিত্রা মনে করিবে,—তার চেয়ে যে,মরা ভাল ! বিশাখা দেওয়ালে ঠেসান দিয়া দীর্ঘ-শ্বাস পরিত্যাগ করিল।

তারপরে আরও অনেকক্ষণ কাটিয়া গেল। বিশাখা সেইরূপ ভাবেই বসিয়া রহিল,—সেইরূপ ভাবেই ভাবিতে লাগিল,—এবং নিশার সমীরণে কাঁপিয়া কাঁপিয়া স্ফটিকদীপ যেমন জ্বলিতেছিল, তেমনই জ্বলিতে লাগিল।

সহসা বাহির হইতে শিকলী-নাড়ার শব্দ হইল। ত্রাস-কম্পিতা হরিণীর ন্যায় উদাসাকুল আঁখিদ্বয় তুলিয়া, বিশাখা দেওয়াল-সংলগ্ন দেহ তুলিয়া, ভাল হইয়া বসিল,—দ্বার ঠেলিয়া কৃষ্ণগোবিন্দ বাবু গৃহে প্রবেশ করিলেন, তিনি বস্ত্রাদি পরিত্যাগ ও সম্ভবতঃ আহারাদি করিয়া আসিলেন।

কৃষ্ণগোবিন্দ বাবু গৃহ মধ্যে আগমন করিয়া ভিতর হইতে দরোজার কীলক বন্ধ করিয়া দিলেন,—এবং বিশাখাকে ডাকিয়া বলিলেন,—"বিশাখা, আমার সহিত তোমার কি সম্বন্ধ জান ?"

বিশাখা উঠিয়া দাঁড়াইল। আবেগ-কম্পিত কণ্ঠে বলিল,—"তা, জানি।"

কৃ। কি সম্বন্ধ ?

বি। আপনি প্রভু, আমি পরিচারিকা,—আপনি মনিব, আমি দাসী। আপনি পিতা, আমি কন্যা।

কৃ। তুমি দাসী, আমি তোমার প্রভু ; সেরূপে আমি তোমাকে প্রতিপালন করি না,—তোমাকে কন্যার মত

পালন করিয়া আসিয়াছি,—কন্যার মত শিক্ষা দিয়া আসি- ... কন্যার মত ভাল বাসিয়া আসিয়াছি।

... জীবনে আপনার ঋণ পরিশোধ করিতে পারিব না।

কৃ। তোমায় একটি কথা বলিব,—রাখিবে?

বি। আপনার কথা রাখিব না,—কাহার কথা রাখিব? আপনি পিতা, আমি কন্যা,—কন্যা প্রাণ দিয়াও পিতার আদেশ প্রতিপালন করে।

কৃ। কিন্তু—

বি। কিন্তু কি প্রভু?

কৃ। ভাল, আগে আমার নিকট সত্য কর, আমি যাহা বলিব, তাহা তুমি প্রতিপালন করিবে?

বি। হাঁ করিব।

কৃ। নিশ্চয়?

বি। নিশ্চয়।

কৃ। কিন্তু আমি যাহা জিজ্ঞাসা করিব, তাহা বলিলে হয়'ত তোমার অনিষ্ট হইতে পারে,—হয়ত তাহা তোমার জীবনের অতি লুকান কাহিনী।

বি। সত্য করিতেছি, তথাপি বলিব।

কৃ। তবে বল,—মিথ্যা বলিও না, সত্য বল—ক্ষমা করিব,—পাপ করিয়া থাক, তদনুযায়ী ব্যবস্থা করিব।

বিশাখার সমস্ত শিরার মধ্য দিয়া যেন একটা তড়িৎ-প্রবাহ ছুটিয়া গেল। কৃষ্ণগোবিন্দ বাবুর মুখের দিকে চাহিয়া আতঙ্ক-কম্পিত কণ্ঠে বলিয়া উঠিল,—"আমি পাপ করি নাই, আমার সে ভয় নাই, আপনি যাহা বলিবেন, বলুন?"

বিস্ময়-বিস্ফারিত নয়নে বিশাখার সেই ম্লান-সৌন্দর্য্য-মাখা মুখের দিকে চাহিয়া কৃষ্ণগোবিন্দ একটু বিস্মিত হইলেন। মনে হইল,—এমন সৌন্দর্য্য, এমন সরলতা! তবে কি পাপ করে নাই! কিন্তু,—পর মুহূর্ত্তেই মনে হইল,—কোন দুরভিসন্ধি না থাকিলে, কোন পাপের খেলায় খেলিতে না প্রস্তুত হইলে, এই নিশীথ রজনীতে দুর্গদ্বারে কেন যাইবে? দৃঢ় গম্ভীরস্বরে বলিলেন,—"শোন, বিশাখা, আবার বলিতেছি, মিথ্যা বলিও না! সত্য বলিও—মিথ্যা বলিলে, তোমার নিস্তার নাই।"

বিশাখা দাঁড়াইয়া কাঁপিতে লাগিল। কৃষ্ণগোবিন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন,—"এত রাত্রে দুর্গদ্বারে দাঁড়াইয়া কি করিতেছিলে।"

বি। আমাকে ডাকিয়া লইয়া গিয়াছিল।

কৃ। কে ডাকিয়া লইয়া গিয়াছিল?

বি। আপনি কি আর একটি স্ত্রীলোককে দেখেন নাই?

কৃ। হাঁ, দেখিয়াছি—ঐ স্ত্রীলোক কে?

বি। আমি জানি না।

কৃ। মিথ্যা কথা! যাহাকে জান না বা চেন না—তাহার ডাকে এই গভীর রাত্রে দুর্গদ্বারে গিয়াছিলে কেন?

বি। কেন গিয়াছিলাম, বলিতে পারি না, প্রভু; সত্য বলিতেছি, কেন গিয়াছিলাম জানি না।

কৃ। নেকামি—নেকামি রাখ্। আসল কথা বল্, ঐ রমণী কে?

বি। সত্য বলিলে যদি বিশ্বাস না করেন, উপায় নাই; কিন্তু আমি উহাকে চিনি না।

কৃ। ঐ রমণী তোর সাক্ষাৎ কোথায় পাইল?—সত্য কথা না বলিলে, এই তরবারির আঘাতে তোকে দ্বিখণ্ড করিব।

কৃষ্ণগোবিন্দের হাতে একখানি তরবারি ছিল, তিনি একবার উত্তোলন করিলেন।

বিশাখা বলিল,—"আহারাদির পর সকলে যখন শয্যাগ্রহণ করিল, আমিও আমার ঘরে গিয়া শুইলাম,—আমার একটু তন্দ্রা আসিয়াছে, এমন সময়ে আমার ঘরের দরোজা নড়িল,—আমার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল,—ঘরে আলো জ্বলিতেছিল,—চাহিয়া দেখিলাম ঐ অপরিচিতা রমণী আমার গৃহমধ্যে। আমি চীৎকার করিতে যাইতেছিলাম,—রমণী নিষেধ করিল এবং আমাকে বলিল,—"উঠিয়া আমার সঙ্গে আইস, তোমার ভাল করিব; আমি সাধারণ মানুষ নহি।" আমি আর কোন কথা কহিলাম না—কোন কথা কহিতে পারিলাম না,—লৌহ যেমন চুম্বকের আকর্ষণে চলিয়া যায়, আমিও তেমনি উঠিয়া রমণীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিয়া গেলাম। কেন গেলাম, কিজন্য গেলাম,—সে কথা ভাবিলাম না—ভাবিবার অবসর পাইলাম না।"

কৃষ্ণগোবিন্দ স্তম্ভিত ভাবে বিশাখার কথা শুনিতেছিলেন,—বিশাখা নিস্তব্ধ হইলে বলিলেন,—"তারপর?"

বি। দুর্গ-দ্বারে গিয়া সেই রমণী আমাকে দুইটি কথা বলিলেন, এবং একটি জিনিষ দেখাইলেন।

কৃ। সে কথা দুইটি কি কি?

বি। প্রথম কথা,—আমায় বলিলেন, তুমি রূপসী; সত্বরেই তোমার রূপ লইয়া সুন্দ-উপসুন্দের যুদ্ধ বাধিবে—তোমার রূপের জন্য এই সংসারে মহা প্রলয় উপস্থিত হইবে, কিন্তু

তুমি যদি আত্মবিসর্জ্জন করিতে পার, তবে এই সংসার রক্ষা পাইবে।

কৃ। তোমার আত্মবিসর্জ্জন কি? আত্মহত্যা?

বি। আমি সে কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম,—তিনি বলিলেন, না।

কৃ। তবে কি?

বি। দ্বিতীয় কথা যাহা, তাহার সঙ্গেই ঐ কথার সম্বন্ধ আছে।

কৃ। সে কথা কি?

বি। কে অজিতনাথ আছে?

কৃ। অজিতনাথ? অজিতনাথ কে আছে—কৈ, আমাদের এখানে ত কেউ অজিতনাথ নাই?

বি। তিনি বলিলেন,—অজিতনাথের রক্তে প্রেত-তর্পণ হইবে,—দিন আর অধিক নাই,—সেই দিন তোমাকে আত্ম-বিসর্জ্জন করিতে হইবে।

কৃ। কি প্রকারে?

বি। তিনি বলিলেন,—এখন সত্য কর; সময় হইলে বলিয়া দিব।

কৃ। আর কি দেখাইলেন?

বি। আকাশের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইলেন,—এক অতি সুন্দর যুবা পুরুষ এক বৃদ্ধের পায়ের নিকট বসিয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিতেছে, বৃদ্ধের চক্ষু দিয়া প্রতিহিংসার আগুন ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিতেছে,—দেখিতে দেখিতে সেই আগুনে যুবক পুড়িল,—আমি পুড়িলাম।

কৃষ্ণগোবিন্দ নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন,—"শোন্ বিশাখা, আমি পাঁচ বৎসরের বালক নহি যে আমাকে অদ্ভুত রূপকথা শোনাইয়া ভুলাইয়া দিবি। হা, বিশাখা, তুই এত সরল ছিলি,—এত সত্যবাদী ছিলি,—পাপের পথে নামিতে নামিতেই এত ছলা, এত কলা অভ্যাস করিয়া ফেলিয়াছিস্,—এখনও সত্য বল্। হায়, হায়, আমাকে ভয় দেখাইয়া নিবৃত্তি করিবার জন্য অতি সুন্দর উপাখ্যান রচনা করিয়াছিস্,—এখন সরল পথে চল্,—এখনও সত্য কথা বল।"

বিশাখা আর কোন কথা বলিতে পারিল না। সে দাড়াইয়া দাড়াইয়া কাঁপিতে লাগিল।

কৃষ্ণগোবিন্দ বাবু বুঝিলেন, বিশাখা সত্য সত্যই পাপে মজিয়াছে,—হয় সে জারের সন্ধানে দুর্গদ্বারে গিয়াছিল, আর নয় অন্য কোন দুরভিসন্ধি ছিল। যাহা হউক, সহজে তাহাকে পরিত্যাগ করা হইবে না। কৃষ্ণগোবিন্দ বাবু তখন রুদ্র-মূর্ত্তি ধারণ করিলেন,—বিশাখাকে বহুপ্রকারে ভৎসনা করিলেন,—অনেক প্রকারে ভয় প্রদর্শন করিলেন, কিন্তু বিশাখা অন্য কোন কথাই বলিতে পারিল না।

তখন কৃষ্ণগোবিন্দ বাবু তাহাকে সেই গৃহেই আবদ্ধ করিয়া রাখিয়া বাহির হইয়া চলিয়া গেলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

—*—

কৃষ্ণগোবিন্দ বাবু বিশাখার বিষয়ে কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। কিন্তু তিনি ইহা বুঝিয়া গেলেন যে, বিশাখা তাঁহাকে প্রতারণা করিয়াছে,—বিশাখা তাঁহার নিকটে আসল কথা গোপন করিয়াছে,—এবং যাহা বলিয়াছে, তাহা সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক! কিন্তু—

কিন্তু কি? তাঁহার মনে হইল, যে রমণী বামহস্তে বিশাখার হস্তধারণ পূর্ব্বক দক্ষিণহস্তের অঙ্গুলী আকাশের দিকে নির্দ্দেশ করিয়া কি দেখাইতেছিল,—তাহার আকৃতি নিতান্ত সাধারণ নহে,—চক্ষু দুইটি দিয়া যেন প্রতিভার জ্বলন্ত অনল নির্গত হইতেছিল। আমি তাহার পশ্চাদনুসরণ করিয়াও তাহার গতি লক্ষ্য করিতে পারিলাম না,—সে কোথা দিয়া কোথায় লুকাইয়া গেল! কৃষ্ণগোবিন্দ বাবুর প্রাণের মধ্যে একবার বিদ্যুচ্চমকিয়া গেল। তাঁহার মনে হইল, সেই রমণীর মূর্ত্তি তাঁহার স্বর্গগতা মাতার মূর্ত্তির ন্যায় দেখিয়াছিলেন;—স্তম্ভিত হৃদয়ে কি ভাবিলেন, তারপর দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া মনে মনে বলিলেন,—ভুল! সব ভুল! পথশ্রমে ক্লান্ত হইয়া ভুল দেখিয়াছি।

কৃষ্ণগোবিন্দ বাবু যেখানে দাঁড়াইয়া চিন্তাব্যূহে আবদ্ধ ছিলেন, তাহার অদূরের এক প্রকোষ্ঠ হইতে, সেই নিশীথ রজনীর সমীর-সঙ্গে করুণ-বেহাগের আলাপচারীতে রমণী-কণ্ঠ

হইতে গান হইতেছিল। কৃষ্ণগোবিন্দ তাহা স্থিরকর্ণে শুনিতে লাগিলেন। গীত হইতেছিল,—

গভীর যামিনী নিরব মেদিনী নিথর নিশীথ সমীর বয়,
ফোটা ফুল কুলে বসি কুতূহলে নিরবেতে মধু মধুপ খায়।
দূরে কল্লোলিনী তুলি কলধ্বনি কাঁদিয়া কাঁদিয়া কোথায় যায়,
আমার মতন প্রাণের রতন বুঝি তার পানে ফিরে না চায়।
ওগো আমি অভাগিনী সারাটি রজনী হেথা আছি ব'সে জাগিয়া;
শুধু মুহূর্ত্তের তরে "ভালবাসি তোরে" পারে না কি যেতে বলিয়া?
তবে কেন দেখা দিল কেন বা মজাল কেন বা আকুল করিল হায়!
ওগো তারি আশা লয়ে আছি যে বসিয়ে এ সারা পরাণী তাহারে চায়।

অনেকক্ষণ ধরিয়া গানটি গীত হইল। অনেকক্ষণ ধরিয়া সেই সুস্বরলহরী সমীরের ক্রোড়ে খেলিয়া খেলিয়া ফিরিল,—তারপর নিস্তব্ধ হইয়া গেল।

গানের-স্বর নিস্তব্ধ হইলেই মৃদুস্বরে, বিষামৃতে মাখা স্বরে—ভগ্ন, দীর্ণ, ব্যথিত ভাষে, গায়িকা বলিল,—"অজিত! প্রাণের অজিত,—এমনি করিয়াই কি সর্ব্বনাশ করে!"

কৃষ্ণগোবিন্দ চমকিয়া উঠিলেন। অজিত!—অজিত কে? বিশাখাও অজিতের কথা বলিতেছিল,—কিন্তু অজিত কে? কৈ, কোন অজিতকে ত আমি চিনি না। এ কাহার স্বর?

এ যাহার কণ্ঠস্বর, অজিত নামক ব্যক্তি কি তাহার প্রকোষ্ঠে উপস্থিত আছে? না, না,—এ স্বর উদ্দেশ্য—এ কথা দূরাহ্বানে। কিন্তু কে এ কথা বলিল,—কে গান গাহিল?

কৃষ্ণগোবিন্দের মনে হইল, তাঁহার গুরু কন্যা নীরদা এ গানের গাহিকা। হৃদয়াবেগ সম্বরণে অসমর্থ হইয়া তিনি তখনই

নীরদার প্রকোষ্ঠাভিমুখে চলিয়া গেলেন,—এবং দরোজা ঠেলিয়া নীরদাকে ডাক দিলেন।

নীরদা জাগিয়া ছিল,—কিন্তু সে বড় চতুরা; সে বুঝিয়া লইল, কৃষ্ণগোবিন্দ বাবু তাহার গান শুনিয়াছেন, হয় ত প্রাণের অন্তস্থল হইতে যে অজিতের নাম বাহির হইয়া পড়িয়াছে, তাহাও শুনিয়া থাকিবেন। ভয়ে ও লজ্জায় সে ভারি কাতর হইল, এবং সহসা উত্তর দিল না ও সেই অবসরে মনে মনে একটা যুক্তি স্থির করিয়া লইল।

কৃষ্ণগোবিন্দ পুনঃ পুনঃ ডাকিতে লাগিলেন;—তখন নীরদা উত্তর দিল। কৃষ্ণগোবিন্দ বলিলেন,—"দিদি ঠাকুরাণী, একবার দরোজা খুলিয়া দাও,—একটা বিশেষ কথা আছে।"

গৃহ অন্ধকার ছিল। নীরদা উঠিয়া আলো জ্বালিয়া দরোজা খুলিয়া দিল। কৃষ্ণগোবিন্দ গৃহ-প্রবেশ করিয়া চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন,—কেহ কোথাও নাই, কেবল উন্মুক্ত গবাক্ষ-প্রবিষ্ট চন্দ্রকিরণাপ্লুত শ্বেত শয্যাখানি পড়িয়া রহিয়াছে; আর নীরদা তাহারই সম্মুখে দণ্ডায়মানা।

কৃষ্ণগোবিন্দ বলিলেন,—"তুমি আমার গুরু কন্যা। আমি একটা কথা জিজ্ঞাসা করিব, সত্য বলিও।"

মৃদুস্বরে নীরদা বলিল,—"কি কথা, দাদাবাবু? এতরাত্রে আমার ঘরে আসিয়া যে কথা শুধাইতেছ, তাহা নিতান্ত সহজ নহে,—আমার ভয় হইতেছে,—সে কি কথা দাদাবাবু?"

কৃ। কথা সহজ না হইলেও তুমি আমার গুরুকন্যা—তোমার কোন ভয় নাই; কিন্তু তোমার পায়ে ধরিয়া বলিতেছি, সত্য বলিও,—

নী। কি কথা দাদাবাবু? আমার ভয় ক্রমেই বড়িতেছে।

কৃ। না, না, তোমার কোন ভয় নাই—সত্য বল। তুমি কাহার উদ্দেশ্যে ও-গান গাহিতেছিলে?

নী। গান! আমি গান গাহিতেছিলাম, দাদা বাবু? আমি এতরাত্রে গান গাহিব? কখনই না,—আমি গান গাহি নাই।

কৃ। আশ্চর্য্য কথা,—আমি নিজ কর্ণে শুনিয়াছি।

নী। কোন সময়ে?

কৃ। এই মাত্র,—সেই গান ও কথা শুনিয়াই আমি তোমার এখানে আসিয়াছি।

নী। আশ্চর্য্য! আমি ঘুমাইতেছিলাম,—আপনার ডাকা-ডাকিতে তবে জাগিয়াছি।

কৃষ্ণগোবিন্দ বাবু বিস্মিত হইলেন। অনেকক্ষণ চিন্তা করিলেন, কিন্তু চিন্তা করিয়া কিছু স্থির করিতে পারিলেন না! বলিলেন,—"সত্য বলিতেছ, তুমি ঘুমাইয়া ছিলে?"

নী। আমি মিথ্যা কখনও বলি না।

কৃ। ভাল, আর একটি কথা জিজ্ঞাসা করিব।

নী। কি বল?

কৃ। তুমি অজিতনাথ নামক কোন ব্যক্তিকে চেন?

নী। না।

কৃ। কখনও চেন না?

নী। মনে হয় না।

কৃ। কিন্তু আমি স্পষ্টতঃ তোমাকে ঐ নাম করিতে শুনিয়াছি।

না। যদি শুনিয়া থাক, তবে হয়ত ঘুমের ঘোরে স্বপ্নে ঐ নাম করিয়াছি।

কৃ। আর গান?

নী। তা বলিতে পারি না।

কৃ। সেও কি তবে স্বপ্নে?

নী। জানি না,—আমার মনে হইতেছে না।

কৃ। তেমন স্পষ্ট স্পষ্ট কথা—তেমন ভাববিশুদ্ধ,—তেমন তান-লয়-সম্পূর্ণ গান, স্বপ্নে করা যায়! কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। কিন্তু তুমি সত্য বলিতেছ কি, যে জাগরণে অমন কিছুই কর নাই? আমার গুরুকন্যার নিকট আমি মিথ্যার প্রত্যাশা করি না।

নী। আমি সত্য বলিতেছি।

কৃষ্ণগোবিন্দ চলিয়া গেলেন। কিন্তু তাঁহার প্রাণের মধ্যে একটা সন্দেহ, একটা আতঙ্ক, একটা ধাঁধাঁ লাগিয়া গেল। বিশাখা অজিতনাথের নাম করিয়াছে—নীরদাও সেই নাম করিল—কিন্তু উভয়ের কেহই তাহার পরিচয় জানে না। বিশাখা মিথ্যা বলিতে পারে—কিন্তু তাঁহার গুরু কন্যা মিথ্যা বলিবে না!

তবে সে কে? অজিতনাথ কৃষ্ণগোবিন্দের পরিচিত,—কিন্তু সেই ক্ষুদ্র পল্লীগ্রামের—সেই নদীতটান্তরবর্ত্তী ক্ষুদ্রকুটীরবাসী ব্রহ্মচারী অজিতনাথের নাম তাঁহার স্মরণ পথে উদয় হইল না। কে সে? তাহার কথা কেন মনে আসিবে?

তাহার কথা মনে না আসুক, কিন্তু এই আকস্মিক ঘটনাগুলিতে তাঁহাকে বড়ই বিচলিত করিল। স্বপ্নে যে ভবিষ্যৎ দেখা যায়, কোন আত্মার আবির্ভাবে যে ভবিষ্যৎ কাহিনীর অবতারণা

হয়, এসকল বালক ভুলান রূপকথা তিনি বিশ্বাস করিতেন না। কিন্তু ঝটিকাপ্রবাহ উত্থিত হইবার পূর্ব্বে নদীর গর্ভমর্ম্মে যেমন অশান্তির পাক উত্থিত হয়, কৃষ্ণগোবিন্দ বাবুর হৃদয়ের মর্ম্মপ্রদেশে তেমনই একটা প্রদাহ-প্রবাহ উত্থিত হইতেছিল। তিনি অবসন্ন হৃদয়ে আপন শয্যায় গিয়া শয়ন করিলেন, এবং ফৌজদারসাহেবের আদেশ হইতে আর নিজ বাটীর ঘটনাপরম্পরা তাঁহার হৃদয়ে যুগপৎ উদিত হইয়া প্রাণের মধ্যে একটা অশান্তি-কোলাহল তুলিয়া দিতে লাগিল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

প্রভাত হইয়াছে, কিন্তু তখনও উষার সমৃদু শীতলানিল গৃহস্থের উন্মুক্ত গবাক্ষ-পথে, শিশিরসিক্ত কুসুমের দলনিকরে, প্রশান্ত নদীবক্ষে এবং নিশাসমাগম-সুখ-সুপ্ত বিহগ-মিথুনের কলেবরে মৃদুকম্পন তুলিয়া দিয়া মৃদু মৃদু প্রবাহিত হইতেছিল। তখনও শেফালিকা সেই অনিলস্পর্শে মরমে মরিয়া ঝরিয়া পড়িতে-ছিল,—তখনও প্রিয়বাহুবিচ্ছিন্না সুখসম্পুষ্টা কামিনীগণ শয্যা পরিত্যাগ করে নাই,—কেবল কচিৎ দুই এক জন কৃষক-বধূ নিশার স্তিমিত প্রচ্ছন্ন নীরব স্বামীপ্রেমের নীরব কবিতা নীরব প্রাণে ভাবিতে ভাবিতে কুম্ভ কক্ষে লইয়া জল আনিতে জলাশয়াভিমুখে যাইতেছিল, কচিৎ কোন দুষ্ট ছেলে তাহার মাতাকে জুলিয়া লইয়া কেবল গৃহ দরোজায় দাঁড়াইতেছিল, কচিৎ কোন

প্রাচীনা পুষ্প-পাত্র হস্তে লইয়া পুষ্পোদ্যানে প্রবেশ করিতেছিলেন, ক্বচিৎ কোন জেলে সারা নিশি বাঁ'শ জালে মাছ ধরিয়া জলসিক্ত মৎস্যাধার মস্তকে লইয়া গৃহাভিমুখে গমন করিতেছিল, ক্বচিৎ কোন কৃষক অপর কৃষকের গোশালাস্থ এক খণ্ড অগ্নি সংগ্রহ করিয়া নিজ হস্তস্থিত সুগোল বপু, খর্ব্ব নলিচাময় হুঁকার উপরিস্থ কলিকায় তাহা আরোপিত করিয়া লইয়া টানিতে টানিতে গৃহে ফিরিতেছিল, এবং বৃক্ষের ডালে ডালে, শ্যাম-সবুজ নবীন পত্র রাশির মধ্যে বসিয়া পাখীরা প্রভাতী ধরিয়াছিল।

এই সময় কৃষ্ণগোবিন্দবাবুর বিস্তৃত প্রাসাদের অদূরস্থিত এক ক্ষুদ্র বাটীর ক্ষুদ্র দ্বার বাম হস্তে সরাইয়া দিয়া এক দিব্য কান্তি ব্রাহ্মণ বাহির হইলেন।

ব্রাহ্মণের বয়স প্রায় চল্লিশ বৎসর উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। সুঠাম সুদীর্ঘ দেহ,—আজানুলম্বিত বাহুযুগল। মস্তকে এক দীর্ঘ শিখা—তপ্তোজ্জ্বল-কনক-কান্তি-ছটা দেহ হইতে বিকীর্ণ হইতেছিল। বামহস্তে একখানি কোশা,—দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুলী দ্বারা তাহাতে মৃদু মৃদু আঘাত করিয়া মৃদু মৃদু স্বরে মধুর কণ্ঠে গাহিতে গাহিতে চলিলেন,—

"চন্দনচর্চ্চিত নীলকলেবর পীতবসন বনমালী,
কেলিচলন্মণি-কুণ্ডলমণ্ডিত গণ্ডযুগস্মিতশালী।
হরিরিহ মুগ্ধবধূনিকরে, বিলাসিনি বিলসতি কেলিপরে॥
পীনপয়োধরভারভরেণ হরিং পরিরভ্য সরাগম্।
গোপবধূরনুগায়তি কাচিদুদঞ্চিতপঞ্চমরাগম্॥
কাপি বিলাসবিলোলবিলোচনখেলনজনিতমনোজম্।
ধ্যায়তি মুগ্ধবধূরধিকং মধুসূদনবদনসরোজম্॥

কাপি কপোলতলে মিলিতা লপিতুং কিমপি শ্রুতিমূলে।
চারু চুচুম্ব নিতম্ববতী দয়িতং পুলকৈরনুকূলে॥
কেলিকলাকুতুকেন চ কাচিদমুং যমুনাজলকূলে।
মঞ্জুলবঞ্জুলকুঞ্জগতং বিচকর্ষ করেণ দুকূলে॥
করতলতালতরলবলয়াবলিকলিতকলস্বনবংশে।
রাসরসে সহনৃত্যপরা হরিণা যুবতিঃ প্রশশংসে॥
শ্লিষ্যতি কামপি চুম্বতি কামপি রময়তি রামাম্।
পশ্যতি সস্মিতচারু পরামপরামনুগচ্ছতি বামাম্॥
শ্রীজয়দেবভণিতমিদমদ্ভুতকেশবকেলিরহস্যম্।
বিপিনবিনোদকলাবলিতং বিতনোতু শুভানি যশস্যম্॥
বিশ্বেষামনুরঞ্জনেন জনয়ন্নানন্দমিন্দীবর-
শ্রেণীশ্যামলকোমলৈরুপনয়ন্নঙ্গৈরনঙ্গোৎসবম্।
স্বচ্ছন্দং ব্রজসুন্দরীভিরভিতঃ প্রত্যঙ্গমালিঙ্গিতঃ,
শৃঙ্গারঃ সখি মূর্ত্তিমানিব মধৌ মুগ্ধো হরিঃ ক্রীড়তি॥
রাসোল্লাসভরেণ বিভ্রমভৃতামাভীরবামভ্রুবা
মভ্যর্ণে পরিরভ্য নির্ভরমুরঃ প্রেমান্ধয়া রাধয়া।
সাধু ত্বদ্বদনং সুধাময়মিতি ব্যাহৃত্য গীতস্তুতি-
র্ব্যাজাদুদ্ভটচুম্বিতঃ স্মিতমনোহারী হরিঃ পাতু বঃ॥"

ব্রাহ্মণ ক্রমে ক্রমে নদীতীরে গিয়া উপস্থিত হইলেন। তৎপরে জলে নামিয়া স্নান করিলেন, এবং কোশা লইয়া তর্পণ করিলেন,--তৎপরে আহ্নিক করিয়া বাড়ী অভিমুখে চলিয়া গেলেন।

যখন তিনি কিয়দ্দূর গমন করিয়াছেন, তখন সেই পথে কৃষ্ণগোবিন্দ বাবু আগমন করিতেছিলেন,—তিনিও প্রাতর্ভ্রমণে বাহির হইয়াছিলেন।

কৃষ্ণগোবিন্দবাবু প্রত্যহই প্রাতর্ভ্রমণে বাহির হইতেন। এই সময় তাঁহার সহিত কোন লোকজন থাকিত না,—একাকীই ভ্রমণ করিতেন, এবং প্রত্যহই প্রায় এই পথে যাইতেন।

যিনি নদী হইতে স্নান করিয়া ফিরিতেছিলেন, তিনি এই গ্রামের তর্কালঙ্কার ঠাকুর। তর্কালঙ্কার ঠাকুর কৃষ্ণগোবিন্দবাবুর কুলপুরোহিত।

তর্কালঙ্কারঠাকুর প্রত্যহই এই সময় স্নান করিয়া যাইতেন, প্রত্যহই কৃষ্ণগোবিন্দ বাবু এই পথে প্রাতর্ভ্রমণ করিয়া যাইতেন, সুতরাং উভয়ের এই সময় এই পথে [illegible] সাক্ষাৎ হইত,—এবং দর্শন হইলে প্রত্যহই কুল-পুরোহিতের চরণে এই সময় কৃষ্ণ-গোবিন্দবাবু ভক্তিসহকারে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিতেন। আজিও উভয়ের সাক্ষাৎ হইল, এবং যজমান প্রণাম করিলেন, পুরোহিত দক্ষিণ হস্ত উত্তোলন পূর্ব্বক আশীর্ব্বাদ করিলেন। তৎপরে তর্কালঙ্কারঠাকুর কৃষ্ণগোবিন্দবাবুর মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন,—"কৃষ্ণগোবিন্দ, তোমার আকৃতি এত ম্লান কেন? কল্য রাত্রে কি ভাল নিদ্রা হয় নাই?"

কৃ। আজ্ঞা না, কল্য নিদ্রারও ব্যাঘাত হইয়াছিল,—তদ্ভিন্ন কল্য পথশ্রমও অধিক হইয়াছিল।

ত। হাঁ, হাঁ,—সে সংবাদ লওয়া হয় নাই,—কথাটা ভুলিয়াই গিয়াছিলাম,—তুমি যে ফৌজদারসাহেবের নিকট গমন করিয়াছিলে,—সেখানে কি হইল?

কৃ। সেখানে যাহা হইল, তাহা অতি অদ্ভুত,—সেই অদ্ভুত আদেশ কি প্রকারে প্রতিপালন করিব, তাহাই ভাবিতে ভাবিতে, রাত্রি প্রায় দ্বিপ্রহরের সময় বাড়ী আসিয়া পঁহুছিয়াছিলাম—কিন্তু

বাড়ী আসিয়া আবার যাহা দেখিলাম, তাহা আবার তাহা হই-তেও অদ্ভুত। সেই কারণেই আমার কাল সারারাত্রির মধ্যে একবারও নিদ্রাকর্ষণ হয় নাই, এবং সারারাত্রি চিন্তার বৃশ্চিক-দংশনে কাটাইয়া দিয়াছি। এক্ষণে আপনার পরামর্শ ব্যতীত আমার হৃদয়ে শান্তি আসিবে না,—অতএব প্রাতঃসন্ধ্যাদি সমাপন করিয়া আমার ওখানে গমন করিবেন,—আমি বড় বিপন্ন।

তর্কালঙ্কারঠাকুর ফৌজদার সাহেবের অদ্ভুত আদেশের মর্ম্ম-গ্রহণ করিতে না পারিলেও সবিশেষ বিস্মিত হইলেন না, কারণ—তাহার অদ্ভুতত্ব অনেক অনেক আছে। কিন্তু সেই নিশীথ রাত্রে বাড়ী আসিয়া হঠাৎ কি অদ্ভুত ব্যাপার দর্শন করিয়া সমস্ত রজনী বিনিদ্র কাটাইয়াছেন,—তাহাই বুঝিতে পারিলেন না; তবে এক একবার মনে হইতে লাগিল,—রমণীঘটিত ব্যাপার একটা কিছু ঘটিয়া গিয়া থাকিবে। যাহা হউক, সেস্থলে আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করা যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিলেন না। বলিলেন,—"আমি আপন কার্য্য সম্পন্ন করিয়াই তোমার ওখানে আসিতেছি।"

তর্কালঙ্কারঠাকুর চলিয়া গেলেন। যখন তিনি তাঁহার ক্ষুদ্র কুটীরপ্রাঙ্গণের দ্বার ঠেলিয়া গৃহচত্বরে উপস্থিত হইলেন, তখন পূর্ব্বদিগ্‌ভাগে জবাকুসুম-সঙ্কাশ মহাদ্যুতি দিবাকরের নবোদিত রশ্মি ফুটিয়া উঠিয়াছিল,—এবং সেই রক্তোজ্জ্বল কনকপ্রভা তর্কা-লঙ্কারের শ্বেতকৃষ্ণমিশ্র কেশরাশির উপর দিয়া প্রাঙ্গণমধ্যস্থ শেফা-লিকাতলস্থ কুসুম-সংগ্রহমানা তর্কালঙ্কার গৃহিণীর মুখের উপর পতিত হইল।

তর্কালঙ্কার তুলসীমণ্ডপ-সন্নিধানে কোশাকুশি রক্ষা করিয়া

বলিলেন,—"ব্রাহ্মণী শর্ম্মা, পুষ্প চয়নে এতই নিমগ্না হইয়াছ, যেন সাংখ্যদর্শনের পুরুষতত্ত্বে নিমগ্ন হইয়া পড়িয়া রহিয়াছ !"

তর্কালঙ্কার মহাশয়ের ব্রাহ্মণীশর্ম্মা পূর্ব্বাভিমুখী হইয়া পুষ্প কুড়াইতেছিলেন, সুতরাং পশ্চাদ্দিকস্থ স্বামীকে দর্শন করিতে পারেন নাই। স্বামী-কণ্ঠস্বর শ্রবণ করিয়া, পশ্চাৎ ফিরিয়া চাহিয়া দেখিলেন এবং তাড়াতাড়ি উঠিয়া অঞ্চলাগ্রভাগে গলদেশ বেষ্টন পূর্ব্বক তর্কালঙ্কারঠাকুরের পায়ের নিকট আসিয়া ঢিপ করিয়া এক প্রণাম করিলেন। ইহা প্রত্যাহিক প্রাভাতিক ক্রিয়া, সুতরাং নূতনত্ব কিছু না দেখিয়া তৎসম্বন্ধে তর্কালঙ্কারঠাকুর আর কোন প্রশ্ন করা সঙ্গত বিবেচনা করিলেন না। ব্রাহ্মণী কিন্তু উঠিয়া দাঁড়াইয়াই তর্কালঙ্কারের পূর্ব্বকথিত বাক্যের প্রত্যুত্তর দিয়া দিলেন। মৃদু হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—"আমরা মেয়ে মানুষ, সাংখ্যদর্শনও পড়িনি, পুরুষ-প্রকৃতি-তত্ত্বও বুঝিনি,—তোমরা পুরুষ,—বিশেষ তুমি শাস্ত্রজ্ঞ—সব বোঝ, সব জান—কাজেই ধ্যানেও নিমগ্ন হও। আমি জ্ঞান হইয়া পর্য্যন্ত চিনি তোমাকে, জানি তোমাকে, বুঝি তোমাকে, ভাবিও তোমাকে।"

ত। শোন ব্রাহ্মণী, আমাদের মত তোমরা যদি পুঁথি ঘেটে পণ্ডিত হ'তে, তবে বুঝি আমাদের হাতে মালসা উঠ্‌তো।

ব্রা। সহসা এত জ্ঞানের উদয় কোথা হ'তে হল ?

ত। বলি শোন,—তোমাদের প্রাণে যে স্বভাব-কবিত্ব নিহিত আছে,—তোমরা বিজ্ঞান না পড়িয়া বৈজ্ঞানিক, দর্শন না পড়িয়া দার্শনিক, কাব্য না পড়িয়া কবি। জগতে এমন কোন বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক বা কবি জন্মে নাই,—যে তাহার গৃহিণীর নিকট সেই বিদ্যায় পরাস্ত নয়।

ব্রা। পরাস্ত কেন হয়, তার কি কোন খোঁজ তোমাদের পুঁথির মধ্যে পাওয়া যায় না ?

ত। কৈ, তাত পাই না।

ব্রা। তবে আমাদের পুঁথিতে যা লেখে, তা শোন। তোমরা গ্রন্থ অধ্যয়ন কর, আর রমণী তোমাদিগকে অধ্যয়ন করে,—কাজেই যে স্ত্রীর স্বামী যে বিদ্যায় পারদর্শীই হউক, সে তার স্ত্রীর নিকট পরাস্ত হয়,—তার জ্ঞানের সার ভাগ তার স্ত্রী তাহা হইতেই অধ্যয়ন করিয়া লয়।

ত। সুন্দর উত্তর দিয়াছ। এখন এক খবর শোন।

ব্রা। নূতন খবর ?

ত। হাঁ।

ব্রা। কি খবর ? কোথাও নিমন্ত্রণ আছে না কি ?

ত। নিমন্ত্রণ নহে, আমন্ত্রণ।

ব্রা। সে কোথায় ?

ত। আর কোথায়,—কৃষ্ণগোবিন্দবাবুর বাড়ী।

ব্রা। সে ত' নিত্য ক্রিয়া।

ত। আজ একটা নূতন তত্ত্ব আছে।

ব্রা। তত্ত্ব কথাটা আমার নিকট কিছু বিষম—তত্ত্ব কথার উত্থাপন হইলেই সেই কঠোর ব্রহ্মতত্ত্ব,—দর্শন তত্ত্ব, পরলোক তত্ত্ব, প্রকৃতি ও পুরুষ তত্ত্ব প্রভৃতি কট-মট কথা গুলা মনে পড়িয়া যায়।

ত। না ব্রাহ্মণী, এ সে তত্ত্ব নয়।

ব্রা। তবে এ কি তত্ত্ব ?

ত। সম্ভবতঃ ইহা প্রেমতত্ত্ব হইতে পারে।

ব্রা। ওটাও আমার নিকটে জড়-তত্ত্ব বলিয়া জ্ঞান হয়।

ত। হায় ব্রাহ্মণী,—কখন প্রেম করিলে না, প্রেমের ধারও ধারিলে না। কোন দিন প্রেমের দুইবিন্দু অশ্রুপাতও করিতে দেখিলাম না।

ব্রা। ওটা যাদের হাতে কাজ থাকে না, তারাই করে—আমার হাতে রাত্রি দিন কাজ,—আমি তোমাকে ভেবেই কুলাতে পারি না,—আবার কাঁদি কখন? যাক্, কি খবরটা বল না?

ত। খবর কি জান,—কাল নাকি অনেক রাত্রে কৃষ্ণগোবিন্দ বাড়ী আসিয়া পঁহুছান—সেই রাত্রে বাড়ীতে এক অদ্ভুত বিষয় দর্শন করিয়া সারারাত্রি নিদ্রা যাইতে পারেন নাই।

ব্রা। সে অদ্ভুত দর্শন ত কোন ভৌতিকক্রিয়াও হতে পারে,—প্রেম তা বুঝলে কি করে? বুড়ো হ'লে, তবু প্রেমের ঘোর কাটিল না!

ত। রাত্রে অদ্ভুত দর্শন করিয়া সারারাত্রি নিদ্রা হয় না,—ইহার ভিতর প্রেমের একটু ছিটা-ফোটা থাকা খুব সম্ভব।

ব্রা। কে তোমায় এ ভোরের বেলা এসংবাদ প্রদান করিল?

ত। কৃষ্ণগোবিন্দবাবু স্বয়ং। পথে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল। তাঁহার মুখের ভাব দেখিয়া, তাঁহাকে আন্তরিক কষ্টান্বিত বলিয়াই জ্ঞান হইল।

ব্রা। আহা, তিনি আমাদের প্রতিপালক,—তবে এখনই সেখানে যাও। যাতে যা হয়, সৎপরামর্শ দিয়ে এস।

ত। যাইবার জন্য প্রস্তুত আছি,—কেবল অনুমতি আর নামাবলিখানির অপেক্ষা।

তখন তর্কালঙ্কার-ব্রাহ্মণী হাসিতে হাসিতে গৃহমধ্যে গমন করিলেন, এবং একখানি গরদের নামাবলি আনিয়া তর্কালঙ্কারের হস্তে প্রদান করিয়া বলিলেন,—"এই নাও নামাবলি।"

তর্কালঙ্কারও মৃদু হাসিলেন। হাসিয়া বলিলেন,—"আর অনুমতি?"

ব্রাহ্মণী দন্তে অধর কাটিয়া বলিলেন,—"সেটা পার্‌ব না!"

তর্কালঙ্কার বলিলেন,—"তবে তোমার নামাবলি ফিরাইয়া লও।"

"কিন্তু এখনই ফিরিয়া আসা চাই।"—গৃহিণী এই কথা বলিলে, তর্কালঙ্কার সেই লুলিতকুন্তলে এক টান দিয়া বাহির হইলেন এবং অদূরে দীর্ঘ নারিকেল বৃক্ষের শাখাগ্রে বসিয়া কোকিল তাহার সাধা গলায় একবার ডাকিয়া উঠিল,—কু—উ—উ।

কঠোর শাস্ত্রদর্শী, নামাবলি-স্কন্ধ, দীর্ঘশিখাসমন্বিতমস্তক স্থূলদেহী তর্কালঙ্কার আর তদীয় লুলিতকুন্তলা প্রৌঢ়া ব্রাহ্মণী, ইহাদিগের ক্ষণিক বিরহ লইয়া বা দর্শন করিয়া যে, কোকিল তাহার সাধা পঞ্চমে ডাকিয়া উঠিয়াছিল, একথা কোন পাঠক পাঠিকা বিশ্বাস করিবেন না,—আমিও তাহা বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত নহি। হয়ত এই প্রভাত-সমীরণ-সংস্পর্শে দুল্যমান কোন পুষ্পিতা লতা-কুঞ্জে কোন নবীনা যুবতী আপন দেহভার রক্ষা করিয়া কোন দীর্ঘ প্রবাসীযুবকের জন্য দীর্ঘশ্বাস ফেলিতেছিলেন, আর তাহাই দেখিয়া কোকিল ডাকিয়া উঠিয়াছিল,—কিন্তু ঘটনাক্রমে তর্কালঙ্কারের ব্রাহ্মণীর কাণে সেই সময়ে ঐ স্বরটা প্রবেশ করিয়াছিল, তাহাতে ব্রাহ্মণীর কি হইয়াছিল না হইয়াছিল,

তাহাও আমি বলিতে পারি না,—কিন্তু তিনি একটু বিরস বদনে আবার পুষ্পাহরণে নিরত হইলেন।

এদিকে তর্কালঙ্কারঠাকুর তাঁহার মস্তকের দীর্ঘ শিখা আন্দোলিত করিতে করিতে, নামাবলি স্কন্ধে করিয়া কৃষ্ণগোবিন্দবাবুর বাড়ী গিয়া দর্শন দান করিলেন।

তিনি সদরদ্বারে উপস্থিত হইবামাত্র একজন ভৃত্য তাঁহাকে ডাকিয়া লইয়া সদর বাড়ীর একটা নিভৃত কক্ষে লইয়া গেল। বোধহয়, সে তাঁহারই অপেক্ষা করিয়া পথে দাঁড়াইয়া ছিল।

ভৃত্য যে গৃহে তাঁহাকে লইয়া গেল, সেই গৃহে একটা কৌচের উপরে অর্দ্ধশয়নাবস্থায় কৃষ্ণগোবিন্দ বাবু শটকায় ধূমপান করিতেছিলেন। তর্কালঙ্কারঠাকুরকে দেখিয়া তিনি শটকার নল পরিত্যাগ করিয়া একটু উঠিয়া বসিলেন, সম্মুখে আর একখানি কাষ্ঠাসন ছিল, তর্কালঙ্কারঠাকুর তাহাতে উপবেশন করিলেন।

কৃষ্ণগোবিন্দবাবু বলিলেন,—"আপনার নিকট যে বিষয় বলিয়াছি, তাহা বোধ হয়, আপনি ততটা গুরুতর বলিয়া জ্ঞান করেন নাই,—কিন্তু আমি বড়ই বিপন্ন ও চিন্তান্বিত হইয়া পড়িয়াছি।"

ত। ভগবান তোমাকে রক্ষা করুন,—এক্ষণে সমস্ত কথাগুলি আমি শুনিতে চাহি।

তখন কৃষ্ণগোবিন্দবাবু ফৌজদারসাহেবের আদেশ ও বাড়ী আসিয়া দুর্গদ্বারে বিশাখা ও যে অদ্ভুত রমণীকে দর্শন করিয়াছিলেন, তৎপরে বিশাখার সহিত কথোপকথন ও নীরদার গান, অজিতনাথের নাম করা প্রভৃতি সমস্ত আদ্যোপান্ত বর্ণন করিয়া

বলিলেন—"এই সকল ঘটনাপরম্পরায় আমার চিত্তকে অত্যন্ত অবসন্ন করিয়া ফেলিয়াছে, এক্ষণে উপায় কি?"

তর্কালঙ্কারঠাকুর কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন,—"ফৌজদারসাহেবের পুত্রের অনুসন্ধান আরম্ভ করুন,—সন্ধানে মিলিতেও পারে। যদিই না মিলে, তখন হয় একটা উপায় স্থির করা যাইবে।

কৃ। দুর্গদ্বারে যে অদ্ভুত রমণীকে দর্শন করিয়াছিলাম, তৎসম্বন্ধে আপনি কি বিবেচনা করেন? বিশাখার কথা কি আপনার সত্য বলিয়া জ্ঞান হয়?

ত। বিশাখা যদি সত্য বলিয়া থাকে, তবে সে রমণী কোন প্রেতাত্মা হইতে পারে।

কৃ। আপনি বলেন কি? প্রেতাত্মা! প্রেতাত্মা আমি বিশ্বাস করি না।

ত। কেন কর না?

কৃ। আমার বিশ্বাস, ওসকল কিছু নাই। আমার জ্ঞান হইতেছে, বিশাখা কোন দুশ্চরিত্রা রমণীর সহায়তায় দুর্গদ্বারস্থ কোন সৈনিকের সহিত গুপ্তপ্রণয়ে আবদ্ধ হইয়াছে,—আর নয়ত কোন বহিঃশত্রুর ইহা ষড়যন্ত্র। আপনি একটা অলৌকিক পদার্থের কল্পনা করিয়া চিন্তাকে বিপথে লইবেন না। আসল বিষয়ের চিন্তা করুন।

ত। তবে একবার বিশাখাকে এখানে আনাও।

কৃষ্ণগোবিন্দবাবু বিশাখাকে আনিবার জন্য একজন ভৃত্যকে পাঠাইয়া দিলেন।

নবম পরিচ্ছেদ।

ব্যাধ-জাল-জড়িত হইয়া হরিণী যখন সেই ব্যাধের নিকট আনীত হয়, তখন তাহার অবস্থা যেমন হয়, বিশাখাও সেইরূপ অবস্থায় কৃষ্ণগোবিন্দ বাবুর সমীপে আসিয়া উপস্থিত হইল। বাত্যাবিতাড়িত বেতসীবৎ তাহার সর্ব্বাঙ্গ কম্পিত হইতেছিল। আঁখিদ্বয় স্থির অথচ করুণাকাঙ্ক্ষী। পক্কবিম্ববিনিন্দিত ওষ্ঠ-যুগল মৃদু কম্পিত,—সুন্দর মুখমণ্ডলে ভয়ের একটা মলিন রেখা ছড়াইয়া পড়িয়াছে। সে কিজন্য এত ভীত হইতেছে, তাহা নিজেই বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছে না—কিন্তু তথাপি আতঙ্কে সে অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িতেছিল। সে কোন প্রকার পাপকার্য্যে লিপ্ত হয় নাই,—তাহার দ্বারা তাহার প্রতিপালকের কোন প্রকার অনিষ্ট সাধিত হয় নাই, বা তাহার জীবন থাকিতে তাহা হইতেও পারে না,—তবে তাহার কিসের ভয়! সে বিচার করিয়া, ভাবিয়া চিন্তিয়া তাহার কিছু স্থির করিতে পারিতেছিল না। কিন্তু সে বাহিরে গিয়া যে অজানা-অচেনা এক রমণীর সহিত সেই নিশীথ-কালে কথা কহিতেছিল,—আর তাহাই দেখিয়া তাহার প্রতি-পালক—তাহার মনিব সন্দেহ করিয়াছেন—ইহাতেই সে এত ভীত হইয়া পড়িতেছিল। যদি তিনি অবিশ্বাস করেন, তবে বিশাখার বাঁচিয়া লাভ কি!

বিশাখা ভৃত্যের আদেশে তাহারই সঙ্গে কৃষ্ণগোবিন্দ বাবুর সম্মুখে গিয়া উপস্থিত হইল। তর্কালঙ্কার ঠাকুরও তথায় উপস্থিত

ছিলেন। তর্কালঙ্কার একবার ভাল করিয়া বিশাখার আদ্যোপান্ত চাহিয়া দেখিলেন। তারপর গম্ভীর অথচ স্নিগ্ধ স্বরে বলিলেন,—"বিশাখা, তুমি আমাকে চেন কি?"

বিশাখা গলা ঝাড়িয়া ধরা গলায় ভরা আওয়াজে বলিল,—"আপনাকে সকলেই চেনে। আমি এই বাড়ীতেই প্রতিপালিত—আমি আপনাকে কেন চিনিব না?"

ত। আমি ব্রাহ্মণ,—কৃষ্ণগোবিন্দ বাবুর পুরোহিত। আমার নিকট তুমি মিথ্যা কথা বলিতে সাহস করিবে কি?

বি। মিথ্যা কথা কাহারও নিকট বলিতে নাই।

ত। তথাপি আমি ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণের নিকট মিথ্যা কথা বলিলে মহা পাতক হয়।

বিশাখা সেকথার কোন উত্তর করিল না। কেবল উদাস নয়নে স্মিতমুখে তর্কালঙ্কারঠাকুরের মুখের দিকে একবার চাহিল। তাহার কৃষ্ণতার দীর্ঘনয়নের সেই চাহনী তর্কালঙ্কার ঠাকুরের চাহনীর সহিত মিলিত হইল,—তিনি বুঝিলেন, বিশাখা সরলা। জিজ্ঞাসা করিলেন,—"গত কল্য রাত্রে তুমি দুর্গদ্বারে কেন গিয়াছিলে?"

বি। কেন গিয়াছিলাম, তাহা কর্ত্তার নিকট বলিয়াছি।

কর্ত্তা অর্থে কৃষ্ণগোবিন্দ বাবু।

কৃষ্ণগোবিন্দ বাবু রুক্ষভাষায় বলিলেন,—"সে সকল কথা ছাড়িয়া দিয়া আসল কথা বল।"

তর্কালঙ্কারঠাকুর নয়নেঙ্গিতে কৃষ্ণগোবিন্দ বাবুকে আপাততঃ কোন কথা বলিতে নিষেধ করিলেন। তারপরে বিশাখার মুখের দিকে চাহিয়া, তাহার নয়নে নয়ন সংস্থাপন করিয়া বলিলেন,—

"তোমার প্রভুর নিকটে বলিয়াছ, কিন্তু আমার নিকটে কোন কথা বল নাই, কাজেই আমি সে কথা তোমার নিকটে শুনিতে পাই নাই। সত্য করিয়া আমার নিকটে বল, সে ঘটনা কি? মিথ্যা বলিওনা—মিথ্যা বলিলে আমি বুঝিতে পারিব যে, তুমি মিথ্যা বলিতেছ।"

বিশাখা গত রাত্রে কৃষ্ণগোবিন্দ বাবুর নিকটে যে সকল কথা বলিয়াছিল, অবিকল সেই সকল কথা তর্কালঙ্কারঠাকুরের নিকটে নিবেদন করিল। কৃষ্ণগোবিন্দ বাবু ভ্রূকুটি করিলেন। তর্কালঙ্কারঠাকুর স্মিতমুখে বিশাখাকে বলিলেন,—"বিশাখা, তোমার একথায় তোমার প্রভু বিশ্বাস করিতেছেন না।"

বিশাখা মৃদু কম্পিত কণ্ঠে বলিল,—"আমি সত্য বলিয়াছি, যদি বিশ্বাস না করেন, আমি কি করিতে পারিব।"

ত। শোন বিশাখা, একথা সহজে কেহই বিশ্বাস করিতে পারে না।

বি। আপনি?

ত। আমিও যদি বিশ্বাস না করি?

বি। তাহা হইলে আর কেহই বিশ্বাস করিবে না।

ত। কেন?

বি। আপনি পণ্ডিত—আপনি সব জানেন, সব বোঝেন,—আপনি যদি ইহা বুঝিয়া না দেখেন, আপনি যদি ইহার কারণ নির্দ্দেশ না করিতে পারেন, তবে আর কে করিবে?

ত। আমিও এই ঘটনার হেতু ও সত্য নির্দ্দেশে অক্ষম হইতেছি।

বিশাখা আর কোন কথা বলিল না। সে দাঁড়াইয়াছিল

বসিয়া পড়িল। বিশাখা কাঁদিতেছিল,—তাহার নীলায়ত চক্ষু হইতে জলবিন্দু ঝরিতেছিল।

তর্কালঙ্কারঠাকুর কৃষ্ণগোবিন্দ বাবুর মুখের দিকে চাহিলেন। কৃষ্ণগোবিন্দ বাবু বলিলেন,—"ঠাকুর! ও কর্ম্ম আপনাদের নয়। দুষ্টলোককে বশীভূত করা শাস্ত্রদর্শী ভগবৎ-পরায়ণ সাত্বিক ব্রাহ্মণের দ্বারা হয় না। স্ত্রীলোক যখন পাপ-পথে পদার্পণ বা বিচরণ করে, তখন তাহারা বিষধরী সর্প হইতেও ক্রূর হয়। খলতা, মিথ্যাবাদীতা তাহাদের অস্থি-মজ্জায় খেলিতে থাকে।"

জলভরা উদাস নয়নের করুণ চাহনিতে বিশাখা একবার তর্কালঙ্কার ঠাকুরের মুখের দিকে চাহিল। তর্কালঙ্কার ঠাকুর কৃষ্ণগোবিন্দ বাবুকে ইঙ্গিত দ্বারা জানাইলেন, এই সময় একবার বিশাখাকে ভৎর্সনা করা হউক। কৃষ্ণগোবিন্দ বাবু ইঙ্গিত মাত্রে অতি পরুষ-স্বরে বিশাখাকে বলিলেন,—"পাজী বেটি, তুই কাহাদের নিকট উপস্থিত আছিস্ জানিস্। সাবধানে কথা বল্—যদি আসল কথা প্রকাশ না করিস্, তোকে যথোচিত অপমান করিব। তোর মাথার চুল কাটিয়া গাধার পৃষ্ঠে চড়াইয়া নগর ভ্রমণ করাইয়া তারপরে দেশ হইতে দূর করিয়া দিব।"

কম্পিত-কলেবরা ভীতা চকিতা বিশাখা আরও বিবশা হইল। কিন্তু দারু-মূর্ত্তির ন্যায় নিশ্চল হইয়া রহিল। সে কথার কোন প্রকার উত্তর করিল না।

কৃষ্ণগোবিন্দ বাবু পুনরপি বলিলেন,—"বিশাখা, তোকে প্রতিপালন করিয়া অবশেষে এইরূপ প্রকারে অপমানিত ও বিতাড়িত করিতে হইবে তাহা আমি স্বপ্নেও ভাবি নাই। তোর অদৃষ্ট জানিয়া আমারও কষ্ট হইতেছে।"

বিশাখার দুই চক্ষু দিয়া অবিরল জলধারা নির্গত হইতে লাগিল। কিন্তু সে পূর্ব্ববৎ নীরব। তখন তর্কালঙ্কার ঠাকুর বলিলেন,—"শোন বিশাখা, তুমি কিছু কৃষ্ণগোবিন্দের কন্যা বা আত্মীয়া নহ। যদিই পাপ করিয়া থাক, যদিই লোকের কুপরামর্শে পড়িয়া কোনরূপ অসৎকর্ম্ম করিয়া থাক, তাহাতে কৃষ্ণগোবিন্দের সবিশেষ কোন ক্ষতি হয় নাই। সত্য কথা বল—উনি তোমাকে ক্ষমা করিবেন।"

তথাপি বিশাখা কোন উত্তর করিল না। সে পূর্ব্ববৎ কাঁদিতে লাগিল।

কৃষ্ণগোবিন্দ বাবু তখন বিশাখাকে আরও কঠোর স্বরে পরুষ-বাক্যে বিবিধ প্রকার ভৎর্সনা করিলেন, কিন্তু বিশাখা পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছিল, তদ্ভিন্ন আর কোন নূতন কথাই বলিল না। অধিকন্তু কাঁদিয়া আকুল হইতে লাগিল। তখন তর্কালঙ্কার ঠাকুর বলি-লেন,—"উহাকে ছাড়িয়া দাও।"

কৃষ্ণগোবিন্দ বাবু বলিলেন,—"না ঠাকুর; তা পারিব না। আমার ঘোর সন্দেহ ও আশঙ্কা হইতেছে যে বিশাখা দ্বারা আমার কোন অনিষ্ট কার্য্যের অনুষ্ঠান আরম্ভ হইয়াছে। যতক্ষণ বিশাখা আসল কথা না বলিবে, ততক্ষণ উহাকে ছাড়িতে পারিব না।"

ত। তবে উহাকে যেখানে বন্দী করিয়া রাখিয়াছিলে, আপাততঃ সেই স্থানেই পাঠাইয়া দাও।

কৃ। আপনার আদেশমতে এখন তাহাই করিতেছি, এবং উহাকে আজিকার সমস্ত দিন সময় দিতেছি, ইহার মধ্যে যদি আসল কথা না বলে, তবে আগামী কল্য প্রত্যূষে উহাকে যথোচিত শাস্তি প্রদান করিব।

ত। তাহাই হইবে।

তখন কৃষ্ণগোবিন্দ বাবু ভৃত্যকে আদেশ করিলেন,—"হতভাগিনীকে যে গৃহ হইতে আনিয়াছিস্, সেই গৃহে আবার বন্দী করিয়া রাখিয়া আয়,—যেন কোন প্রকারে পলায়ন করিতে না পারে।"

ভৃত্য বিশাখাকে উঠিতে আদেশ করিল। যন্ত্রচালিত পুতুলের ন্যায় বিশাখা উঠিয়া ভৃত্যের সঙ্গে চলিয়া গেল।

তখন কৃষ্ণগোবিন্দ বাবু তর্কালঙ্কার ঠাকুরের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন—"কি বুঝিলেন?"

ত। আমার বিশ্বাস, বিশাখা মিথ্যা কথা বলে নাই।

কৃ। সে বিশ্বাস কি প্রকারে করিতে পারিলেন?

ত। বিশাখা পাপ করে নাই,—বিশাখা মিথ্যা কথা বলে নাই,—ইহা আমি তাহার চোখ মুখ দেখিয়া এবং কথা শুনিয়া বুঝিয়াছি।

কৃ। শাস্ত্র সম্বন্ধে আপনাদের যতদূর অভিজ্ঞতা, মানব-চরিত্র বুঝিতে পারা সম্বন্ধে আপনাদের তত অভিজ্ঞতা নাই। আপনাদের পবিত্র হৃদয়ে সহজে পাপের কথা উদিত হয় না, তাই—সকলকে সরল ও নির্দোষ দেখেন।

ত। না, কৃষ্ণগোবিন্দ; বিশাখা নিষ্পাপ ও নির্দোষ এবং সে সত্য কথাই বলিতেছে,—ইহা যেন আমি স্পষ্ট অনুভব করিতে পারিতেছি।

কৃ। যদি আপনার সেই অনুমানই সত্য হয়, তবে ঘটনা সম্বন্ধে আপনি কি বিবেচনা করিতেছেন?

ত। আমার বিশ্বাস, এই ঘটনা নিশ্চয়ই অলৌকিক।

কৃ। আপনি পরম পণ্ডিত, আপনি দার্শনিক, আপনি পদার্থ-বিজ্ঞানবিৎ—আপনি কি একটা কিম্ভূত-কিমাকার অলৌকিক কার্য্য বিশ্বাস করেন?

ত। যাহা মানব-বুদ্ধির অতীত, যাহা সচরাচর ঘটে না।—যাহা মানব তাহার স্থূল চক্ষুতে ইচ্ছা করিলেই দেখিতে পায় না, বা যে কার্য্যের রহস্য উদ্ভব করিতে সক্ষম হয় না, এমন কার্য্য গুলিকে অলৌকিক বলিলে ক্ষতি আছে কি?

কৃ। মানুষে বুঝিতে পারে না, বা বিশ্লেষ করিতে পারে না, এমন কোন কাজ আছে কি? যে কাজ আমি বুঝিতে পারি না, তাহা আপনি বুঝিতে পারেন, আপনি যাহা না বুঝিতে পারেন, তাহা আপনার চেয়ে যিনি পণ্ডিত তিনি বুঝিতে পারেন।

ত। সে কথা ঠিক। তাহা যদি না পারিত তবে অলৌকিক কার্য্যও যে আছে, তাহার প্রমাণ হইত না। যাঁহারা সাধনবলে অলৌকিক শক্তি লাভ করিয়াছেন, তাঁহারাই অলৌকিক কার্য্য সকল অলৌকিক চক্ষুতে দর্শন করিয়া লিপিবদ্ধ করিয়া লিখিয়াছেন। আমাদের লৌকিক জ্ঞান বা চক্ষুর তাহা বিষয়ীভূত নহে। যাঁহারা লৌকিক দেহে অলৌকিক চক্ষু লাভ করিয়া অলৌকিক দর্শন করিয়াছেন, তাঁহাদের কথাতেই আমাদের তাহা বিশ্বাস করিতে হয়।

কৃ। আপনি কি বলেন এই সকল কার্য্য ভৌতিক?

ত। আমার তাহাই যেন মনে হইতেছে।

কৃ। ভূত মানুষ মরিয়া হয়?

ত। তাই হয় বৈ কি।

কৃ। হাঁ হাঁ ঠাকুর, একটি মরা মেয়ে-মানুষের বিশাখায় কি

প্রয়োজন হইয়াছিল যে, রাত্রিকালে তাহাকে দুর্গদ্বারে ডাকিয়া লইয়া গিয়াছিল?

ত। কি প্রয়োজন হইয়াছিল, তাহা তুমি আমি বুঝিব কি প্রকারে! কিন্তু প্রয়োজন হইয়াছে—এমন যেন মনে হয়।

কৃ। না ঠাকুর, ও সকল কথায় আমার একটুও বিশ্বাস হয় না।

ত। সেই রমণীকে না তুমি তোমার মাতার মত আকৃতি-বিশিষ্টা দেখিয়াছিলে?

কৃ। তা দেখিয়াছিলাম, কিন্তু তাহা আমার চক্ষুর ভ্রম হইতে পারে।

ত। চক্ষুর ভ্রম কি হইয়াছিল?

কৃ। সেই রমণীকে আমার মাতার মত দেখা। আমি অত্যন্ত শ্রান্ত ছিলাম,—হয়ত সেই রমণীর আকৃতির কতকটা সাদৃশ্য আমার স্বর্গীয়া মাতার মত হইতেও পারে,—তাই অতটা ভুল হইয়া থাকিবে।

ত। তোমার চক্ষুর যখন ভ্রম হইতে পারে, তখন বুদ্ধিরও যে কিছু ভ্রম হইতে না পারে, তাহা স্থির করিলে কি প্রকারে?

কৃ। বুদ্ধির ভ্রম কি হইবে?

ত। মানুষ মরিয়াও যে জীবন্ত থাকে,—অর্থাৎ সূক্ষ্মদেহ ধারণ করে, তারপরে কামনা-বাসনার ফলভোগ কারণ তাহার নানাবিধ কার্য্য থাকে, তাহা তোমার বুদ্ধির গোচরে আইসে না,—কাজেই বলা যাইতে পারে যে, তোমার বুদ্ধির ভুল হইতে পারে।

কৃ। সে ভুলের কথা ছাড়িয়া দিন,—আমি ওসকল রূপকথা বড় বিশ্বাস করি না।

ত। বুঝিতে পার না,—অর্থাৎ তোমার বুদ্ধির গোচরে আসে না বলিয়াই বিশ্বাস কর না।

কৃ। ক্ষমা করিবেন,—আমি ভূত-প্রেত বিশ্বাস করি না। ওসকল কথা বলিয়া আমাকে আর কেন জ্বালাতন করেন? আপনি বিজ্ঞ, আপনি শাস্ত্রদর্শী,—আপনি আমাকে উপদেশ দিন, এক্ষণে আমি কি করিব?

ত। বিশাখা যাহা বলিল, তাহা আমি সত্য বলিয়াই বিশ্বাস করিতেছি,—কাজেই আমার যুক্তি-পথ আর তোমার যুক্তিপথ সম্পূর্ণ বিভিন্ন,—কাজেই আমার যুক্তি বা পরামর্শ এখন তোমার মনের মত হইবে না,—তুমি যাহা বলিবে, আমিও তাহা সদ্‌যুক্তি বলিয়া বিবেচনা করিতে পারিব না। কাজেই কার্য্য আরও কিছু দূর না ঘটিলে ইহার মীমাংসা হইবে না। অতএব আরও কয়েক দিন অপেক্ষা করিতে হইবে।

কৃষ্ণগোবিন্দ বাবু সে কথার আর কোন উত্তর করিলেন না। তাঁহার মুখমণ্ডলে চিন্তার রেখা আরও মলিনভাবে ফুটিয়া উঠিল।

দশম পরিচ্ছেদ।

তর্কালঙ্কার ঠাকুর কৃষ্ণগোবিন্দ বাবুকে বলিলেন,—"তুমি অত চিন্তা করিও না। ঘটনার প্রতি লক্ষ্য রাখিলে, তাহা নিরাকরণ করাও যাইতে পারিবে। এক্ষণে আমি বিদায় হই।"

কৃষ্ণগোবিন্দ বাবু বলিলেন,—"এব্যাপারের ত এক মীমাংসা হইল, এক্ষণে ফৌজদার সাহেবের আদেশে কি করিব, তাহার পরামর্শ বলুন ?"

ত। ফৌজদার সাহেব নিজে চারিদিকে লোকজন পাঠাইয়া অনুসন্ধান করিয়াও যখন তাহার পুত্রের অনুসন্ধান পায় নাই, তখন সহজে যে, তাহার সন্ধান হইবে, এমন আশা করা যাইতে পারে না। তথাপি নিশ্চিন্ত থাকা হইবে না,—তুমি অদ্য চারিদিকে লোকজন পাঠাও—বিশেষভাবে সন্ধান করাও, দেখা যাক্, কত দূর কি হয়।

কৃ। যদি সন্ধান না হয় ?

ত। তাহা হইলে আর কি করিবে ?

কৃ। আমি আর কিছু না করিলেও ফৌজদার সাহেব যে বিশেষ কিছু করিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

ত। ফৌজদার সাহেব যেরূপ অবিবেচক ও খামখেয়ালী, তাহাতে যে সে একটা অনিষ্টকর ঘটনা ঘটাইয়া তুলিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু অনুসন্ধান করিয়া দেখা যাউক, যদি না পাওয়া যায়,—তখন যে যুক্তি হয় করা যাইবে। এখন আমি তবে যাই।

তর্কালঙ্কার ঠাকুর গাত্রোত্থান করিলেন। তিনি গৃহ হইতে বাহির হইয়া যখন প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইলেন, তখন এক সুন্দর যুবক আসিয়া তাঁহার পাদমূলে প্রণত হইল। যুবকের মস্তকে দীর্ঘ কেশ, পরিধানে গৈরিক বসন,—মুখে মৃদু হাসি। যুবক অজিতনাথ। অজিতনাথকে তর্কালঙ্কার ঠাকুর ভালরূপই চিনিতেন। বিশাখা অজিতনাথের নাম করিলেও এই নিষ্পাপ

যুবককে কেহ মনে করিতে পারে নাই।—অথবা বিভিন্ন গ্রামনিবাসী সর্ব্বপ্রকার সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন এক দরিদ্র যুবককে চিন্তা করা বা এই ঘটনার নায়ক স্থির করা নিতান্তই অসম্ভব। কিন্তু সহসা সম্মুখে অজিতনাথকে উপস্থিত দেখিয়া তর্কালঙ্কার ঠাকুরের হৃদয় যেন একবার কম্পিত হইয়া উঠিল। মনে যেন অজিতনাথ এই নাম প্রতিধ্বনিত হইল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,—"অজিতনাথ, ভাল আছ?"

অজিতনাথ বিনয়-নম্রস্বরে বলিল,—"আজ্ঞা হাঁ, শারীরিক ভাল আছি।"

ত: আর মানসিক?

অ। না ঠাকুর, মানসিক ভাল নহি। যে দেশে বিদেশীর অত্যাচার বা স্বেচ্ছাচারিতা,—যে দেশের বলবান্ সন্তানেরা দুর্ব্বল সন্তানদিগকে কলা-কচুর ন্যায় কাটিয়া সুখী হয়, সে দেশে জন্মিয়া মানসিক সুখ কাহার আছে?

ত। তুমি কি বলিতেছ অজিতনাথ? তুমি কি কাহারও দ্বারা উৎপীড়িত বা অত্যাচারিত হইয়াছ?

অ। না ঠাকুর, আমার উপরে কে অত্যাচার করিবে? আমি কপর্দ্দকহীন মানুষ,—আমার গৃহে সুন্দরী রমণী শূন্য, কাজেই আমার উপরে কে অত্যাচার করিবে? কিন্তু যাহাদের ঐ সকল আছে, তাহাদের উপর যে কি ভীষণ অত্যাচার হইতেছে, তাহা কি আপনি জানেন না? এক দিকে ভারত-বিজয়ী মুসলমানগণের প্রবল অত্যাচার—অপর দিকে ভারত-সন্তান মহারাষ্ট্রীয়গণের লুণ্ঠন-পিপাসা বঙ্গদেশকে ধ্বংসপথে লইয়া চলিয়াছে—দুর্ব্বলের আর্ত্তনাদে বঙ্গে হাহাকার উঠিয়াছে।

ত। তাহা ত আমরা বদ্ধকর্ণে সকলেই শুনিতেছি,—ক্ষমতা নাই, কাজেই প্রতিকার হইতেছে না।

অ। আপনারও মুখে ঐ কথা ঠাকুর? আপনিও বঙ্গবাসী জনসাধারণের ন্যায় অদৃষ্টের দোহাই দিয়া নিশ্চিন্ত হইতে চাহেন।

ত। হাঁ হে অজিত, অদৃষ্টের দোহাই দিয়া অত্যাচার সহ্য করা, বা দুর্ব্বল প্রতিবাসীকে অত্যাচারের বংশদণ্ডে নিষ্পেষিত হইতে দেখা—ওটা বাঙ্গলার জল-মাটির গুণ। আমিত আর বাঙ্গলা ছাড়া অন্য দেশে জন্মি নাই।

অ। বুঝিয়াছি ঠাকুর,—কিন্তু উপদেশ দানে, সৎশিক্ষা-বিতরণে পতিত বাঙ্গালীকে কি উন্নত করা যায় না?

ত। বাঙ্গালী শিক্ষা লাভ করিতে পারে, হামবড়া হইতে পারে, কিন্তু একই মহান্ স্বার্থে—একই মহান্ উদ্দেশ্যে মিলিয়া মিশিয়া কাজ করিতে পারে না,—ইহা তাহাদের লুকান দানবী অভিশাপ! কেন হে, হঠাৎ কি হইয়াছে?

অ। মহারাষ্ট্রীয় অত্যাচারে বঙ্গবাসী আর রক্ষা পায় না।

ত। বর্ত্তমানে কোন স্থানে কোন বিশেষ ঘটনা ঘটিয়াছে বুঝি?

অ। আজ্ঞা হাঁ।

ত। কোথায় এবং কাহার প্রতি?

অ। যাহাদের প্রতি অত্যাচার হইয়াছে, তাহারা আমার পরিচিত নহে। একটি সম্ভ্রান্ত যুবক ও একটি যুবতী রমণীর প্রতি নির্দ্দয় অত্যাচার হইয়াছে।

ত। ঐ যুবক-যুবতী বুঝি স্ত্রী পুরুষ সম্বন্ধে আবদ্ধ?

অ। না,—যুবতীর করুণ বিলাপধ্বনিতে বুঝিয়াছি, তাহার স্বামী মৃত।

ত। ঘটনা-স্থল কোথায়?

অ। আজ্ঞা তাহাতেও একটু গোলযোগ আছে। আজ কয়েক দিন হইল, একদা আমি নিশীথ রাত্রে আমার গৃহ মধ্যে শয়ন করিয়াছিলাম, সহসা কতকগুলি অশ্ব দ্রুতবেগে চলিয়া যাইতেছে, এইরূপ শব্দ প্রাপ্ত হইলাম এবং তাহার সঙ্গে রমণীর করুণ ক্রন্দন ধ্বনি কর্ণে প্রবেশ করিল। আমি তাড়াতাড়ি উঠিয়া ঘটনা জানিবার জন্য তাহাদের পশ্চাদনুসরণ করিলাম,—কিন্তু তাহারা সকলেই অশ্বারোহী—অশ্বগুলি দ্রুতবেগে চলিয়া গেল, আমি আর তাহাদের অনুসরণ করিতে পারিলাম না।

ত। সেই পর্য্যন্ত কি তোমার কার্য্য শেষ হইল?

অ। আজ্ঞা না।

ত। তারপর কি হইল?

অ। আমি তাহাদিগের সঙ্গে যাইতে না পারিলেও তাহাদের অনুসরণ করিতে ক্ষান্ত হইলাম না। অশ্বক্ষুর-চিহ্ন দর্শন করিতে করিতে চলিয়া গেলাম।

ত। কেন গেলে?

অ। ক্রন্দ্যমানা রমণী কে, কেন তাহাকে অশ্বারোহী ব্যক্তিগণ ধৃত করিয়া লইয়া যাইতেছে, তাহার সন্ধান জানিতে।

ত। কি সন্ধান করিতে পারিয়াছ?

অ। অন্য কিছুই সন্ধান করিতে পারি নাই। তবে এই পর্য্যন্ত জানিয়াছি যে, যাহারা রমণীকে ধৃত করিয়া লইয়া গিয়াছে,

তাহারা মহারাষ্ট্রীয় সৈন্য। রমণী এখনও তাহাদের শিবিরে আবদ্ধ আছে।

ত। রমণীর পরিচয় জানিতে পার নাই?

অ। আজ্ঞা না।

ত। আর একটি যুবকের কথা বলিতেছিলে; সে যুবক কে কোথায় দেখিলে?

অ। সে যুবককেও ঐ সঙ্গে ধরিয়া লইয়া গিয়াছিল।

ত। যুবক কে, তাহার কোন সন্ধান পাইয়াছ?

অ। আজ্ঞা না, সবিশেষ কোন পরিচয় পাই নাই,—তবে তাহার পরিচ্ছদাদিতে মোগলবাদশার উচ্চ চিহ্ন বিদ্যমান আছে,—বোধহয় কোন উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী বা রাজকর্ম্মচারীর পুত্র হইবে।

ত। মুসলমান বলিয়া অনুমান হয় কি?

অ। হাঁ, পরিচ্ছদাদি মুসলমান জাতির।

ত। তাহাদিগকে লইয়া মহারাষ্ট্রীয় সৈন্যগণ এখন কোথায় আছে?

অ। পাদপীঠ বাগানের নাম শুনিয়াছেন কি?

ত। হাঁ, শুনিয়াছি—সে এস্থান হইতে বহুদূর, এবং পাদপীঠ বাগান অতিশয় নিবিড় জঙ্গল।

অ। আজ্ঞা হাঁ।

ত। তুমি সেখান হইতে কবে ফিরিয়া আসিয়াছ?

অ। কল্য রাত্রি অবসানকালে বাড়ী আসিয়া পঁহুছিয়াছি।

ত। আজ এখানে কি মনে করিয়া?

অ। আমি দরিদ্র—আমি সহায়হীন, তাই জমিদার

কৃষ্ণগোবিন্দ বাবুর নিকটে আসিয়াছি। তিনি যদি সেই বিপন্ন রমণীর উদ্ধারকল্পে কোনও উপায় করিতে পারেন।

ত। মহারাষ্ট্রীয় সৈন্যের বিপক্ষে কৃষ্ণগোবিন্দ কি করিতে পারিবে? দিল্লীর সিংহাসন যাহাদের ভয়ে কম্পিত—সামান্য বাঙ্গালী জমিদার তাহাদের অত্যচার নিবারণ করিবে?

অ। দেশব্যাপী অত্যাচার নিবারণ তাঁহার ক্ষমতার বহির্ভূত হইতে পারে, কিন্তু একটি রমণীর উদ্ধার সাধন তাঁহার দ্বারা হইতে পারে, মহারাষ্ট্রীয়গণ ধনলোভী।

ত। ভাল, কৃষ্ণগোবিন্দের কাছে চল।

তখন তর্কালঙ্কার ঠাকুর অজিতনাথকে সঙ্গে লইয়া কৃষ্ণ-গোবিন্দ বাবুর নিকট ফিরিয়া গেলেন।

কৃষ্ণগোবিন্দ বাবু তখনও সেইস্থলে সেইপ্রকার ভাবে বসিয়া চিন্তামগ্ন ছিলেন। তর্কালঙ্কার ঠাকুর অজিতনাথকে সঙ্গে লইয়া ফিরিয়া আসিলেন দেখিয়া, কৃষ্ণগোবিন্দ বাবু যেন চমকিয়া উঠিলেন। অজিতনাথ নাম যেন কঠোর স্বরে কে তাহার কর্ণ সমীপে উচ্চারণ করিল।

তর্কালঙ্কার ঠাকুর বলিলেন,—"কৃষ্ণগোবিন্দ! অজিতনাথ আসিয়াছে। একটা সুসংবাদ আছে।"

কৃ। কি সংবাদ?

ত। বোধহয় ফৌজদার সাহেবের পুত্রের সন্ধান পাওয়া যাইবে।

কৃ। কোথায়, কোথায়?

ত। মহারাষ্ট্রীয় শিবিরে। অজিতনাথের কাছে ঘটনা শোন।

অজিতনাথ আদিষ্ট হইয়া যে সকল কথা ইতিপূর্ব্বে তর্কালঙ্কার ঠাকুরের নিকট বলিয়াছিল, পুনরপি তাহা কৃষ্ণগোবিন্দ বাবুর নিকট সবিস্তারে বলিল।

তর্কালঙ্কার ঠাকুর বলিলেন,—"সেই মুসলমান যুবক বোধ হয় ফৌজদার সাহেবের পুত্র হইতে পারে।"

কৃ। হইতে পারে, কিন্তু ঠিক নাই। এক বিষম সমস্যা—আমি নিজে যে মহারাষ্ট্রীয়ের কবল হইতে সেই যুবকের উদ্ধার সাধন করিয়া তাহার পরিচয় লইতে পারিব, সে আশা নাই। আবার ফৌজদার সাহেবকে যদি এই সংবাদ দেই আর সে যুবক যদি তাঁহার পুত্র না হয়, তবে আমার কাঁধে মাথা থাকিবে না। এখন কি করা কর্ত্তব্য ঠাকুর?

ত। কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য স্থির করিতে একটু সময়ের অপেক্ষা করে। ভাল, সন্ধ্যার সময় ইহার পরামর্শ করা যাইবে। অজিতনাথ আজ এই স্থানেই অবস্থান করুক।

কৃ। যে আজ্ঞা, কিন্তু ব্যাপার সহজ বলিয়া বোধ হইতেছে না।

তর্কালঙ্কার ঠাকুর সে কথার কোন উত্তর না দিয়া চলিয়া গেলেন। পথে যাইতে যাইতে ভাবিলেন বিশাখা-বর্ণিত প্রেত-তর্পণের বুঝি এই আচমন-ক্রিয়া।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

অজিতনাথ কৃষ্ণগোবিন্দ বাবুর আদেশে সেবেলা সেখানে অবস্থান করিলেন; এবং যথা সময়ে আহারাদি করিয়া একটি নিভৃত কক্ষাভ্যন্তরে বসিয়া একখানি গ্রন্থ অধ্যয়ন করিতেছিলেন। দিবা-নিদ্রা ব্রহ্মচারীর ধর্ম্মবিরুদ্ধ, কাজেই ব্রহ্মচর্য্য-ব্রতাবলম্বী অজিতনাথ তাহাতে অভ্যাস ও আসক্তি শূন্য।

তখন মধ্যাহ্নকাল। মধ্যাহ্নের প্রখর তপন মধ্য আকাশে বসিয়া আপন মনে কর বর্ষণ করিতেছিলেন। প্রখর তাপে প্রতপ্ত হইয়া ধরণী উষ্ণশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছিল, এবং দূরস্থ ঝাউ-গাছের শোঁ শোঁ শব্দ শুষ্ক ধরণীর আর্ত্ত কণ্ঠস্বরের ন্যায় কাণে বাজিতেছিল। শ্যাম-সবুজ নিবিড় নবীন পত্রাচ্ছাদিত বকুলকুঞ্জমধ্যস্থ দীন পাখীর ক্ষীণকণ্ঠ-বিনিসৃত "ফটিকজল, ফটিকজল"—প্রার্থনা-করুণ ধ্বনি যেন সেই প্রখর রবিকরকাতর স্তব্ধ মধ্যাহ্ন প্রকৃতির মাতৃবক্ষে মর্ম্মাহত বেদনা-কাতর সন্তান-জীবনের নিদারুণ ক্ষোভ ও হাহাকারের ন্যায় ধ্বনিত হইতে-ছিল। বাবুদের বাড়ীর সমস্ত লোকই প্রায় তখন আহারাদি করিয়া গৃহদ্বার বন্ধ করিয়া দিয়া শয্যাগ্রহণ করিয়াছে। কেবল পরিচারিকার দলে কেহ কেহ বা থাল-বাসন লইয়া খিড়কীর পুকুরে গিয়া তাহা ধৌত করিতেছে,—কেহ কেহ ভোজন-গৃহাদি ধৌত করিতেছে, কেহ কেহ বা ছাদ হইতে শুষ্কার্থ-প্রদত্ত বস্ত্র-রাশি তুলিয়া লইয়া যাইতেছে, কেহ কেহ বা অপরের নিদ্রা-সুখ দর্শন করিয়া পরিচারিকা-জীবনের অসারত্ব উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা

করিয়া বাড়ীর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া দিতেছে। কোথাও বা পাচক মহাশয় নিজ কর্ত্তব্য সম্পাদনান্তে এই মাত্র আহার করিয়া আসিয়া, কোন অপেক্ষাকৃত অনধিক বয়স্কা পাচিকাকে তাম্বূল আনয়নে অনুমতি করিয়া, রন্ধন-গৃহের ভিত্তিতে দেহভার বিন্যাস-পূর্ব্বক তদাগমন অপেক্ষায় থেলোহুকায় দম কসিতেছেন।

দ্বিতলে নবীনাগণ দল বাঁধিয়া দশ-পঁচিশ খেলিতে আরম্ভ করিয়াছেন। বহির্ব্বাটীতে কেবল দোবে চোবে ও মিশ্র ঠাকুরেরা একবেলায় দুই বেলার আহারক্রিয়া সম্পাদনার্থ এখন 'ডাল রুটীর' পাক চড়াইয়া দিয়াছেন, এবং অনাহুত ভিক্ষুকের দল ভিক্ষালব্ধ অন্নগুলি লইয়া ঝাউ-গাছের সারির মধ্যে বসিয়া আহার করিতেছে।

অজিতনাথ গ্রন্থ অধ্যয়ন করিতে করিতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। গ্রন্থ পাঠে মনঃসংযোগ হইল না,—সেই অনাথা যুবতীর করুণ ক্রন্দনধ্বনি যেন তাঁহার কাণের ভিতর গিয়া মর্ম্মস্থলে প্রবেশ করিতেছিল। অজিতনাথ উঠিয়া দাঁড়াইয়া মৃদুস্বরে বলিলেন,—"কি বালাই! কাজে আসক্তি কেন? কাজ করিতে হয়, তাই কর। সেই বিপন্ন বিধবাকে উদ্ধার করিতে হইবে—কর্ত্তব্য বলিয়া উদ্ধার করিতে হইবে—কাজ বলিয়া কাজ করিতে হইবে; কিন্তু প্রাণে আসক্তি কেন? তাহাকে উদ্ধার করিবার জন্য এত আকুল বাসনা কেন? উদ্ধারের উপায় না করিতে পারিলে স্থির হইতে পারিতেছি না কেন? হইতে পারে, ইহা সৎকার্য্য—এবং সৎকার্য্য সম্পাদন জন্য যে বাসনা হয়, তাহা সদ্‌বাসনা। কিন্তু সদ্‌বাসনাও বাসনা—অসদ্‌বাসনাও বাসনা। বাসনা বাঁধিবারই অমঙ্গল রজ্জু। তবে সদ্‌বাসনা না হয়, সুবর্ণ শৃঙ্খলে বাঁধে, আর

অসদ্‌বাসনা না হয়, লৌহ শৃঙ্খলে বাঁধে—বাঁধে উভয়েই। বাসনা-প্রণোদিত হইয়া যে সৎকার্য্য করা যায়, তাহাকে পুণ্য বলে,—আর বাসনা-প্রণোদিত হইয়া যে অসৎ কার্য্য করা যায়, তাহাকে পাপ কার্য্য বলে। পুণ্যে স্বর্গ লাভ আর পাপে নরক বাস। তার পর ভোগান্তে আবার জীবজন্ম। ফল প্রায় সমানই। ফল থাকিলে গাছ হয়। কিন্তু এত করিয়া ভুলিতে চেষ্টা করিতেছি,—কিন্তু অসহায়া রমণীর সেই আকুল ক্রন্দন যেন প্রাণের পরতে পরতে বাজিয়া উঠিতেছে। কোন কার্য্যে মন লাগিতেছে না,—কোন বিষয়ই ভাল বোধ হইতেছে না। কৃষ্ণগোবিন্দ বাবু যদি এ দীন হীনের কথায় কর্ণপাত না করেন, তখন কি করিব? সে বিপন্নার উদ্ধার কি হইবে না? আমার এ ক্ষুদ্র প্রাণের বিনিময়ে তাহার বিপদ্ বারণ করা যাইতে পারে না কি? দস্যুগণ ধর্ম্মের ধারও ধারে না,—পরস্বাপহরণ যাহাদের বৃত্তি, নর-হত্যা, নারী-হত্যা, পশু-হত্যা যাহাদের নিত্যকর্ম্ম,—তাহারা যে সুন্দরী রমণীর সতীত্ব বিনষ্ট করে না—তাহা কে বলিতে পারে? পাষণ্ডগণ যদি রমণীর প্রতি অত্যাচার করে,—কে রক্ষণ করিবে? হায় বাঙ্গালী,—তোমরা কি চিরদিন বাঁচিতে আসিয়াছ? তোমাদের চক্ষুর উপরে তোমাদের কন্যা ভগিনীগণের উপর অত্যাচার করিতেছে,—আর তোমরা প্রাণ লইয়া বসিয়া আছ! বঙ্গদেশে—বাঙ্গালীর দেশে—জন কয়েক মারাঠা আসিয়া এই ভীষণ অত্যাচার করিতেছে—কিন্তু তোমরা যদি একই স্বার্থে বদ্ধ-পরিকর হও—কোথাকার যোদ্ধা, কোথাকার বীর—স্রোতে ভাসা তৃণের ন্যায় কোথায় ভাসিয়া যায়। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বারি-বিন্দুতে মহাসাগর হয়—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র-তৃণগুচ্ছের সমষ্টিতে মত্তহস্তী বাঁধা থাকে!"

অজিতনাথের প্রাণ বিচলিত হইল,—চক্ষু দিয়া অনলের ঝলক বহিয়া গেল। অজিতনাথ গৃহ হইতে বাহির হইলেন,—কোথায় যাইবেন,—স্থিরতা নাই। তথাপি গৃহ হইতে বাহির হইলেন। মানুষের এমন গতি সময় সময় হইয়া থাকে,—যে গমন উদ্দেশ্য হীন, লক্ষ্য হীন। কিন্তু স্থূল দৃষ্টিতে যে কার্য্যের লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য স্থির না হইলেও সূক্ষ্মভাবে তাহাতে কোন কর্ম্মবীজ নিহিত থাকে। অজিতনাথ ধীর পদে চলিয়া গেলেন।

যে গৃহে অজিতনাথ অবস্থান করিতেছিলেন, তাহা তৃতীয় মহল্যার মধ্যে। চতুর্থ মহল্যায় অজিতনাথ গিয়া উপস্থিত হইলেন,—সে মহাল্যায় কেন গমন করিলেন, অজিতনাথ নিজেই তাহা অবগত ছিলেন না। সে মহল্যায় বন্দীর বাসস্থান, আর উচ্চপদস্থ কয়েক জন যোদ্ধ‍ৃ-কর্ম্মচারীর কার্য্যালয়। তদ্ভিন্ন একটি সংস্কৃত বিদ্যালয় তাহার এক পার্শ্বে অবস্থিত ছিল। একজন অধ্যাপক কয়েক জন ছাত্রকে সেই মহল্যার একপ্রকোষ্ঠে বসিয়া শাস্ত্রাধ্যয়ন করাইতেন।

অজিতনাথ সেখানে উপস্থিত হইয়া ভাবিলেন, অধ্যাপক মহাশয়ের নিকটে গিয়া কিয়ৎক্ষণ শাস্ত্র ব্যাখ্যা শুনিয়া আসি। আবার মনে হইল,—বাঙ্গালার এখন যে প্রকার অবস্থা, তাহাতে কেবল শাস্ত্র ব্যাখ্যা শুনিলে আর চলিবে না। এখন যোদ্ধাগণের নিকট গিয়া শস্ত্র-ব্যবহার শিক্ষা করিবার প্রয়োজন। অজিতনাথ যোদ্ধ‍ৃগণের কার্য্যালয়ে প্রবেশ করিতে ইচ্ছা করিলেন। তারপর মনে হইল,—এক দণ্ডের আলাপে মুহূর্ত্তের উপদেশে আমি শস্ত্রবিদ্যার কি শিক্ষা করিব। তারপর স্থির করিলেন,—যোদ্ধ‍ৃপুরুষগণের নিকটে গিয়া জানিয়া আসি, কোনও বাঙ্গালীর

বাহুতে কি সে বল নাই, যে বলের দ্বারা অত্যাচারিতা নিগৃহীতা একটি বঙ্গরমণীর উদ্ধার সাধন হইতে পারে।

ঠিক সেই সময়ে পার্শ্বের এক প্রকোষ্ঠমধ্যে দুইটি রমণীর কথোপকথন হইতেছিল। অজিতনাথ তাহা শুনিতে পাইলেন,—এবং উভয়ের কথোপকথন শুনিয়া প্রথমা বন্দিনী, দ্বিতীয়া তাহার আহারীয় প্রদানার্থ আসিয়াছে। এরূপ কথোপকথন হইতেছিল,—

প্রথমা বলিল,—"আমি অপরাধ করিয়া থাকি, আমায় দণ্ড প্রদান করুন। তিনি আমার প্রতিপালক, তিনি আমার আশ্রয়-দাতা, তিনি আমার প্রভু—আমি দোষ করিয়া থাকি স্বহস্তে আমার শাস্তি প্রদান করুন,—কিন্তু আমাকে সাধারণ বন্দীর মত এখানে রাখিয়াছেন—এ অপমান আমি সহ্য করিব না। আমি অন্ন জল গ্রহণ করিব না।"

তদুত্তরে দ্বিতীয়া বলিল,—"আমি বামুনের মেয়ে। স্ত্রীলোক বন্দী হইয়া আসিলে আমিই তাহাদিগের অন্ন প্রস্তুত করিয়া দিয়া থাকি। আদেশ অনুসারে তোমার জন্যও আনিয়াছি,—কিন্তু তোমার মত একগুঁয়ে লোক আমি দেখি নাই। ক'দিন না খাইয়া থাকিবে?"

১মা। ক'দিন থাকিব,—তাহা কেমন করিয়া বলিব? এরূপ ভাবে অন্ন খাইতে বিশাখা জীবন রাখিবে না। যত দিন মৃত্যু না হইবে, ততদিন না খাইয়া থাকিব।

২য়া। তুমি না খাইলে আমি আর কি করিব? তবে ক আমি যাব?

১মা। অনেকক্ষণ পর্য্যন্তই বলিতেছি, তোমার ভাত লইয়া

তুমি চলিয়া যাও,—আমি বিনাদোষে বন্দিনী হইয়াছি—বিনা কারণে অপমানের আগুনে বিদগ্ধ হইতেছি—আমাকে কাঁদিতে দাও। আর যিনি সকলের দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা—যিনি সকল বিচারকের বিচারক, তাঁহাকে ডাকি।

২য়া। তবে তাই।

অজিতনাথ বুঝিলেন, কোন অভাগিনী বঙ্গরমণী বিনা দোষে বন্দিনী হইয়া কষ্ট ভোগ করিতেছে। মনে হইল,—সর্ব্বত্রই কি রমণীর নিগ্রহ! রমণী দুর্ব্বলা—পুরুষ কর্ত্তৃক রক্ষিতা। রমণী মহামায়ার অংশরূপিণী—রমণী জননী—প্রসবিনী—রমণী পূজ্যা কিন্তু সর্ব্বত্রই রমণীর এত অপমান কেন?

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

অজিতনাথ আত্মবিস্মৃত হইলেন। বিনা অনুমতি গ্রহণে যে গৃহে রমণী দ্বয়ের কথোপকথন হইতেছিল, সেই গৃহে গমন করিলেন।

অদূরে এক মিশ্রঠাকুর রুটী পাকাইতেছিলেন, তিনি একবার গম্ভীর স্বরে গৃহপ্রবেশে অজিতনাথকে নিষেধ করিয়াছিলেন, কিন্তু অজিতনাথ সে আদেশ অগ্রাহ্য করিয়া গৃহপ্রবেশ করিলেন।

গৃহের মেঝেয় পাচিকা অন্নের থালা লইয়া দাঁড়াইয়া ছিল,—আর পার্শ্বের কোণে আপাদ-মস্তক বস্ত্রাবৃত করিয়া বিশাখা পড়িয়াছিল। অজিতনাথ বুঝিলেন, বস্ত্রাবৃতা রমণী বন্দিনী, এবং অন্নপাত্রসম্মুখে দণ্ডায়মানা রমণী পাচিকা।

সহসা ব্রহ্মচারী অজিতনাথকে গৃহপ্রবেশ করিতে দেখিয়া, পাচিকা আশ্চর্য্যান্বিতা হইল। বলিল,—"আপনি কে মহাশয়?"

অজিতনাথ বলিলেন,—"আমি জনৈক ব্রহ্মচারী।"

ব্রহ্মচারী নাম শুনিয়া বিশাখা আবৃত বস্ত্রখানি চক্ষু হইতে অপসৃত করিয়া চাহিয়া দেখিল। অজিতনাথও সে দিকে চাহিয়াছিলেন,—কেবল দুইটি দীর্ঘায়ত কৃষ্ণতার জল ভরা নয়ন দেখিতে পাইলেন। চক্ষু দুইটি দেখিয়া অজিতনাথ বুঝিতে পারিলেন, রমণী যুবতী ও সুন্দরী। এমন চোখ বুঝি—"কোটিতে গুটিক হয়!"

অজিতনাথ বলিলেন,—"আমি ব্রহ্মচারী, আমার নিকট লজ্জা নাই। তুমি কে, এবং কি জন্য বন্দিনী হইয়াছ?—আমাকে বলিলে বাধিত হইতাম!"

বিশাখা সে মূর্ত্তি দেখিয়া কিঞ্চিৎ বিচলিত হইল। সে অনেক মানুষ দেখিয়াছে—কিন্তু এমন মানুষ বুঝি আর দেখে নাই। ব্রহ্মচারী যুবক—কিন্তু বিশাখা এ পর্য্যন্ত যুবক কত দেখিয়াছে, তাহার সংখ্যা করা যায় না। ব্রহ্মচারী সুন্দর, কিন্তু ইহা হইতে সহস্রগুণে সুন্দর মানুষ তাহার নয়ন-পথে কতই পতিত হইয়াছে,—এমন প্রাণ কাঁপিয়া উঠাভাব আর কখনও হয় নাই। মুহূর্ত্তের দর্শনে মনে পড়িল, যেন এ তাহার পরিচিত—ইহার সঙ্গে যেন কোন কাজ আছে,—কোন প্রয়োজন আছে। যেন কত দিন ইহার সঙ্গে কত কাজ করা হইয়াছে। কিন্তু সে উঠিল না, বা কোন কথা কহিল না,—যে চক্ষু খুলিয়াছিল, তাহা আবার বস্ত্রাবৃত করিয়া অপর পার্শ্বে ফিরিয়া শয়ন করিল।

অজিতনাথ বলিলেন,—"আমার কথা শোন। উঠিয়া বসিয়া তোমার নাম ও কি জন্য বন্দিনী হইয়াছ,—তাহা আমাকে বল।"

বিশাখা তথাপি নিরুত্তর। তখন অজিতনাথ বলিলেন,—"তোমার অবস্থা শুনিতে আসিয়াছিলাম,—বলিলে যথাসাধ্য তোমার উপকার করিতে পারিতাম। আমি ব্রহ্মচারী, আমার কথা না শুনিলে তোমার পাপ হইবে।"

এবার সর্ব্বাঙ্গে কাপড় জড়াইয়া বিশাখা উঠিয়া বলিল। সন্ন্যাসী মহান্ত, যোগী ব্রহ্মচারী,—ইহারা শাপ দিলে মানুষের ইহকালে মহাকষ্ট ও পরকালে নরকবাস হয়—বিশাখার এই সংস্কার বদ্ধমূল ছিল। ব্রহ্মচারীর বাক্য অবহেলা করিলে নরক-বাসের সবিশেষ সম্ভাবনা মনে করিয়া বিশাখা উঠিয়া বসিল, এবং ঢিপ করিয়া এক প্রণাম করিল। তদনন্তর বলিল,—"ঠাকুর, আমার প্রভু, আমার অন্নদাতা, আমার আশ্রয়দাতা কৃষ্ণগোবিন্দ বাবু আমাকে বন্দিনী করিয়াছেন,—আপনি তাহা শুনিয়া কি করিবেন?"

অ। আমার বিশ্বাস তুমি কোন দোষ কর নাই, তবে তোমাকে কেন বন্দিনী করিয়াছেন?

বি। আমি নির্দ্দোষ, তিনি তাহা বুঝিতে পারেন নাই, তাই আমাকে বন্দিনী করিয়াছেন,—যখন জানিতে পারিবেন, আমি নির্দ্দোষ; তখন ছাড়িয়া দিবেন। তিনি পিতার ন্যায় আমাকে ভাল বাসেন।

অ। তুমি যে নির্দ্দোষ, তাহা সত্য করিয়া আমাকে বল,—এবং ঘটনাটা বল, আমি তোমাকে মুক্ত করিব।

বি। আপনি কি করিয়া আমাকে মুক্ত করিবেন?

অ। যে কোন উপায়ে হোক।

বি। যিনি আমার আশ্রয় ও অন্নদাতা,—যিনি আমার প্রভু—তিনি যদি জানিতে না পারিলেন, আমি নির্দ্দোষ; তবে স্বর্গে গিয়াও আমি সুখী হইব না।

বিশাখার হৃদয় বুঝিতে অজিতনাথের বাকি রহিল না। বলিলেন,—“আমি তাঁহার নিকটেই তোমার নির্দ্দোষিতা প্রমাণ করাইব,—সে ক্ষমতা আমার আছে।”

তখন বিশাখা বলিল,—“ঠাকুর, ঘটনার কথা শোন। গতরাত্রে আমি আমার বিছানায় শুইয়া ছিলাম,—রাত্রি আন্দাজ দুপুর; প্রায় সকলেই নিদ্রিত। সহসা আমার ঘরের মধ্যে এক তেজস্বিনী রমণী আসিয়া আমাকে ডাক দিলেন—আমি যেন, কোন মায়ার বলে মুগ্ধ হ'য়ে তাঁর পশ্চাৎ পশ্চাৎ গেলাম। যাইবার সময় একবারও বিবেচনা করিতে পারিলাম না যে, সে রমণী কে,—কি প্রকারে আমার ঘরের মধ্যে আসিতে পারিলেন, এবং আমাকেই কোথায় লইয়া যাইতেছেন। সমস্ত বিবেচনা-পরিশূন্য হইয়া তাঁহার পশ্চাদনুসরণ করিলাম। তিনি দুর্গ-দ্বারের সম্মুখে গিয়া দাড়াইলেন,—ছায়ার মত আমিও দাঁড়াইলাম। তিনি আমায় যাহা বলিলেন, সব মনে নাই—ভাব এইরূপ,—‘এই বাড়ীতে প্রেত-তর্পণ হইবে। অজিতনাথ সেই তর্পণের বলি। তোমার আত্মদানে রক্ষা পাইতে পারে। যদি আত্মদানে সম্মত হও—সময় হইলে, শিখাইয়া দিব।’

আমার প্রভু কৃষ্ণগোবিন্দ বাবু সেই সময় সেইস্থানে কি জন্য গিয়া উপস্থিত হয়েন—তিনি আমাদিগের উভয়কে দেখিতে

পান—কিন্তু মুহূর্ত্তের মধ্যে সেই রমণী কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেলেন. অনুসরণ করিয়াও তাঁহাকে ধৃত করিতে পারিলেন না,—আমাকে ব্যাপার জিজ্ঞাসা করিলেন. আমি সব কথা বলিলাম—কিন্তু আমার কথায় বিশ্বাস করিতে না পারিয়া, আমাকে বন্দিনী করিয়া রাখিয়াছেন।”

বিশাখা সেই সকল কথা বলিতে বলিতে আত্মবিস্মৃত হইয়া গিয়াছিল,—তাহার গাত্রবিজড়িত বস্ত্র দেহচ্যুত হইয়া মাটীতে পড়িয়া গিয়াছিল। ব্রহ্মচারী অজিতনাথ দেখিলেন,—সেরূপ রূপজগতে দুর্ল্লভ। সমস্ত অঙ্গে এক-বাসন্তীশ্রী খেলিয়া ফিরিতেছিল। অজিতনাথের মনে হইল, এইরূপ রূপেই বুঝি যোগীর যোগ ভঙ্গ হয়,—ব্রহ্মচারীর ব্রহ্মচর্য্য বিনষ্ট হয়। তৎপরে মনে হইল—এই বাড়ীতে প্রেততর্পণ হইবে, সে তর্পণের বলি অজিতনাথ। কোন অজিতনাথ? আমি কি? আমার সহিত এ বাড়ীর সম্বন্ধ কি? এই রমণী আত্মদান করিলে সে কার্য্য রোধ হয়, ইহার অর্থ কি? যে রমণী এই আদেশ করিয়া গিয়াছ—সে রমণী কি মানবী। যেরূপ কথা শুনিলাম, তাহাতে তাহাকে মানবী বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারা যায় না।

অনেকক্ষণ চিন্তার পর অজিতনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন,—“তোমার নাম কি?”

বি। আমার নাম বিশাখা।

অ। তোমার বাড়ী কোথায়?

বি। বাড়ী কোথায় আমি জানিনা,—আমি এই বাড়ীতে প্রতিপালিতা। শুনিয়াছি, বৃন্দাবনে আমার জন্ম। শিশুকালেই পিতা মাতার মৃত্যু হয়,—আশ্রয়হীনা হইয়াছিলাম, ইহাদের কে

সেই সময় বৃন্দাবন গমন করেন—এবং দয়া করিয়া আমাকে এখানে আনিয়া প্রতিপালন করিয়াছেন।

অ। তোমার বিবাহ হইয়াছে?

বি। না। এদেশে আমাদের স্বজাতি নাই। আপনার নাম কি ঠাকুর?

অ। আমার নাম অজিতনাথ।

দারুণ শীতের সময় আগুন পোহাইতে পোহাইতে সেই আগুন বস্ত্রে ধরিয়া গেলে মানুষ যেমন বিচলিত ও কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া পড়ে,—সৌম্যমূর্ত্তি ব্রহ্মচারীর নাম অজিতনাথ শ্রবণ করিয়া বিশাখার অবস্থাও তদ্রূপ হইল। সে অনেকক্ষণ নীরবে নিস্তব্ধে অজিতনাথের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। অজিতনাথও চাহিয়া দেখিলেন,—যুবক ও যুবতীর নয়নে বুঝি কোন গুপ্ত দেবতার আকর্ষণের আগুণ লুক্কায়িত থাকে। লৌহপ্রস্তরের ঘর্ষণে যেমন অগ্নি উৎপাদিত হয়—যুবক-যুবতীর নয়নে নয়ন মিশ্রিত হইলেও সেইরূপ আগুনের উদ্ভব হয়,—দগ্ধ সোলা নিম্নভাগে ধরিলে লৌহ-প্রস্তরের উৎপাদিত বহ্নি তাহাতে আশ্রয় করিয়া প্রবলাকার ধারণ করে, ঘটনারূপ কর্ম্মবীজ যুবক-যুবতীর নয়নাগ্নির নিম্নস্তরে অবস্থিত থাকিলে, সে আগুনও প্রবলাকার ধারণ করে।

অজিতনাথ ও বিশাখা অনেকক্ষণ নীরবে নিস্তব্ধে অবস্থান করিয়াছিল। তবে মানুষের মুখের কথা বা হাতের কাজ নিস্তব্ধ থাকিতে পারে,—যোগী ভিন্ন মনের ক্রিয়া নিরস্ত হয় না। উভয়ের মনে মনে অনেক কথা হইতেছিল। সে সকল কথা সময়ে প্রকাশ পাইবে।

অনেকক্ষণ পরে বিশাখা গাত্রবস্ত্র টানিয়া লইয়া সমস্ত অঙ্গে

আচ্ছাদন করিল, এবং পূর্ব্বে যেখানে শুইয়া ছিল, সেই স্থানে শুইয়া পড়িল।

"আবার দেখা হবে।"—এই কথা বলিয়া অজিতনাথ সে গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

সন্ধ্যার সময় তর্কালঙ্কার ঠাকুর ও কৃষ্ণগোবিন্দবাবু উভয়ে পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন যে, কিয়ৎ সংখ্যক সৈন্য দিয়া অজিতনাথকে মহারাষ্ট্র-সৈন্য-শিবিরে পাঠান হউক,—তাহাতে উভয় কুলই রক্ষা পাইবে। মহারাষ্ট্রীয়েরা জানিতে পারিবে না যে, কৃষ্ণগোবিন্দবাবু তাহাদের প্রতিদ্বন্দ্বী। আবার ফৌজদারের পুত্র সেস্থলে ধৃত কিনা, তাহাও সবিশেষ জানিতে পারা যাইবে,—কেননা, অজিতনাথ এতটা সৈন্য সামান্ত লইয়া গিয়া তাহার একটা সন্ধান না লইয়া ফিরিবে না। তখন ফৌজদার সাহেবকে সে কথা জানাইলে, তিনি বিহিত উপায় অবলম্বন করিবেন।

তৎপর দিবস দ্বিসহস্র সাহসিক সৈন্যের সহিত অজিতনাথ পাদপীঠ বাগানাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

অজিতনাথ দ্বিসহস্র সৈন্য ও কৃষ্ণগোবিন্দবাবুর আদেশ লইয়া পাদপীঠ বাগানাভিমুখে গমন করিলেন। কৃষ্ণগোবিন্দ বাবু বলিয়া দিয়াছেন,—সেই মুসলমান যুবক যদি ফৌজদার সাহেবের পুত্র হয়েন, তবে তাঁহাকে উদ্ধারের চেষ্টা দেখিবে—যদি উদ্ধার করিতে না পার, পরিচয় লইয়া আসিবে।

অজিতনাথ বুদ্ধিমান,—তিনি বুঝিতে পারিলেন, কোন্ আগুনে তিনি ঝাঁপ দিতে চলিয়াছেন। যে মহারাষ্ট্রীয়-অত্যাচার-বহ্নিতে সমস্ত বাঙ্গালা ধূ ধূ জ্বলিতেছে,—সে অত্যাচার-বহ্নির প্রবল তাপে দিল্লীর সিংহাসনের শীতলতা বিদূরিত হইয়া গিয়াছে,—পতঙ্গবৃত্তি অবলম্বন করিয়া ক্ষুদ্র অজিতনাথ সেই বহ্নিতে ঝাঁপ দিতে চাহিয়াছেন। কিন্তু তাহার মনে সাহস—হৃদয়ের বল,—সে আপন কাজ করিতে যাইতেছে না। পরের কাজ করিতে যাইতেছে না। যাঁহার কাজ, তিনি করিবেন ;—সে উপলক্ষ মাত্র। উপলক্ষ হইয়া কার্য্যে ভালমন্দের বিচার করিবার প্রয়োজন কি ?

অজিতনাথ স্থির করিল,—আমরা পাদপীঠ না পঁহুছিতে পঁহুছিতে যদি মারহাঠারা জানিতে পারে যে, আমরা সৈন্য লইয়া অগ্রসর হইতেছি—তবে পথেই আমাদিগকে আক্রমণ করিবে। মহারাষ্ট্রীয় যোদ্ধাগণের দ্বারা পথিমধ্যে আক্রান্ত হইলে আমরা কিছুতেই আর অগ্রসর হইতে পারিব না। বিশেষতঃ কিছু পূর্ব্বে মহারাষ্ট্র-শিবিরে উপস্থিত হইয়া সেই মুসলমান যুবক ও যুবতীর পরিচয় এবং তাহারা এখন কি অবস্থায় ও কোথায় আছে,—জানার প্রয়োজন।

তখন সেনাপতিকে ডাকিয়া অজিতনাথ বলিলেন,—"পাদপীঠ বাগানের উত্তর ভাগ পাহাড় দ্বারা আবদ্ধ,—অতএব তোমরা এই পথ বহিয়া পূর্ব্বমুখে চলিয়া যাও, এবং রাঙ্গামাটী পঁহুছিয়া উত্তর মুখ হইবে,—সেখান হইতে কয়েক ক্রোশ অতিবাহিত করিলে সম্মুখে শিবালয়ের পাহাড়শ্রেণী দেখিতে পাইবে,—সেই পাহাড়ের উপরে উঠিয়া পশ্চিমমুখে চলিয়া আসিলে পাদপীঠ-বাগানের উত্তর

ধারে আসিয়া পঁহুছিতে পারিবে। পথ ঘুরিয়া পাদপীঠ পঁহুছিতে তোমাদের বোধহয় সাত আট দিবস লাগিতে পারে। আমি এই সোজা পথে হাঁটিয়া গেলে তিন দিবসেই তথায় উপস্থিত হইতে পারিব। তোমরা আমার অপেক্ষায় জঙ্গলের বাহিরে কোন পর্ব্বতের অন্তরালে অপেক্ষা করিও। সুবিধা ও সুযোগ হইলে আমি তোমাদের সহিত মিলিত হইব।"

সেনাপতি গজধর বর্ম্মা সেনা লইয়া অজিতনাথের কথিত পথে চলিয়া গেল। অজিতনাথও সোজা পথে পাদপীঠ-বাগানাভিমুখে গমন করিলেন।

তিন দিনের দিন সন্ধ্যার পরে অজিতনাথ পাদপীঠ-বাগানের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন।

বাগানের নিম্নভাগ দিয়া কালীগঙ্গা নামক অনতিপ্রসরা স্বচ্ছতোয়া নদী প্রবাহিতা। নদীতীরে মহারাষ্ট্রীয়-শিবিরের বস্ত্রাবাস সারি সারি সজ্জিভূত। শশধর-বিরঞ্জিত নদীসমীরণ লীলাকম্পিত-তরুপল্লবশোভিত কুসুমিত বন সকল বস্ত্রাবাসের চারিদিকে বিরাজিত এবং প্রতি বস্ত্রাবাস হইতে উজ্জ্বলরশ্মি দীপ সকল প্রজ্বলিত হইয়াছে,—বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষকাণ্ডে সমরাশ্ব সকল আবদ্ধ হইয়া মধ্যে মধ্যে হ্রেষারব করিতেছে। কোন আবাস হইতে তাম্বুরার সহিত সংগীতের ধ্বনি উত্থিত হইতেছে, কোন আবাস হইতে শিবস্তোত্র-গাথা শোনা যাইতেছে। কোথাও বা কেহ রাঁধিতেছে, কেহ গল্প করিতেছে, কেহ কেহ বা আপন ভুজবলের প্রশংসা করিতেছে। কোন স্থলে কোন ব্যক্তি ভাং খাইয়া পড়িয়া আছে,—কোথাও বা কেহ কেহ বসিয়া গঞ্জিকাধূম পান করিতেছে।

অজিতনাথ খঞ্জনীতে মৃদু আঘাত করিয়া গাহিতে গাহিতে চলিলেন,—

"সে নয়ন রহে কি কারণ।
সখি রে, শুন মোর হতবিধি বল ॥
মোর বপু চিত্ত মন, সকল ইন্দ্রিয়গণ,
কৃষ্ণবিনু সকলি বিফল ॥

বিশির-পুরোদ্বারে প্রবেশ করিতেই একজন সিপাহী আসিয়া অজিতনাথের সম্মুখে দাঁড়াইল। কঠোরস্বরে বলিল,—"কে তুমি ?"

অ। আমি ব্রহ্মচারী—ভিক্ষুক।

সি। এখানে কি জন্য ?

অ। ভিক্ষুক, ভিক্ষার জন্য।

সি। কাহার নিকট ভিক্ষা করিতে আসিয়াছ ?

অ। কাহারও নাম জানি না,—যিনি দয়া করিয়া দেন।

সি। তোমার নিবাস কোথায় ?

অ। আমি বাঙ্গালী,—এই বাঙ্গালা দেশেই জন্মিয়াছি।

সি। রাত্রে ভিক্ষা করিতে কে আসিয়া থাকে ?

অ। রাত্রে এই দিকে আসিয়া পড়িয়াছি—মনের আশা, আজি রাত্রে তোমাদের শিবিরে অবস্থান করিয়া ভোরে উঠিয়া ভিক্ষা লইয়া চলিয়া যাইব।

সি। তোমাকে সন্দেহ হয়।

অ। তা হইতে পারে,—ভিক্ষুক ব্রহ্মচারীকে ভয় কি বুঝি না।

সি। আমাদের সর্দ্দারের কাছে চল।

অ। সর্দ্দার কোথায় থাকেন ?

সি। ঐ যে লাল নিশান উড়্‌ছে, দেখ্‌ছো, ঐ ঘরে তিনি থাকেন।

অ। তবে চল।

তখন সিপাহী অজিতনাথকে সঙ্গে লইয়া সর্দ্দারের শিবির-প্রকোষ্ঠে উপস্থিত হইল। সর্দ্দার তখন একখানা সেপায়ার উপরে বসিয়া সম্মুখোপবিষ্ট এক পণ্ডিতের সহিত শাস্ত্রালাপ করিতেছিলেন।

ব্রহ্মচারিবেশী অজিতনাথকে সম্মুখে উপস্থাপিত করিলে সর্দ্দার জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ইনি কে ?"

সিপাহী কথা না কহিতেই অজিতনাথ বলিলেন,—"আমি ব্রহ্মচারী—ভিক্ষুক ; আপনার দানশীলতা শ্রবণ করিয়া ভিক্ষার্থে আসিয়াছি।"

গৃহস্থিত প্রোজ্জ্বল দীপালোকে অজিতনাথের দিকে ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিয়া সর্দ্দার বলিলেন,—"আপনাকে দেখিয়া মহাপুরুষ বলিয়াই বোধ হয়। মহাপুরুষের ন্যায় দীর্ঘ ললাট, আজানুলম্বিতবাহু, সুদীর্ঘ নয়ন,—কিন্তু রাত্রে ভিক্ষা কেন ?"

অ। আসিতে আসিতে রাত্রি হইয়া গিয়াছে। বিশেষতঃ মহদাশ্রয়ে প্রতিপালিত হওয়া বাঞ্ছনীয়,—হৃদয়ের বাসনা, কয়েক দিন আপনার আশ্রয়ে অবস্থান করিব—তারপরে যাহা কিছু পাই, ভিক্ষা লইয়া চলিয়া যাইব।

স। শাক্ত, শৈব, সৌর, গাণপত্য, বৈষ্ণব,—আপনি ইহার কোন্ ধর্ম্মাবলম্বী ?

অ। যোগী পরমাত্ম-আনন্দরসে রসিক,—সাম্প্রদায়িক গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ নহেন।

স। বসুন,—ভাল সময়ে আসিয়াছেন, এই পণ্ডিত মহাশয়ের সহিত আমার ধর্ম্মসম্বন্ধেই কথোপকথন হইতেছিল। আপনি আসিয়াছেন—আরও আনন্দের বিষয়।

অজিতনাথ আসনগ্রহণ করিলেন। সিপাহী, সর্দ্দারকে অভিবাদন করিয়া চলিয়া গেল।

সর্দ্দার বলিলেন,—"পণ্ডিতজি, আপনি কি মনে করেন, বাহুবলে পরের ধন কাড়িয়া লওয়া মহাপাপ?"

প। নিশ্চয় পাপ।

স। কিন্তু তাহা কে না লয়? দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর এবং আদর্শ-চরিত্র মানব সকলেই বাহুবলে পরস্ব হরণ করিয়াছেন। লোকে কথায় বলে,—"বীরভোগ্যা বসুন্ধরা।"

প। হইতে পারে, উহা বীরোচিত কার্য্য,—কিন্তু পরস্বাহরণ চিরকালই পাপ।

অজিতনাথ বলিলেন,—"পরস্বাপহরণ নিশ্চয়ই পাপ। বীরগণ পরের রাজত্ব—পরের অর্থ কাড়িয়া লয়েন,—যদি তাহা নিজের জন্য লয়েন, তবে পাপ হয়, আর দেশের সুখ-শান্তির জন্য—দেশের উপকারের জন্য লয়েন, তবে পাপ হয় না। আপনার জন্য যে কাজ করা যায়, তাহাই পাপ;—আপন ভুলিয়া যে কাজ করা যায়, তাহাই পুণ্য। আপনার জন্য—আত্মহিতের জন্য দান-ধ্যান, পুরশ্চরণ-তপ যাহা করা যায়, তাহাই পাপ। আর দেশের জন্য—দশের জন্য দস্যুতাও পুণ্য। দশ যেখানে, ভগবান্ সেখানে। ভগবানের উদ্দেশ্যে কার্য্য করিলে তাহাই উত্তম কর্ম্ম। পাপবল পুণ্যবল, কর্ম্মবল, অধর্ম্মবল,—সমস্ত ভগবানে অর্পণ করিয়া কার্য্য করিলে তাহাই উত্তম কর্ম্ম। শাস্ত্রে আছে,—

যৎ করোমি যদশ্নাসি যজ্জুহোসি দদাসি যৎ ;
যৎ পশ্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ মদর্পণম্ ॥

ভগবান্ তাঁহার সখা ও শিষ্য ভক্তিমান অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন, —“হে অর্জ্জুন, যাহা কর, যাহা দেখ, যাহা দান কর, হোমকর, আহার কর এবং যাহা দর্শন কর। সমস্ত আমাতে অর্পণ কর।” সর্ব্বস্ব ভগবানে না দিলে উত্তম কর্ম্ম হয় না। আমার বলিয়া কিছু না থাকে,—আমার মুছিয়া কাজ করিলে কিছুতেই পাপ হয় না।”

স। এই ভগবান্ কে ? বোধ হয় শ্রীকৃষ্ণের কথা বলিতেছেন ?

অ। হাঁ।

পণ্ডিতমহাশয় হো হো করিয়া হাসিলেন। সর্দ্দার বলিলেন,—“ব্রহ্মচারী ঠাকুর, সেই পারদারিক শঠ কৃষ্ণকে আপনি ভগবান্ বলিয়া স্বীকার করেন ?”

অ। জগতের সকলেই তাহাকে ভগবান্—ভগবান্ কেন ব্রহ্ম বলিয়া স্বীকার করেন ?

স। আপনি কি কথা বলিতেছেন ঠাকুর ? লোকে যখন জীবন্মুক্ত হয়, তখন বলে—“শিবোঽহম্।” শিবই ব্রহ্ম। যাই হোক, আপনি জ্ঞানী, আজ আপনি থাকুন, কাল আপনার সঙ্গে এই সম্বন্ধে কথা হবে।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

অম্লানোজ্জ্বল রবিকর-প্রদীপ্ত মেঘ-কুহেলিকা-শূন্য প্রভাত। অনেকক্ষণ হইল, মহারাষ্ট্রশিবিরের সৈন্যগণ জাগ্রত হইয়া প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন করিয়া শিবগুণগাথা গাহিতে আরম্ভ করিয়াছে। অনেকক্ষণ হইল অজিতনাথ জাগ্রত হইয়া বননদীর শীতলজলে স্নান করিয়া আসিয়াছে, এবং এক বৃদ্ধ সিপাহীর বস্ত্রগৃহ সম্মুখে বসিয়া খঞ্জনীতে মৃদু মৃদু আঘাত করিয়া মৃদু মৃদু স্বরে গান গাহিতেছিল।

এক সিপাহী বলিল,—"ঠাকুর, তোমার গলার স্বর বোধহয় বড় মিষ্ট। একটা গান শুনাও না।"

অজিতনাথ বলিল,—"গানত গাহিতেছি; শোন না কেন?"

সি। যে ভাবে গাহিতেছ, তাহা শোনা আমার মত বুড়া মানুষের কাজ নহে। একটু জোর করিয়া গাও।

তখন অজিতনাথ মৃদু হাসিয়া খঞ্জনীতে জোরে টোকা দিয়া গাহিল,—

"দু'কাণ পাতিয়া ছিল এতক্ষণ
বধু-পথ-পানে চাই,
পরভাত নিশি দেখিয়া অমনি
চমকি উঠিল রাই।
পাতায় পাতায় পড়িছে শিশির
সখীরে কহিছে ধনী,

বাহির হইয়া দেখ লো সজনি
বঁধুর শবদ শুনি।

ক্রমে ক্রমে অনেক গুলি সিপাহী আসিয়া তথায় সমবেত হইল। বৃদ্ধ সিপাহী গান বন্ধ করিয়া দিয়া বলিলেন,—"শোন ঠাকুর, শিবের গান কিছু জান যদি গাও।"

অজিতনাথ গান বন্ধ করিয়া সস্মিত আননে মৃদু হাস্যাধরে বলিলেন,—"কেন, এগান কি ভাল লাগিল না?"

বৃ। না, আমাদের উহা ভাল লাগে না। কৃষ্ণলীলাটা বড় অশ্লীল।

অ। কৃষ্ণলীলা অশ্লীল কে বলিল? যাক্, তোমাকে শিবের গানই শোনাই।

তখন অজিতনাথ পুনরায় খঞ্জনীতে আঘাত করিয়া গান ধরিলেন,—

"প্রভুমীশ মনীশ মশেষগুণং"

এতটুকু গাইতেই একজন নূতন সিপাহী তথায় আসিয়া বলিল,—"ব্রহ্মচারী ঠাকুর, সর্দার তোমাকে ডাকিতেছে, শীঘ্র উঠিয়া আইস।"

অজিতনাথ গান বন্ধ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। বৃদ্ধ বিরক্তিস্বরে বলিল,—"আহা হা, এমন গানে বাধা পড়িল। ঠাকুর, আর একবার এস।"

অজিতনাথ সম্মতি জানাইয়া যে সিপাহী ডাকিতে আসিয়াছিল, তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিয়া গেলেন। কিয়ৎক্ষণ পরেই সিপাহী তাঁহাকে সর্দ্দারের বস্ত্রাবাস-সমীপে পঁহুছাইয়া দিয়া প্রস্থান করিল। সর্দ্দার অজিত নাথকে বসিতে অনুমতি করিলেন।

অজিতনাথ আসনোপবিষ্ট হইলে সর্দ্দার বলিলেন, "আপনি কি ব্রহ্মচারী ?"

অ। হাঁ, আমি ব্রহ্মচর্য্য-ধর্ম্মাবলম্বী।

স। তুমি বয়সে নবীন, এখনও পতনের আশঙ্কা আছে।

অ। আশঙ্কা পদে পদে,—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আমায় রক্ষা করুন।

সর্দ্দার দিগন্ত কম্পিত করিয়া হো হো হাসিয়া উঠিলেন। অনেকক্ষণ সে হাসির বেগ প্রশমিত হইল না। দক্ষিণ পার্শ্বে পণ্ডিত জ্যোতিঃস্বরূপ ত্রিবেদী উপস্থিত ছিলেন,—তিনিও সে হাসিতে যোগ প্রদান করিলেন। অজিতনাথ নিস্তব্ধে বসিয়া রহিলেন। অনেকক্ষণ পরে হাসি থামিল। অজিতনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আমি কি অন্যায় কথা বলিয়াছি, যাহার জন্য আপনরা এত হাসি হাসিলেন ?"

বৃষ্টির পরে মন্দ বিদ্যুতের মত তখনও ভাঙ্গা হাসি সর্দ্দারের অধরে খেলিতেছিল, তিনি বলিলেন,—"ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তোমার ব্রহ্মচর্য্য রক্ষা করিবেন ? তিনি নিজে কি ?"

অ। তিনি নিজে কি ?

স। পারদারিক। লম্পট-চূড়ামণি।

অ। আপনি তাঁহার সম্বন্ধে ভুল বুঝিয়াছেন। তিনি পারদারিক নহেন—লম্পট নহেন। তিনি সাক্ষাৎ মদনমোহন। তিনি ভিন্ন কামবিনষ্ট আর কেহ করিতে পারে না।

স। কথাটা গায়ের জোরে বলিতেছ।

অ। অতৃপ্ত জীবের আত্মতৃপ্তি করিতে, কাম-বাসনা-বিদগ্ধ জীবের প্রেম দান করিতে, তিনি অবতীর্ণ হইয়াছিলেন,—

অতএব ব্রহ্মচারী তাঁহারই পদাশ্রয়ে আপন ব্রত রক্ষা করিতে পারে।

স। ভাল, শুধু কথায় বলিয়া গেলেই হইবে না,—আমাকে বুঝাইয়া দাও।

অ। জীবমাত্রই কোন বস্তুর আকাঙ্ক্ষা করে,—সেই আকাঙ্ক্ষার সাধারণ নাম সুখ। সেই সুখ হয়, জীবাত্মা ও পরমাত্মার প্রগাঢ় মিলনে। রাধা জীবাত্মা—শ্রীকৃষ্ণ পরমাত্মা। উভয়ের মিলনই তাঁহাদের রমণ,—ব্রহ্মচারীও সেই পথের পথিক। নতুবা তাহার সুখ কোথায়? প্রকৃত সুখ লাভ করিতে হইলে এই রমণ প্রয়োজন। এই রমণে কামনা-বাসনা বিদূরিত হয়—দুঃখ দূরে যায়। *

স। কথাটা আমি ভাল বুঝিতে পারিলাম না।

অ। সময় পাইলে বুঝাইতে চেষ্টা করিব। এখন আমাকে কি জন্য ডাকাইয়াছেন, জানিতে চাহি।

স। তুমি ভিক্ষার জন্য আসিয়াছ, বলিয়াছ। কি ভিক্ষা চাও?

অ। দয়া করিয়া যাহা দিবেন। তবে আমি কয়েক দিন আপনার আশ্রয়ে থাকিতে অভিলাষী।

স। তাহা হইবে না। মহারাষ্ট্র-শিবিরে বাঙ্গালী বা অন্য কোন জাতি অবস্থান করিতে পাইবে না। তবে মধ্যে মধ্যে আসিয়া সাক্ষাৎ করিতে পার। রাত্রে এখানে থাকা হইবে না।

অ। অদ্য সন্ধ্যা পর্য্যন্ত থাকিতে পাইব কি?

* রাধা-কৃষ্ণতত্ত্ব গুরুতর বিষয়। মৎপ্রণীত রাধা-কৃষ্ণতত্ত্ব নামক গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

স। না।

অ। বড় পরিশ্রম করিয়া অনেক দূর হইতে আসিয়াছি। অন্ততঃ দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত থাকিয়া আহারাদি করিয়া চলিয়া যাইব।

স। তবে তাই।

তখন সর্দ্দার অজিতনাথকে দুইটি স্বর্ণমুদ্রা ভিক্ষা প্রদান করিলেন। অজিতনাথ তাহা লইয়া উঠিয়া চলিয়া গেল।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

অজিতনাথ পুনরায় সেই বৃদ্ধসিপাহীর বস্ত্রাবাসদ্বারে গিয়া উপস্থিত হইল। তিনি তখন রন্ধনকার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন। অজিতনাথ ধীরে ধীরে তাঁহার নিকটে গিয়া উপবেশন করিলেন।

বৃদ্ধ জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি ঠাকুর, সর্দ্দার তোমায় কি জন্য তলব করিয়াছিলেন? বোধ হয় গান শুনিতে। সর্দ্দারের গান শোনার সখ খুব।"

অ। না মহাশয়, তিনি গান শুনিতে আমায় ডাকেন নাই। আমাকে তাড়াইয়া দিবার জন্য ডাকিয়াছিলেন। অদ্য দ্বিপ্রহরের পরেই চলিয়া যাইতে হুকুম হইয়াছে।

বৃ। হাঁ আমাদের শিবিরে অন্য কোন জাতি বাস করিতে পারে না।

অ। কিন্তু কা'ল আমি যখন আসিয়াছিলাম, তখন সর্দ্দার আমাকে থাকিতে অনুমতি করিয়াছিলেন।

বৃ। কা'ল বোধ হয় ভাবিয়াছিলেন, তুমি যথার্থই ভিক্ষুক।

অ। আজ কিসে ভাবিলেন, আমি ভিক্ষুক নহি?

র। তোমার চেহারা দেখিলে সেরূপ বোধ হয় না। তোমাকে কোন প্রকারে সন্দেহ করিয়াছেন।

অ। আপনি এদলে কত দিন আছেন?

র। বহুদিন।

অ। আপনাদের জীবনের উদ্দেশ্যই কি পরের ধন লুণ্ঠন করা।

র। হাঁ।

অ। জীবনের ধারে মরণ আছে,—স্বর্গের ধারে নরক আছে, সে সকল কথা কি আপনারা কখনও স্মরণ করেন না?

র। তা করি বৈ কি।

অ। তবে কেমন করিয়া দু'দণ্ডের জীবনে পরের বুকে ছুরি মারিয়া তাহাদের সঞ্চিত ধন অপহরণ করেন?

র। আমাদের জাতীয় জীবনে এক মহান্ উদ্দেশ্য আছে, কেবল উদর পূর্ণার্থে আমরা এ বৃত্তি অবলম্বন করি নাই।

অ। সে উদ্দেশ্য কি?

র। জাতীয় বল সঞ্চয় করা। বিদেশীর অধীনতা বন্ধন হইতে স্বদেশকে মুক্ত করা। সে উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ধনসঞ্চয়ের প্রয়োজন,—আমরা তাই এই বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছি।

অ। ভুল করিয়াছেন। পাপে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা হয় না। আপনাদের বল আছে—সেই বল পাশববলে পরিণত হইতেছে, ইহাতে সাম্রাজ্য সংস্থাপন হইবে না। আপনাদের পতন নিশ্চয়। দেশের লোকের সমবেত শক্তি আপনাদের শক্তির সহিত শুভ-সম্মিলন হইলে, তবে সাম্রাজ্য সংস্থাপন হইত। আপনারা সতী রমণীর চক্ষুর জল, দরিদ্রের অভিশাপ, বালক-বালিকার রোদন-

তপ্তশ্বাস কুড়াইয়া কখনই জাতীয়শক্তি প্রতিষ্ঠা করিতে পারিবেন না। জগতে কেহ কখনও তাহা পারে নাই।

বৃদ্ধ নিস্তব্ধে অনেকক্ষণ কি চিন্তা করিল। তারপরে বলিল,—"তোমার উপরে অতিশয় শ্রদ্ধা হইতেছে, তুমি কে স্বরূপ পরিচয় দিবে কি?"

অ। আমি স্বরূপতঃই দরিদ্র ব্রহ্মচারী। একটা কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি?

বৃ। আপত্তি কি?

অ। আজি কয়দিন হইল, আমি দেখিয়াছিলাম—আপনাদের কতকগুলি সৈন্য একটি রমণীকে ধৃত করিয়া লইয়া আসিয়াছিল। রমণীর আকুল ক্রন্দনে দিগন্ত মুখরিত হইয়া পড়িয়াছিল—সে রমণী কে?

বৃ। তুমি সে সন্ধান কোথায় পাইলে?

অ। আমার আশ্রমের নিকট দিয়াই তাহাকে লইয়া আসিয়াছিল।

বৃ। এতক্ষণে বুঝিতে পারিলাম, তুমি সেই রমণীর সন্ধানার্থেই আসিয়াছ। কথাটা সর্দ্দারকে বলিয়া পাঠাই।

অজিতনাথ সে কথায় ভীত হইলেন না। তাহার নিশ্চয় ধারণা,—যিনি সৃষ্টি স্থিতি সংহার করেন। যিনি জীবের হৃদয়ে অবস্থান করিয়া সাক্ষিস্বরূপে বিরাজ করেন,—তিনি যাহা করাইবেন, তাহাই করিব। আমি কে যে, আমার ভয় হইবে? তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ করিতে পারে, মহারাষ্ট্রীয় সৈন্যের সাধ্য কি?

অজিতনাথ বলিলেন,—"আমি রমণীর সন্ধানে আসি আর না

আসি,—কিন্তু মহাশক্তির অংশরূপিণী রমণীর অবমাননাতে মহা-রাষ্ট্র-কলঙ্ক বাড়িবে বৈ কমিবে না। সে কে?"

বৃদ্ধ সে কথা শুনিয়াও কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিল। তারপর বলিল—"মহারাষ্ট্র-সৈন্যের অনিষ্ট করিতে পার,এমন শক্তি তোমার কোথায়? যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছ, তাহার উত্তর দিতেছি,—শোন। সেই রমণীকে ইচ্ছাপূর্ব্বক ধৃত করা হয় নাই। তোমাদের দেশের ফৌজদারের পুত্র আবদার রহিম খাঁ। ইতিমধ্যে একদিবস আমরা সমস্তিপুরের এক ভীল-সর্দ্দারের বাড়ী লুঠ করিতে গমন করি,—আবদার রহিম খাঁ সেখানে ছিল, সে আমাদের গতিরোধ করিবার জন্য যথেষ্ট বীরপণা করে। অগত্যা সে দিবস আমা-দিগকে ফিরিয়া আসিতে হয়,—তারপরে গোপন-সন্ধানে জানিতে পারিলাম, ঐ ভীলসর্দ্দারের যুবতীকন্যার সহিত আবদার রহিমের প্রণয় সঞ্চার হইয়াছে,—এবং তজ্জন্য সে প্রতিনিয়তই ঐস্থানে অবস্থান করে। তখন প্রথমে আবদার রহিমকে ধৃত করিবার জন্য আমাদের লালসা হয়,—একদা আমরা সদলবলে রাত্রে ভীল সর্দ্দারের বাড়ী আপতিত হই। আবদার রহিম অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত বীরত্ব প্রদর্শন করিয়া শেষে অশ্বারোহণে পলায়ন করে। আমা-দের কয়েকজন সাহসী সৈন্য তাহাকে ধৃত করিবার জন্য তাহার পশ্চাদ্ধাবিত হয়,—দুই দিন পরে একদা রাত্রে তাহাকে এক নদীর ধারে প্রাপ্ত হইয়া ধৃত করে। যে রমণীর কথা তুমি বলি-তেছ, ঐ রমণী তখন সেখানে ছিল, সৈন্যগণ ভুলক্রমে তাহাকে ধৃত করিয়া আনিয়াছে।"

অ। এখন যখন ভুল বোঝা গিয়াছে, তখন তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হয় নাই কেন?

র। হাঁ, তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হইবে, কিন্তু কিছুদিন পরে।

অ। তাহার কারণ?

র। আমরা যখন এ আড্ডা ভাঙ্গিয়া অন্যত্রে উঠিয়া যাইব, তখন তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হইবে। আমাদের নিয়ম এই যে,—যে আড্ডায় লোক ধৃত হইয়া আসে, সে আড্ডা থাকিতে তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হয় না। কেননা, তাহা হইলে সে আড্ডার সন্ধান সে লোকের নিকট বলিয়া দিতে পারে।

অ। সে রমণী—তাহার সম্বল সতীত্ব অক্ষুণ্ণ আছে ত?

বৃদ্ধ তাহার উত্তর দিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু সহসা ঝনাৎ করিয়া কোষমুক্ত তরবারির শব্দ হইল।

বৃদ্ধ সভয়ে চাহিয়া দেখিল, তাহাদের পশ্চাতে সর্দ্দার রক্ত চক্ষুতে দাঁড়াইয়া কোষ হইতে তরবারি উন্মুক্ত করিয়াছিলেন।

বৃদ্ধ কাঁপিয়া উঠিল। সর্দ্দার বলিলেন,—"বিশ্বাসঘাতক, মহারাষ্ট্র হইয়া মহারাষ্ট্র-শিবিরের কথা ব্যক্ত করিতেছিস্?"

বৃদ্ধ কথা কহিতে না কহিতে দুইজন ভীমকান্তি সিপাহী আসিয়া অজিতনাথ ও বৃদ্ধ মহারাষ্ট্র সিপাহীকে বন্ধন করিয়া লইয়া গেল। বৃদ্ধের রাঁধা রুটি ও তরকারি সেই স্থানে পড়িয়া থাকিল।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

অজিতনাথের সারাদিন আহার হয় নাই। সেই যে সকাল বেলা তাঁহাকে বন্ধন করিয়া আনিয়া মহারাষ্ট্র-শিবিরের কারাগারে পূরিয়া রাখা হইয়াছে, আর ছাড়িয়া দেওয়া হয় নাই। তখন রাত্রি দ্বিপ্রহর।

অস্থায়ী মহারাষ্ট্র-বস্ত্রাবাসের মধ্যস্থ একটি বৃহৎ বস্ত্রগৃহ,—সেই বস্ত্রগৃহই কারাগার। কারাগারের মধ্যস্থল বংশদণ্ড-বেষ্টনী-দ্বারা আবদ্ধ,—চারিদিকে শূলহস্তে ভীম প্রহরিগণ প্রহরণায় নিযুক্ত। কারাগারে সে দিবস প্রায় পঞ্চবিংশতি জন কয়েদী অবস্থিত। রাত্রি অধিক হওয়ায় সেই শয্যাশূন্য কঠিন মৃত্তিকার উপরে সকলেই প্রায় নিদ্রিত হইয়া পড়িয়াছে;—অজিতনাথের চক্ষে নিদ্রা নাই। তিনি সেখানে বসিয়া বসিয়া চিন্তা করিতেছিলেন; জ্যোৎস্নাবন্যায় তখন দিগন্ত ভাসিয়া গিয়াছিল এবং দেবদারু বৃক্ষের উৰ্দ্ধশাখায় বসিয়া পাপিয়া 'চো'খ্ গেল'র অবিরাম ঝঙ্কারে কোন্ অনুদ্দিষ্ট বেদনাপ্রদ কার্য্যসমালোচনার নিষ্ফল আশায় আপনার কণ্ঠস্বরকে ক্লান্ত করিতেছিল।

অজিতনাথ অনেক্ষণ ভাবিয়া চিন্তিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন; তারপর, ধীরে ধীরে সমস্ত কারাগৃহ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন।

এক কোণে একজন লোক সৰ্ব্বাঙ্গ বস্ত্রাবৃত করিয়া শয়ন করিয়াছিল, অজিতনাথ তাহার নিকটস্থ হইবামাত্র সে চমকিয়া উঠিয়া বসিল। বস্ত্রাবাসপ্রবৃষ্ট চন্দ্রকিরণে অজিতনাথ দেখিলেন, সে স্ত্রীলোক। সেখানে বসিয়া পড়িয়া ধীরে অথচ তাড়াতাড়ি বলিলেন,—"শোন মা, বিচলিত হইও না। আমি বোধ হয়, তোমাকেই খুঁজিতেছি। তুমি কে, আমাকে পরিচয় দাও।"

রমণী ভীতকম্পিত করুণকণ্ঠে কহিল,—"তুমি কে? আমায় কেন খুঁজিতেছ?"

অ। আমি বাঙ্গালী,—আমার নাম অজিতনাথ। মা, তোমার পরিচয় পাইলে আমি আমার কথা বলিতেছি।

র। আমি হতভাগিনী বিধবা রমণী—আমার পরিচয়

লইয়া আপনার কি হইবে? আপনিও বোধ হয়, আমার মত মহারাষ্ট্র-শিবিরে বন্দী। আমার পরিচয় লইয়া আপনি কি করিবেন? আমি হতভাগিনী—যে দিন স্বামীর মৃত্যু হয়, যে দিন সেই দেবতার দেহ পোড়াইয়া আবার গৃহে ফিরিতেছিলাম, সেই দিন এই নরকে আসিয়াছি।

অ। হাঁ, আমি আপনাকেই খুঁজিতেছি। আপনাকে যে দিবস ধরিয়া আনে, আমারই বাড়ীর নিকট দিয়া লইয়া আসিয়াছিল, আপনারই আকুল ক্রন্দন আমাকে আহ্বান করিয়া এখানে লইয়া আসিয়াছে।

র। ভগবান্ আপনার মঙ্গল করুন। কিন্তু আপনিও কি বন্দী হইয়াছেন?

অ। হাঁ, আমিও বন্দী হইয়াছি। কিন্তু মা, যিনি কার্য্যের জন্য বন্দীকে মুক্ত করেন, মুক্তকে বন্দী করেন,—ইহাও তাঁহারই কার্য্য! সে জন্য ভীত হইবেন না। তিনি যেরূপে যাহা করাইবেন, তাহাই হইবে। এখন একটা কথা জিজ্ঞাসা করিব।

র। কি কথা?

অ। আপনি কি জাগিয়াই ছিলেন?

র। সে প্রশ্ন কেন?

অ। আমি এদিকে আসিতেই আপনি চমকিয়া উঠিয়া বসিয়াছেন।

র। হাঁা গো, রমণী দস্যুগৃহে আবদ্ধ হইলে কি নিশ্চিন্ত মনে আহার নিদ্রায় সুখী হইতে পারে?

অ। আপনাকে যে দিবস লইয়া আসে, সেই দিবস আর

একটি যুবককে লইয়া আসিয়াছিল,—সে যুবক কোথায় আছে জানেন কি?

র। জানি,—গতকল্য বৈকালে তাহাকে বাহির করিয়া একবার সর্দ্দারের নিকট লইয়া গিয়াছিল, তাহার পরে তাহাকে এখানে আর আনিয়াছে কি না, দেখি নাই। একেবারের পূর্ব্ব-দিকের বেড়ার নিকটে তিনি থাকেন।

অ। তিনি কে, আপনি তাহা জানেন কি?

র। এখন জানিয়াছি। তিনি ফৌজদার সাহেবের ছেলে। আপনি বলিতেছিলেন, আমাকে খুঁজিতেছেন—কেন, আমাকে খুঁজিয়া আপনি কি করিবেন?

অ। আপনি স্ত্রীলোক,—দুষ্টগণ আপনাকে অন্যায় করিয়া ধরিয়া আনিয়াছে, আমি রক্ত-মাংস-বিশিষ্ট জীব—আমার কি ইচ্ছা হয় না যে, আপনাকে উদ্ধার করি?

র। আপনার উদ্দেশ্য সাধু। আপনিও সাধু। কিন্তু কি প্রকারে আমায় উদ্ধার করিবেন? মহারাষ্ট্রীয় শক্তির বিরুদ্ধে কে তিষ্ঠিতে পারে? বিশেষতঃ আপনি ব্রহ্মচারী।

অ। ব্রহ্মচারী বাহ্য শক্তির অপেক্ষা করে না,—যিনি ব্রহ্মচারীর হৃদয়দেবতা, যিনি অসুর-বল সংহার করিয়া বিপন্নকে উদ্ধার করিয়া থাকেন,—যিনি দুষ্টের বিনাশ ও শিষ্টের পালন করেন,—তিনিই আপনাকে উদ্ধার করিবেন। এক্ষণে আমি একবার ফৌজদার সাহেবের পুত্র আব্দার রহিমের নিকট হইতে আসি।

র। তাঁহার যে ঐ নাম, তাহা আপনি কি প্রকারে অবগত হইলেন?

অ। মহারাষ্ট্র-সর্দ্দারের নিকটে শুনিতে পাইয়াছিলাম।

র। আপনি কি মহারাষ্ট্র-সর্দ্দারের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন?

অ। হাঁ।

র। তিনি কি আমাদের সম্বন্ধে কিছু বলিয়াছেন?

অ। না না—এ সম্বন্ধে তাঁহার সহিত কোন কথাই হয় নাই। তাহা হইলে এতক্ষণ আমার দেহ হইতে মুণ্ড বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইত। আমি ভিক্ষার্থী হইয়া এখানে আসিয়াছিলাম। তথাপি আমাকে সন্দেহ করিয়া কারাগারে প্রেরণ করিয়াছে।

র। আপনিও তবে বন্দী?

অ। হাঁ, বন্দী না হইলে এখানে আমি কি প্রকারে আসিতে পারিতাম?

র। কিন্তু আপনি সাবধান হইবেন,—যেন এই হতভাগিনীর জন্যে আপনার কোন অনিষ্ট না হয়। আমি স্বামিহীনা বিধবা রমণী,—আমার জীবনে কোন প্রয়োজন নাই। আবশ্যক হইলে দেহ ত্যাগে সকল জ্বালা জুড়াইতে পারিব।

তখন অজিতনাথ অশ্রুপূর্ণ লোচনে গদ্গদ কণ্ঠে কহিলেন,— "মা, বঙ্গবাসী যেরূপ দুর্ব্বল ও স্বার্থপর, তাহাতে বঙ্গ রমণী-গণের মৃত্যুই শ্রেয়ঃ, কিন্তু যিনি অবলাবান্ধব, তিনি রক্ষা করিবেন,— আপনি তাঁহাকে ডাকুন। তিনিই রক্ষা করিবেন,—কদাচ আত্মহত্যা করিবেন না; আত্মহত্যায় মহাপাপ।"

রমণী সে কথার কোন উত্তর প্রদান করিলেন না; একটি দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া পার্শ্বস্থ বেড়ার বংশখণ্ডে ঠেসান দিলেন। অজিতনাথ উঠিয়া চলিয়া গেলেন।

ধীর-পদ-বিক্ষেপে ও অতি সতর্কতার সহিত আব্‌দার রহিম যে দিকে আছে, সেই দিকে গমন করিলেন। অতিশয় সতর্কতাবলম্বন করিতে হইতেছে, এই জন্য যেন সেই বস্ত্রাবাসের পার্শ্বেই কৃতান্তোপম প্রহরিগণ জাগরিত রহিয়াছে। কোন প্রকারে কিছু জানিতে পারিলে, বেত্রদণ্ডে দণ্ডিত করিয়া বাঁধিয়া রাখিবে।

রমণীর নির্দ্দেশ মতে অজিতনাথ সে স্থলে উপস্থিত হইলেন, এবং দেখিলেন, এক জন লোক একটা ছিন্ন কম্বল গাত্রে জড়াইয়া নিদ্রা যাইতেছে। অজিতনাথ তাহাকে ডাকিতে পারেন না— ডাকিবার পক্ষে দুইটি অন্তরায় উপস্থিত। কেন না, সে ব্যক্তি নিদ্রিত। যদি চীৎকার করিয়া ডাকা হয়, তবে বাহিরের প্রহরিগণ সে শব্দ শুনিতে পাইবে। আর যদি গাত্রে হস্তার্পণ করিয়া ডাকা হয়, তাহা হইলে নিদ্রিত ব্যক্তি চমকিয়া চীৎকার করিয়া উঠিতে পারে। যাহা হউক অজিতনাথ সেই নিদ্রিত ব্যক্তির নিকটে উপবেশন করিয়া ধীরে ধীরে তাহার গাত্রে হস্তামর্ষণ করিতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ এইরূপ করিলে সে ব্যক্তি জাগ্রত হইল, এবং চমক খাইয়া উঠিয়া বসিল। চন্দ্রকরালোকে অজিতনাথের দিকে চাহিয়া বলিল,—"কে তুমি, আমায় জাগাইলে কেন?"

অজিতনাথ তাহার দিকে আরও কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া অতি মৃদুস্বরে বলিলেন,—"আপনি কে পরিচয় দিন। আমি বাঙ্গালী।"

সে ব্যক্তি বলিল,—"আমি আব্‌দার রহিম। তুমি কাহাকে খুঁজিতেছ?"

অ। আপনাকেই।

অ। আমাকে! আমাকে কি জন্য খুঁজিতেছ?

অ। আপনার খোঁজে অনেক লোক নিযুক্ত হইয়াছে। আপনার অদর্শনে আপনার পিতা মাতা ও আত্মীয় স্বজন শোকার্ত্ত হইয়াছেন।

আ। তুমিও আমাদের বাড়ী হইতে আসিয়াছ?

অ। আপনাকে খুঁজিতেই আসিয়াছি। অধিক কথা কহিবার স্থান এ নহে। কাপড়ের অপর পাশেই প্রহরিগণ সশস্ত্রে প্রহরায় নিযুক্ত। ঘুণাক্ষরে কোন কথা শুনিতে পাইলেই সর্ব্বনাশ হইবে। অল্পের মধ্যে কয়েকটী কথা বলি, শুনুন।

আ। হাঁ, কি বল?

অ। আমি আপাততঃ বন্দী রূপে এই কারাগারে আনীত হইয়াছি। কিন্তু আপনার সন্ধান পাইলাম, এক্ষণে আমি পলায়নের চেষ্টা করিব। যদি পলাইতে পারি, তবে আগামী পরশ্ব সৈন্য লইয়া আসিয়া মহারাষ্ট্রীয় শিবির আক্রমণ করিব। আপনি আমাদের সহিত মিলিত হইবেন।

আ। এ তোমার মূর্খতা,—মহারাষ্ট্রশক্তির সহিত তুমি কতকগুলি সৈন্য লইয়া আসিয়া কি করিতে পারিবে?

অ। এক সুবিধা আছে?

আ। কি?

অ। আমি গোপনে জানিতে পারিয়াছি, আগামী পরশ্ব মহারাষ্ট্রদের প্রায় সমস্ত লোক সমস্তিপুরের জমিদার বাড়ী লুট করিতে যাইবে, আমরাও সেই সময় আসিয়া আক্রমণ করিব।

আ। কিন্তু পথে আমাদের সর্ব্বনাশ করিবে।

অ। অত ভয় করিতে গেলে মানুষ বাঁচে না;—কারাগারে পড়িয়া মরার চেয়ে স্বাধীন ভাবে মরা ভাল।

আ। তুমি বাহির হইবে কি প্রকারে?

অ। সে ব্যবস্থা হইবে। আর একটি কথা,—

আ। কি কথা বল?

অ। আপনার সহিত একটি রমণীকে বন্দী করিয়া আনিয়াছিল,—কারাগারে আসিয়া সে রমণীর সন্ধান জানেন কি?

আ। হাঁ, জানি। ঐ ও-কোণে তিনি থাকেন।

অ। তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া বাহির হইবেন।

আ। এক কথা শোন।

অ। কি?

আ। গতকল্য মহারাষ্ট্র-সর্দ্দার আমাকে তাহার নিকটে লইয়া গিয়াছিল, এবং বলিয়াছিল---আমার পিতার নিকট লোক পাঠাইয়া যদি লক্ষ মুদ্রা আনাইয়া দিতে পারি, তবে সে আমাকে ছাড়িয়া দেয়।

অ। আপনি কি বলিয়াছেন?

আ। প্রথমে বলিলাম—অতটাকা আমাদের নাই—কুড়ি পঁচিশ হাজার হইলে পারি। সর্দ্দার সে কথা গ্রাহ্য করিল না। তার পরে পঞ্চাশ হাজারের, কথা বলিলাম—তথাপি সর্দ্দার স্বীকৃত হইল না। অগত্যা তখন এক লক্ষ টাকার জন্য পিতার নিকটে এক পত্র লিখিয়া দিলাম। যদি টাকা আসে তবে অব্যাহতি পাইব।

অ। টাকা আসিবে বলিয়া কি মনে করেন?

আ। অসম্ভব।

অ। কেন?

আ। অত টাকা কোথায়!

তখন অজিতনাথ বলিলেন,—"আমি পরশ্ব সৈন্য লইয়া আসিব; আপনি সেই স্ত্রীলোকটিকে লইয়া বাহির হইবেন।"

আব্দার রহিম বলিলেন,—"যদি মহারাষ্ট্র-সৈন্য বিধ্বস্ত করিতে পার, বাহির হইব।"

অজিতনাথ উঠিয়া গেলেন, আব্দার রহিম আবার শয়ন করিলেন।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

যেখানে বন্দী বৃদ্ধ মহারাষ্ট্রীয়-সৈন্য অবস্থান করিতেছিল, অজিতনাথ তথায় গিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং তাহার গাত্রে হস্তার্পণ করিয়া ডাকিলেন। বৃদ্ধ উঠিয়া চাহিল।

অজিতনাথ বলিলেন,—"মহাশয়, একটা কথা বলিব।"

বৃদ্ধ বিরক্তিস্বরে বলিল,—"কি কথা?"

অ। আমি নিরপরাধে বন্দী হইয়াছি, আপনি তাহা অবশ্যই জানেন।

বৃ। আমি জানিলে কি হইবে? আমিও বন্দী।

অ। আমি দরিদ্র ভিক্ষুক, আমাকে যদি আপনি দয়া করিয়া ছাড়িয়া দেন।

বৃ। তুমি কি পাগল? আমি ছাড়িয়া দিব কি প্রকারে?

অ। ইচ্ছা করিলে দিতে পারেন।

বৃ। কি প্রকারে?

অ। আপনার পোষাক যদি আমায় দেন, চলিয়া যাইতে পারি।

র। তারপর?

অ। তারপর কি বলুন?

র। তারপর সর্দ্দার আমাকে কি আস্ত রাখিবে?

অ। কেন?

র। তুমি আমার কাপড়-চোপড় পরিয়া পলায়ন করিয়াছ জানিতে পারিলে, তিনি আমাকে কাটিয়া ফেলিবেন। কেন না, তাহাতে সকলেই বুঝিতে পারিবে যে, আমারই যোগাড়ে তুমি পলায়ন করিয়াছ।

অ। আপনি কি কোন রকমে কা'ল সকালে একটি পোষাক সংগ্রহ করিতে পারিবেন না?

র। তাহাও যদি পারি, কিন্তু কেবল আমার বস্ত্রাদি পাইলেও তুমি পলায়ন করিতে পারিবে না।

অ। কেন?

র। শিবিরের চারিদিকে প্রহরিগণ সতর্কতার সহিত পাহারা দেয়।

অ। মহারাষ্ট্রীয় সৈনিকের বস্ত্রাদি পরিধান করিয়া গেলে আমায় ছাড়িয়া দিতে পারে।

র। না। মহারাষ্ট্র-শিবিরের নিয়ম এই যে, রাত্রির আহারাদি সম্পন্ন হইয়া গেলে একবার শিঙ্গাধ্বনি হয়,—তখন যাহাদিগের বাহিরে যাইবার প্রয়োজন,—অর্থাৎ শিবিরের বাহিরে গিয়া রাত্রিযাপন করিবার প্রয়োজন, তাহারা বাহিরে চলিয়া যায়, এবং যাহারা বাহিরে ছিল, রাত্রে ভিতরে আসিবে, তাহারা তখন চলিয়া আইসে—আবার প্রভাতের শিঙ্গাধ্বনি না হইলে কাহারও শিবিরের বাহিরে যাইবার বা ভিতরে আসিবার অধিকার নাই।

অজিতনাথ কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন,—"আপনার বস্ত্রাদি পাইলে, তথাপি আমি একবার চেষ্টা করিয়া দেখিতাম।"

তখন বৃদ্ধ অজিতনাথের মুখের দিকে অনেকক্ষণ চাহিয়া কি দেখিল। তারপরে বলিল, "তুমি বাপু সোজা লোক নও। কিন্তু তোমার চেহারায় আমি মুগ্ধ হইয়াছি। কতজনের জীবন এই হস্তে বিনষ্ট করিয়াছি;—ভাল, তোমার জন্য না হয় আমার জীবন যাক্। এই লও, আমার উষ্ণীষাদি।"

এই কথা বলিয়া বৃদ্ধ উষ্ণীষ ও বস্ত্রাদি খুলিয়া দিল।

অজিতনাথ তখন সেই উষ্ণীষাদি লইয়া স্থানান্তরে চলিয়া গেল এবং তাহা যথাযথ ভাবে পরিধান করিয়া একবার যুক্তকরে আকাশের দিকে চাহিয়া কারাগার হইতে বাহির হইল। কারা-প্রহরী রুক্ষস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "কে তুমি?"

মহারাষ্ট্রীয় ভাষাতেই অজিতনাথ বলিলেন,—"আমি বন্দি-গণকে দেখিতে আসিয়াছিলাম।"

প্রহরী জিজ্ঞাসা করিল,—"তুমি কখন কারাগারের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছিলে?"

অজিতনাথ বলিলেন,—"বড় অধিকক্ষণ নহে, তোমার পাহারার আগে।

প্রহরী চিন্তা করিয়া দেখিল, মহারাষ্ট্রীয় সৈনিক একজন মাত্র বন্দী হইয়াছে, সেও বৃদ্ধ। এ নব্য যুবক, তবে কারাপরিরক্ষকই হইতে পারে। সে আর কথা কহিল না। অজিতনাথ চলিয়া গেলেন।

আরও কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া বামদিকে একটু ঘুরিয়া শিবির-দ্বারে উপস্থিত হইলেন।

সেখানে তখন একজন সিপাহী মস্ত একটা ভল্লাস্ত্র স্কন্ধে করিয়া একটা বংশদণ্ডে ঠেস দিয়া দাঁড়াইয়া ঝিমাইতেছিল। অজিতনাথের পদশব্দে সে চমকিয়া উঠিয়া বলিল,—"কে তুমি ?"

অজিতনাথ মৃদুস্বরে বলিল,—"চুপ কর। একটা কথা আছে।"

প্র। কি কথা ?

অ। কথাটা বড়ই মজার। যদি শোন, তোমারও লাভ, আমারও লাভ।

প্র। কি কথা বল না।

অ। সে দিন দুর্গাপুরের রাজবাড়ী লুঠিতে গিয়া আমি এক ঘড়া সোণার টাকা পাইয়া লুকাইয়া ফেলিয়াছিলাম।

প্র। তারপর ? সে টাকা কোথায় রাখিয়াছ ? লুঠের টাকা সব সর্দ্দার নেয়, আমরা নেই সামান্য অংশ। তোমার টাকার সন্ধান পায় নাই ত ?

অ। না ভাই,—সে টাকা আমি খুব সাবধানেই রাখিয়াছিলাম।

প্র। কোথায় রাখিয়াছ ?

অ। সেই দিন আসিবার সময় ঐ যে কটা তালগাছ দেখিতেছ, ওরই কাছে পুতে রেখে এসেছিলাম। এখন দিনমানেও তা তুলিয়া আনিতে পারি না। রাত্রেও শিবিরের বাহিরে যাইবার উপায় নাই। তা যদি এক কাজ করিতে পার ?

প্র। কি কাজ ?

অ। যদি পার, তবে টাকাগুলার অর্দ্ধেক তোমার, অর্দ্ধেক আমার। কি জানি, যদি কেহ কোন প্রকারে সন্ধান পাইয়া তুলিয়া লইয়া যায়।

প্রহরীর মনে ভারি আনন্দ হইল। সে বলিল,—"আমায় কি করিতে বল?"

অ। আমি সেই টাকাগুলা লইয়া আসি, আমায় পথ ছাড়িয়া দাও।

প্র। সে আর কঠিন কথা কি? লুঠ করিতে আমাদের আসা,—টাকা চাই। তুমি স্বচ্ছন্দে লইয়া আইস,—কিন্তু ভাই, অর্দ্ধেকাংশ দিতে হইবে।

অ। সে আবার কি কথা। যাহা বলিয়াছি, তাহার কি ব্যত্যয় হইবে। টাকা আনিয়া এই স্থানে বসিয়াই অর্দ্ধাঅর্দ্ধি ভাগ করিয়া লইব।

প্র। তবে শীঘ্র চলিয়া যাও.—কেহ আবার দেখিতে পারে।

তখন অজিতনাথ বাহির হইয়া পড়িলেন, এবং তালবাগানের দিকে দ্রুত পদে চলিয়া গেলেন। সিপাহী-পুঙ্গব অতটা স্বর্ণমুদ্রার সমাগম হইবে, এই আনন্দে বার কয়েক শ্মশ্রুগুম্ফে অঙ্গুলি সঞ্চালন করিয়া আবার বংশদণ্ডে হেলায়মান দেহ হইয়া চক্ষু নিমীলিত করিলেন।

অজিতনাথ যতদূর সম্ভব দ্রুত পদে চলিতে লাগিলেন,—যখন রাত্রি অবসান হইল, তখন তিনি গিয়া তাঁহার সৈন্যগণের সহিত সম্মিলিত হইলেন।

সৈন্যাধ্যক্ষ তাঁহার মহারাষ্ট্রীয় বেশ দেখিয়া প্রথমে আবদ্ধ করিবার চেষ্টা করিয়াছিল, অবশেষে যখন চিনিতে পারিল, এবং সমস্ত বিষয় অবগত হইতে পারিল, তখন অজিতনাথের বুদ্ধিমত্তা ও সাহসের ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিল।

তারপরে উভয়ে পরামর্শ করিয়া আরও দুই দিন সেই জঙ্গল

মধ্যে সকলে লুক্কায়িত হইয়া থাকিলেন। যে দিবসে মহারাষ্ট্র-সৈন্যগণের রাজবাড়ী লুণ্ঠন করিতে যাইবার দিন ছিল, সেই দিবস সন্ধ্যার পরেই তাঁহারা সসৈন্যে যাত্রা করিলেন, এবং ঠিক রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় মহারাষ্ট্র-শিবির-সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন।

অজিতনাথ অগ্রগামী হইয়া দেখিলেন, মহারাষ্ট্রগণ রাজবাড়ী লুণ্ঠন করিতে গিয়াছে কি না। যখন নিশ্চয় জানিতে পারিলেন যে, মহারাষ্ট্রগণ চলিয়া গিয়াছে, কেবল জন কয়েক মাত্র শিবির-রক্ষার্থে সেখানে অবস্থান করিতেছে, তখন সিংহবিক্রমে সমস্ত সৈন্য লইয়া অজিতনাথ তাহাদের উপরে আপতিত হইলেন।

যে সকল মহারাষ্ট্রীয় শিবির-রক্ষার্থে সেখানে উপস্থিত ছিল, তাহারা প্রাণপণে লড়িতে লাগিল, কিন্তু সংখ্যায় নিতান্ত অল্প হওয়ায়, অতি অল্প সময়ের মধ্যেই তাহারা হতবল হইয়া ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল, এবং বাঙ্গালীর হস্তে শিবির অর্পণ করিয়া যে যেদিকে পারিল পলায়ন করিল।

তখন অজিতনাথ শিবিরমধ্যস্থ কারাগার-সন্নিধানে গমন করিলেন,—সেখানে যে কয়জন বন্দী ছিল, তাহাদিগকে মুক্ত করিয়া দিয়া আব্দার রহিম ও যুবতীকে লইয়া বাহির হইলেন।

আব্দার রহিম অজিতনাথকে শত শত ধন্যবাদ প্রদান করিল।

রমণী বলিল,—"আমি কোন পুরুষের সঙ্গে অশ্বারোহণে যাইব না। একাও অশ্বে উঠিতে জানি না।"

সৈন্যাধ্যক্ষ বলিল,—"স্ত্রীলোকের কথা শুনিয়া কাজ করা হইবে না, আমরা এখনও নিরাপদ্ নহি। উহাকে অশ্বে তুলিয়া লইয়া চলুন!"

কিন্তু রমণী তাহাতে বিষম আপত্তি তুলিল। সে বলিল,—"মরিতে হয়, মরিব। তবু পুরুষের সহিত একত্রে অশ্বারোহণ করিব না।"

তখন অজিতনাথ সৈন্যাধ্যক্ষকে বলিলেন,—"সৈন্যাদি লইয়া তুমি সত্বর চলিয়া যাও। আমি রমণীকে লইয়া হাঁটা পথে যাইব।"

সৈন্যাধ্যক্ষ বলিল,—"সে কি মহাশয়? আপনি কি আপনার প্রাণের মায়া করেন না?"

অজিতনাথ মৃদু হাসিয়া বলিলেন,—"প্রাণের যিনি প্রাণ, তিনিই এ প্রাণ রক্ষা করিবেন। তোমরা আর মুহূর্ত্ত বিলম্ব করিও না।"

তখন সৈন্যাধ্যক্ষ আব্দার রহিম ও সৈন্যগণকে লইয়া চলিয়া গেল।

অজিতনাথ রমণীকে বলিলেন,—"তবে চলুন, আমরা হাঁটিয়া যাই।"

রমণী বিনাবাক্য-ব্যয়ে চলিতে লাগিল, অজিতনাথ তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন।

কত দূর চলিয়া গিয়া রমণী কাতর স্বরে বলিল,—"আমি আর চলিতে পারিতেছি না।"

অজিতনাথ বলিলেন,—"এখানে যে জঙ্গল, ব্যাঘ্র ভল্লুকের ভয় আছে। অতএব এখানে না বসিলেই ভাল হয়।"

রমণী বসিয়া পড়িল, বলিল,—"আমার জন্য আপনি কষ্ট পাইবেন না। আমার জীবন তুচ্ছ—আপনার মূল্যবান্ জীবন। আমি মরিলে ক্ষতি নাই,—আপনি চলিয়া যান।"

অজিতনাথ চমকিয়া উঠিলেন। এক ভীষণ-কায় ব্যাঘ্র তাহার লোলুপ দৃষ্টিতে রমণীকে নিরীক্ষণ করিতেছিল।

অজিত মুহূর্ত্তমধ্যে শূল উত্তোলন করিলেন.—মুহূর্ত্ত মধ্যে ব্যাঘ্র লম্ফ দিয়া যুবতীর স্কন্ধোপরি আসিল। মুহূর্ত্ত মধ্যে অজিতনাথ সেই বিশাল শূলাগ্র ব্যাঘ্রের বিস্তারিত বদন মধ্যে প্রবিষ্ট করিয়া দিয়া তাহাকে পাতিত করিলেন।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

যুবতী বড় ভীতা হইয়া পড়িয়াছিল। সে এক প্রকার মূর্চ্ছিতবৎ হইয়াছিল। অজিতনাথ তাহাকে বলিলেন,—"তুমি কি বড় ভয় পাইয়াছ?"

যুবতী সহসা সে কথার উত্তর দিতে পারিল না। কেবল স্থির অচঞ্চল দৃষ্টিতে অজিতনাথের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

অজিতনাথ পুনরপি বলিলেন,—"তোমার ভয় নাই। বাঘটা মরিয়া গিয়াছে।"

যুবতী এবার কথা কহিল। কম্পিত কণ্ঠে আর্ত্তস্বরে বলিল,—"আপনার সর্ব্বাঙ্গে রক্তমাখা হইয়াছে। আপনি আমাকে লইয়া এ পথে আসিয়া কি ভয়ানক কার্য্যই করিয়াছেন। আমি দ্রুত চলিতে পারি না—এ সব পথে আমার মত লোক সঙ্গে করিয়া যাওয়া বড় বিপজ্জনক।"

অজিতনাথ সে কথার কোন উত্তর প্রদান না করিয়া

অজিতনাথ চমকিয়া উঠিলেন। এক ভীষণ-কায় ব্যাঘ্র তাহার লো

বলিলেন,—"এখন আপনার পরিশ্রম বিদূরিত হইয়াছে কি? আপনি এখন চলিয়া যাইতে পারিবেন কি?"

রমণী দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিল,—"চলুন যাইতেছি। কিন্তু আমি কোথায় যাইব? যাইবার আমার স্থান নাই—রমণীর আশ্রয়স্থল স্বামী। আমি স্বামি-হীনা।"

অতঃপর রমণী উঠিয়া দাঁড়াইল। অজিতনাথ বলিলেন,—"আপনি আগে আগে চলুন।"

রমণী বলিল,—"আপনার আগে আগে যাইতে আমার লজ্জা করে।"

অজিতনাথ হাসিয়া বলিলেন,—"মা, শ্মশানে লজ্জা থাকে না। আমরা এখন জঙ্গল-পথে যাইব, আপনি স্ত্রীলোক—ব্যাঘ্রাদির আক্রমণে আত্মরক্ষা করিতে পারিবেন না। অতএব আপনি আগে আগে চলুন। সন্তানের কাছে মায়ের লজ্জা কি?"

তখন রমণী ধীর মন্থর গমনে চলিতে লাগিল। অজিতনাথ রমণীর অনুগমন করিলেন।

তখন জ্যোৎস্নার তরলিত হৈম কিরণে দিগন্ত আলোকিত করিয়াছিল। কিন্তু গাছের ছায়ায় তাহাদিগের গম্যপথে আলোক-আঁধারে মিশিয়া খেলা করিতেছিল। এক একবার নৈশ বায়ু স্তব্ধ প্রকৃতির চক্ষের উপর দিয়া স্বন্ স্বন্ করিয়া বহিয়া যাইতেছিল। ক্বচিৎ বনান্তরালে ভল্লুকের বিষম নাদ শ্রুতিগোচর হইতেছিল।

রমণী পথে যাইতে যাইতে ভাবিতেছিল—জগতে মানুষ অনেক; কিন্তু সবাই এই যুবকের মত হয় না কেন? ইনি পরের জন্য নিজের প্রাণের মমতা করেন না। পরের কষ্ট নিবারণের জন্য আপন কষ্ট গ্রাহ্য করেন না। ইনি রূপে কার্ত্তিকেয়—অথচ,

সন্ন্যাসী। গুণে অতুল্য, অথচ পরম বিনয়ী। হয়ত ইনি শাপভ্রষ্ট দেবতা। নয়ত দেবদূত।

এই সময়ে তাহারা একটা প্রান্তরে আসিয়া উপস্থিত হইল। প্রান্তর বহু দূরবর্ত্তী। জ্যোৎস্না সেখানে সীমাহারা হইয়া আলোক প্রদান করিতেছিল। দূরে দূরে দুই একটি বৃক্ষ জ্যোৎস্নারাশি মাথায় করিয়া দাঁড়াইয়াছিল। প্রান্তর-পথে চলিতে চলিতে অজিতনাথ বলিলেন,—"এখন আমরা অনেকটা নিরাপদ্ হইয়াছি। আপনার কি চলিতে কষ্ট হইতেছে?"

দীর্ঘ শ্বাস পরিত্যাগ করিয়া রমণী বলিল,—"কষ্ট হইলেও যখন যাইতে হইবে, তখন ঘনঘন বসিয়া কি করিব! তবে যখন নিতান্ত অশক্ত হইব, তখনই বসিব। কিন্তু আপনাকে জিজ্ঞাসা করি, আমাকে কি উদ্দেশে কোথায় লইয়া যাইতেছেন?"

অ। আপনার জীবনের উদ্দেশ্য আপনার অদৃষ্টই জানেন। তবে লইয়া যাইতে হয়, লইয়া যাইতেছি।

রমণী চমকিয়া উঠিল। ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল,—"আপনাকে বিশ্বাস করিয়া সঙ্গে যাইতেছি। আমার অদৃষ্ট আমার জীবনের উদ্দেশ্য জানে—সে কি কথা? আমাকে কোথায় রাখিবেন, না বলিলে আমি আর যাইব না। সমাজের মানুষ-পশুর চেয়ে বনের মাংস-খাদক পশু ভাল। বনের পশু যা নষ্ট করে, তাতে পরকালের হানি হয় না।

কথা বলিতে বলিতে জ্যোৎস্নালোকে রমণী সুস্পষ্ট দেখিতে পাইল, অজিতনাথের চক্ষু দিয়া জলধারা পতিত হইতেছে। দেখিয়া রমণীর হৃদয় গলিয়া উঠিল, ব্যগ্র-কাতর প্রাণস্পর্শী করুণ স্বরে বলিল,—"আমি কি আপনার মনে ব্যথা দিয়াছি?"

অ। না না, আপনি কেন আমার মনে ব্যথা দিবেন? আপনার অবস্থা শুনিয়াই দুঃখিত হইয়াছি। ভাল, বাড়ীতে আপনার আর কে আছেন?

র। আমার শাশুড়ী আছেন।

অ। আপনাকে বাড়ী পঁহুছাইয়া দিলে আপনি তাঁহার সহিত মিলিয়া সংসার করিবেন।

র। আপনি পুরুষ,—কাজেই রমণী-হৃদয় বুঝেন না। জগতে আসিয়া রমণীর নিজের বলিয়া কিছুই থাকে না। রমণীর সব স্বামি-পুত্রের জন্য,—কিন্তু আমি অভাগিনী তাহাতে বঞ্চিত; তবে সংসারে আমার প্রয়োজন কি?

অ। স্বামীর কর্ত্তব্য আপনি পালন করিবেন। আপনার স্বামীর মাতা আছেন, তাঁহার সেবা-শুশ্রূষা করা আপনার কর্ত্তব্য।

র। তাই বলিয়াই স্বামীর সঙ্গে পুড়িয়া মরি নাই। কিন্তু তাহাতেও বঞ্চিত হইয়াছি—সে সাধে পাপাত্মগণ বাদ সাধিয়াছে।

অ। কেন, কি হইয়াছে?

র। কি হইয়াছে, আপনি কি বুঝিতে পারিতেছেন না? দুষ্টগণ আমাকে ধরিয়া আনিয়াছিল—ইহা দেশে প্রচার হইয়াছে। সমাজে আমাকে গ্রহণ করিবে না।

অ। আপনার শাশুড়ী পুত্র-কন্যাহীনা—একমাত্র আপনিই তাঁহার বৃদ্ধকালের অবলম্বন। আপনাকে পবিত্র জানিলে, তিনি আপনাকে ছাড়িয়া সমাজ লইয়া কি করিবেন?

র। সেরূপ প্রমাণ তিনি কিরূপে পাইবেন? প্রমাণ না পাইলে তিনি আমার ছোঁয়া জলও খাইবেন না।

অ। আমি প্রমাণ দিব।

র। আপনার প্রমাণে কি হইবে?

অ। কেন?

র। আপনি আমার সকল দিনের খবর জানেন না।

অ। আপনার হৃদয়ের খবর অনেকটা প্রাপ্ত হইয়াছি—এমন হৃদয়ে পাপ প্রবেশ করিতে পারে না, ইহা আমি শপথ করিয়া বলিতে পারি।

র। আপনি কি আমায় বিশ্বাস করেন?

অ। হাঁ, আপনি দেবী, ইহা আমার বিশ্বাস হয়। আপনি কি ভালরূপ লেখাপড়া জানেন?

র। স্ত্রীলোকে ভাল লেখাপড়া কি প্রকারে জানিবে? স্বামী অনুগ্রহ করিয়া কয়েকখানি গ্রন্থ অধ্যয়ন করাইয়াছিলেন।

অ। রাত্রি অনেক হইয়া গিয়াছে—আমাদিগকে ধীরে ধীরে যাইতে হইবে। অতএব চলিতে আরম্ভ করুন।

রমণী চলিতে আরম্ভ করিল। অজিতনাথও তৎপশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে যাইতে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আমি বলিয়াছিলাম, আপনার অদৃষ্টই আপনার অবস্থা-পথে লইবে, ইহাতে আপনি কি ভীত হইয়াছেন?"

র। হাঁ, কথাটায় আমার ভয় হইয়াছিল।

অ। কেন?

র। আমার অদৃষ্ট বড় খারাপ,—আমার অদৃষ্টমতে যদি আমার জীবনের কার্য্য হয়, তবে কত কষ্টই যে ভোগ করিতে হইবে, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। যদি অদৃষ্টে কষ্টভোগ না থাকিবে, তবে এত অল্প বয়সে আমার স্বামী আমাকে ফাঁকি

দয়া চলিয়া যাইবেন কেন? তাঁহার সোণার দেহ আগুনে পুড়াইয়া গৃহে না ফিরিতেই শ্মশান হইতে পাপাত্মগণ আমাকে ধরিয়া আনিবে কেন? আমার জ্ঞান হয়, ইহা আমার অদৃষ্ট-লিপির প্রথম অধ্যায়;—এখনও অনেক আছে। আপনাকে দৈবতা বলিয়াই আমার বোধ হইতেছে—আপনি আমার গুরু, আপনি আমার পিতা—দয়া করিয়া বলুন, অদৃষ্টলিপি মুছিয়া ফেলিবার কোন উপায় নাই কি?

অ। হাঁ, আছে।

র। সে উপায় আমাকে শিখাইয়া দিবেন?

অ। সে উপায় ভগবানে আত্মসমর্পণ।

র। আমি বুঝিতে পারিলাম না।

অ। আপনি জানেন কি, আমাদের দেহ, আমাদের ইন্দ্রিয় সমুদায়, আমাদের মনঃপ্রাণ সকলই অনিত্য। আর 'আমরা' বা জীবাত্মা সকল নিত্য।

র। আমার স্বামীর নিকটে ঐ সকল কথা শুনিয়াছি।

অ। যাহা অনিত্য—বিনশ্বর, তাহার উপরেই অদৃষ্টের ক্রিয়া। কেন না, অদৃষ্টও অনিত্য—বিনশ্বর। আত্মা অবিনশ্বর ও নিত্য, সুতরাং নিত্য ও অবিনশ্বর আত্মার উপরে অনিত্য ও বিনশ্বর পদার্থে কার্য্য করিবে কি প্রকারে। অতএব, সুখ-দুঃখ প্রভৃতি যাহা অদৃষ্টজ, তাহা ইন্দ্রিয়াদিরই গ্রাহ্য, আত্মার নহে। এখন কথা এই যে, সুখ-দুঃখ যদি আত্মার গ্রাহ্য নয়, তবে তাহাতে মুগ্ধ না হইলেই অদৃষ্টলিপি মুছিয়া ফেলিবার কাজ হয়। সুখে যাহার আকাঙ্ক্ষা নাই, দুঃখেও যে কাতর হয় না—তাহার অদৃষ্ট কি করিবে? আপনি বিধবা—ব্রহ্মচারিণী, আপনার সুখ দুঃখ কি?

সুখ দুঃখ মনের ধর্ম্মমাত্র। মরিলেই যখন সকল ফুরায়, তখন সুখে আনন্দিত ও দুঃখে কষ্ট হইবে কেন?

র। আমার একটি অনুরোধ।

অ। কি?

র। আপনি এই হতভাগিনীকে 'আপনি' বলিয়া কথা কহি-বেন না। আমি আপনার শিষ্যা—আশ্রিতা—কন্যা। আমাকে তুই বলিলেই ভাল হয়. নিতান্ত না হয় 'তুমি' বলিবেন।

অ। তাহাই হইবে। দেখ, মানুষের কার্য্যক্ষেত্র অসীম—মানুষ কাজ লইয়াই থাকে। বাহিরের কাজে ক্ষান্ত থাকিলেও মনে কাজ থাকে। সংকল্পও কাজ। সেই কাজই আবার অদৃষ্টের গঠন করে। অতএব, মানুষের কর্ত্তব্য যে, নূতন অদৃষ্ট যাহাতে গঠিত না হয়, তাহা করা।

র। কাজ করিলেই যখন অদৃষ্ট গঠিত হয়, কাজ করিলেই যখন অদৃষ্ট সংগ্রহ হয়—তখন অদৃষ্ট নিবারণের উপায় কি?

অ। ঠিক কর্ম্মে অদৃষ্ট হয় না,—কর্ম্মের সংস্কারে হয়।

র। কর্ম্মের সংস্কার কি?

অ। কর্ম্মের আসক্তি আছে, তাহা জান?

র। জানি। আসক্তি না থাকিলে কর্ম্ম করে কেন?

অ। কর্ম্মের সেই আসক্তি বুদ্ধিবৃত্তিতে ছাপা রাখে,—মরণান্তে ইহাই সংস্কার হয়। সংস্কার ও অদৃষ্ট একই কথা।

র। তবে আসক্তিশূন্য হইয়া কর্ম্ম করাই অদৃষ্ট না জন্মিবার কারণ?

অ। হাঁ।

র। আমি সব ভুলিতে পারি—স্বামি প্রেমের আসক্তি আমার যাইবে না।

অ। না যাউক,—স্বামি-প্রেম রমণীর উন্নতি-সাধক। স্বামী রমণীর সাক্ষাৎ ঈশ্বর। ঈশ্বরে চিত্তবৃত্তি একমুখী করিয়া, কামনা শূন্য হইয়া কাজ করিলেই অদৃষ্ট বারণ হয়। মনে রাখিতে হইবে—এ জগৎ ঈশ্বরের, ঈশ্বরের কাজ—ঈশ্বর যাহা করাইবেন, তাহাই করিতে হইবে। নিজের কৃতিত্ব কিছু নাই। রমণীও তাই ভাবিবে—স্বামী তাহার প্রভু, স্বামী তাহার ঈশ্বর—স্বামী স্বর্গ, স্বামী মোক্ষ। স্বামীর জন্য কাজ কর—তাহার নিজের কাজ কিছুই নাই।

এই সময় রমণী বলিল,—"ঐ দিকে কিসের গোলযোগ হইতেছে। বোধ হয়, মানুষ আছে।"

অজিতনাথ স্থির কর্ণে সে শব্দ লক্ষ্য করিলেন এবং ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিয়া বলিলেন,—"আমি ভুলিয়া যাইতেছিলাম, ঐ স্থানে আমাদের সৈন্যগণ আছে।"

র। এখন রাত্রি কত ?

অ। ভোর হইতে আর অধিক বিলম্ব নাই—শীতল বাতাস বহিতেছে। দুই একটি পাখীও ডাকিতে আরম্ভ করিয়াছে।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

--০--

অজিতনাথ রমণীকে সঙ্গে লইয়া বামপার্শ্বের জঙ্গলাভিমুখে চলিয়া গেলেন। আরও কিয়দ্দূর গিয়া অজিতনাথ একটা সঙ্কেত

করিলেন। তখন বনের মধ্য হইতে একজন বাহির হইয়া আসিয়া অজিতনাথের সম্মুখীন হইল। তখন ভোর হইয়া গিয়াছে ;—তবে সূর্য্যালোক প্রকাশ হয় নাই। অজিতনাথ বলিলেন,—"সৈন্যগণ কোথায় ?"

যে অজিতনাথের সম্মুখীন হইয়াছিল, সে সৈন্যাধ্যক্ষ। সৈন্যাধ্যক্ষ বলিলেন—"এই একটুখানি আগে সৈন্যগণকে চলিয়া যাইতে আদেশ করিয়াছি,—তাহারা চলিয়া গেল।"

অ। কোথায় গেল ?

সৈ। বাড়ী গেল। এখানে থাকিলে বিপদের সম্ভাবনা। মহারাষ্ট্রগণ শিবিরে ফিরিয়া আসিয়া আমাদের সন্ধান করিবে।

অ। ভাল করিয়াছেন। আপনি যান নাই কেন ?

সৈ। আপনার অপেক্ষায় আছি। দুইটা ঘোড়াও রাখিয়াছি।

অ। আমি ঘোড়ায় যাইতে পারিব না। ইনি ঘোড়ায় চড়িবেন না।

সৈ। তবে কি প্রকারে যাইবেন ?

অ। নিকটস্থ কোন গ্রামে গিয়া পাল্কী করিয়া ইঁহাকে ইহার বাড়ী পাঠাইয়া দিব। তৎপরে আমি সময়মতে তোমাদের ওখানে যাইব।

সৈ। আপনার নিকটে টাকা কড়ি আছে ?

অ। না।

তখন সৈন্যাধ্যক্ষ অজিতনাথের হস্তে দুইটি সুবর্ণ মুদ্রা পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন,—"আপনি এখন কি করিবেন ?"

অ। আমি চলিয়া যাই—আপনিও যান।

তখন তাহাই হইল। সৈন্যাধ্যক্ষ বনের মাধ্য প্রবেশ করিয়া অশ্ব লইয়া আসিয়া তাহাতে আরোহণ করিয়া চলিয়া গেল। অজিতনাথ রমণীকে সঙ্গে লইয়া চলিতে লাগিলেন।

বেলা প্রায় চারিদণ্ডের সময় তাঁহারা এক পল্লীগ্রামে উপস্থিত হইলেন।

গ্রামখানি ক্ষুদ্র—কয়েক ঘর লোকের বসতি আছে মাত্র। তাহার প্রায় সমস্তই কৃষিজীবী। সন্ন্যাসীবেশী অজিতনাথের সঙ্গে একটি সুন্দরী রমণীকে দেখিয়া কতকগুলি কৃষক আসিয়া যুটিয়া দাঁড়াইল। কেহ তাঁহাদিগকে প্রণাম করিল, কেহ আশ্রমের কথা জিজ্ঞাসা করিল, কেহ কেহ বা চরিত্র-বিষয়েও সন্দেহ করিল।

অজিতনাথ বলিলেন,—"এগ্রামে পাল্কী পাওয়া যায়?"

একজন কৃষক বলিল,—"তা পাওয়া যায়। এগাঁয় আট দশ ঘর বেহারার বাস আছে।"

বেহারা-পাড়া কোন্ দিকে জানিতে চাহিলে, তন্মধ্য হইতে একজন তাহাদিগের পথ-প্রদর্শক হইল।

বেহারারা ন্যায়াতিরিক্ত পারিশ্রমিক প্রাপ্তির আশা পাইয়া পাল্কী লইয়া যাইতে স্বীকৃত হইল। প্রথমে একখানি পাল্কী স্থির করা হইয়াছিল—কিন্তু রমণী বলিল,—"আপনি আমার সঙ্গে না গেলে আমি বাড়ী যাইব না।"

পাল্কীর সঙ্গে হাঁটিয়া যাওয়া অসম্ভব বিবেচনায় আর একখানি শিবিকা স্থির করা হইল। তৎপরে দুইজনে দুইখানি শিবিকায় আরোহণ করিয়া যাত্রা করিলেন।

তারপরে দুই দিন পথে থাকিয়া তাঁহারা রমণীর যে গ্রামে শ্বশুরবাড়ী সেই গ্রামে উপস্থিত হইলেন। তখন প্রায় সন্ধ্যা হইয়া

আসিয়াছিল—সূর্য্যদেব পশ্চিম গগন-প্রান্তশায়ী হইয়াছিলেন। পল্লী-কৃষকগণ মাঠ হইতে ফিরিতেছিল এবং রাখালেরা গরু তাড়াইয়া সমস্ত দিনের পরে মাতৃ-অঞ্চলে শান্তির জন্য ছুটিতেছিল। রমণীর নির্দ্দেশমতে শিবিকা তাহাদের বাড়ীর দ্বারে গিয়া উপস্থিত হইল। উভয়ে শিবিকা হইতে অবতরণ করিলেন।

বাড়ী লোক-শূন্য—হা হা করিতেছিল। কেহ সন্ধ্যার প্রদীপ জ্বালিবার উদ্‌যোগ করিতেছিল না. কেহ তুলসী মঞ্চে ধূপ জ্বালিবার আয়োজন করিতেছিল না। রমণীর চক্ষু পূরিয়া জল আসিল। সে আঁচলে চক্ষুর জল মুছিয়া তাহাদের বাড়ীর পার্শ্বেই রায়বাড়ী গমন করিল। অজিতনাথ একখানা জনশূন্য গৃহের বারান্দায় বসিয়া রহিলেন।

রমণী সেখানে যাইবামাত্র রায়বৌ আশ্চর্য্যান্বিত হইল। সে আনন্দের হাসি হাসিয়া বলিল,—"তুমি এসেছ? আহা! তোমার শাশুড়ী তোমার জন্য কেঁদে কেঁদে বাড়ী ছেড়ে চ'লে গেল। এক দিকে তার পুত্রশোক—অপর দিকে তোমার শোক—বুড় বয়সে তাঁর বড় কষ্ট!"

রমণী কাঁদিতে কাঁদিতে জিজ্ঞাসা করিল,—"তিনি এখন কোথায় আছেন?"

রা। তিনি বিষয়-আশয় বিক্রয় করিয়া বৃন্দাবনে চলিয়া গিয়াছেন।

র। বাড়ীখানি?

রা। উহাও বিক্রয় করিয়াছেন।

র। আমার অপেক্ষা করিলেন না?

রা। সেকথা আমরা বলিয়াছিলাম।

র। কি উত্তর করিয়াছিলেন?

রা। তিনি বলিয়াছিলেন—ছেলের সঙ্গে সঙ্গে বৌও গিয়াছে। সে আর আসিবে না। আসিলেও তাহার মুখ আর দেখিব না। ম্লেচ্ছ-স্পর্শ ফুলদ্বারা দেবতার পূজা হয় না।

রমণী সে কথার কোন উত্তর না করিয়া গম্ভীরভাবে কি চিন্তা করিতে লাগিল। রায়বৌ পুনরপি বলিলেন,—"তুমি একা কোথা হইতে আসিলে?"

রমণী গলা ঝাড়িয়া ঘামিয়া মুখ লাল করিয়া বলিল,—"আমি একা আসি নাই।"

রা। সঙ্গে কে আছে?

র। আমার গুরুদেব।

রা। দুর পোড়ারমুখী;—মুসলমানসৈন্যের মধ্যে আবার গুরু কোথায় পেলি?

র। তিনিই আমায় উদ্ধার করিয়াছেন—তিনি সন্ন্যাসী, তিনি দেবতা, তিনি আমার গুরু।

রা। এর মধ্যে গুরু কাড়িয়া সেবাদাসী হয়েছিস্?

কথাটা রমণীর বক্ষে শেলসম বিদ্ধ হইল। সে কথার উত্তরে কি বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু বলা হইল না। অভিমান ও ঘৃণায় কষ্ট বোধ হইল।

রায়বৌ তাহার মুখের অবস্থা দেখিয়া অপ্রতিভ হইল। বুঝিতে পারিল, কথাটা বলা ভাল হয় নাই। এমন রহস্য-প্রসঙ্গ তাহাদের পূর্ব্বে কত হইত কিন্তু সুসময়ে যাহা রহস্য, অসময়ে তাহা তীব্র জ্বালা,—রায়বৌ সেকথা বুঝিতে পারিল। সে বলিল,—

"বসন্ত, তোমাকে আমি ছোট ভগিনীর মত দেখি; যাহা বলিয়াছি, তাহা রহস্য করিয়াই বলিয়াছি, তুমি রাগ করিও না।"

রমণীর নাম বসন্তরাণী। বসন্তের চোখ পূরিয়া তখন জল আসিয়াছিল। আঁচলে চক্ষুর জল মুছিয়া বলিল,—"দিদি, তুমি অবশ্যই কথাটা রহস্য করিয়া বলিয়াছ কিন্তু অপর লোকে হয়ত বিদ্রূপ করিয়াই বলিবে। যখন মানুষের কপাল পুড়িয়া যায়, তখন পুণ্য কার্য্যও লোকের চক্ষুতে পাপ বলিয়া জ্ঞান হয়। দাশুর বাপ কোথায়?"

দাশুর বাপ অর্থে রায়বৌর স্বামী। রায়বৌ বলিলেন,—"জানত পাশাখেলার ভারি বাই; এইমাত্র মুখুয্যেঠাকুর ডেকে নিয়ে গেলেন।"

র। আমাদের বাড়ীখানি কে কিনিয়াছেন?

রা। ও-পাড়ার শশিমণ্ডল।

তখন বসন্তরাণী ফিরিয়া চলিয়া গেল। যাইবার সময় রায়বৌ বলিয়া দিলেন,—"তোমাদের বাড়ীতে থাকিবার স্থান নাই, খাওয়া দাওয়ারও যোগাড় নাই—অতএব তুমি আর তোমার গুরুদেব আমাদের বাড়ীতে আসিও।"

বসন্তরাণী অজিতনাথের নিকট আসিয়া সমস্ত কথা নিবেদন করিল। অজিতনাথ শুনিয়া বলিলেন,—"ভগবান্ যেমন করাইবেন, তেমনই হইবে। দেখা যাউক, যদি তোমার বাড়ীখানি ফিরাইয়া দেয়।"

সে দিবস তাঁহারা রায়-বাড়ীতেই অবস্থান করিলেন। তৎপর দিবস রায় মহাশয়কে সঙ্গে লইয়া অজিতনাথ শশিমণ্ডলের বাড়ী গমন করিলেন এবং বাড়ীখানি মূল্য ফেরৎ লইয়া ফিরাইয়া দিবার

জন্য অনুরোধ করিলেন কিন্তু শশিমণ্ডল বলিল,—"বাড়ীখানি সে খরিদ করিয়াই তাহার জামাতাকে দান করিয়াছে, সুতরাং ফিরাইয়া দিবার আর উপায় নাই।"

সেস্থান হইতে ফিরিয়া আসিয়া রায়মহাশয়ের সঙ্গে অজিতনাথ পরামর্শ করিলেন,—"ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দুইখানি ঘর বাঁধিয়া দিয়া বসন্তরাণীকে বাড়ী করিয়া দেওয়া যাউক। বিধবা স্ত্রীলোকের অতবড় বাড়ী নাই হইল।"

কিন্তু তাহাতেও এক গোলযোগ ঘটিল। তিন চারি দিন সে স্থানে অবস্থান করিতেই গ্রামের মধ্যে কথা উঠিয়া পড়িল। কেহ বসন্তরাণীর স্পৃষ্ট জলটুকু পর্য্যন্ত খাইবে না,—কেন না, একে ত তাহাকে মুসলমানে ধরিয়া লইয়া গিয়াছিল, আবার এক অপরিচিত নিঃসম্পর্কীয় যুবকের সহিত ঘুরিতেছে।

বসন্তরাণী সে সকল কথা শুনিতে পাইল। অজিতনাথকে তাহা জানাইয়া বলিল,—"হয় আমাকে মরিতে আদেশ করুন, নয় সঙ্গে লউন। এ গ্রামে আমি থাকিব না।" অজিতনাথ বসন্তরাণীকে সঙ্গে লইয়া তৎপর দিবস প্রভাতে সে গ্রাম ত্যাগ করিলেন।

বিংশ পরিচ্ছেদ।

মহারাষ্ট্র-সেনাপতি সদলবলে লুণ্ঠন কার্য্য সম্পন্ন করিয়া আসিবার সময়ে পথেই সংবাদ প্রাপ্ত হইলেন যে, তাঁহাদের শিবির ছিন্ন ভিন্ন ও পর্য্যুদস্ত হইয়া গিয়াছে। যে সকল সৈন্য শিবির

রক্ষার্থে ছিল, তাহারা কতক হত, কতক আহত ও কতক পলায়িত হইয়াছে।

সুপ্ত সিংহের মস্তকে লোষ্ট্র নিক্ষিপ্ত হইলে সে যেমন গর্জ্জন করিয়া উঠে, মহারাষ্ট্র-সর্দ্দারও তদ্রূপ গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন। মহারাষ্ট্র নামে তখন সমস্ত বঙ্গ মূর্চ্ছিত হইত,—মহারাষ্ট্রীয় অত্যাচারে তখন বঙ্গের নর-নারী থর থর কম্পিত হইত,—বঙ্গের নবাব, ভারতের বাদসাহ সকলেই তখন মহারাষ্ট্রীয় বাহুবলে বিকম্পিত ছিলেন। সেই মহারাষ্ট্রীয় অনীকিনীর এতদূর লাঞ্ছনা ও অপমান ইতঃপূর্ব্বে কোথাও সংঘটিত হয় নাই।

মহারাষ্ট্র-সর্দ্দার অত্যাচারের বীরবাহু আন্দোলন করিয়া সংবাদ-দাতাকে নিকটে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"এরূপ কে করিয়াছে বলিয়া অনুমান কর? কাহার বংশ সমূলে নির্ম্মূল করিয়া রক্ত পানের জন্য মহারাষ্ট্রীয় তরবারির পিপাসা হইয়াছে?"

স। আমরা আ'জ তিন দিন পর্য্যন্ত এই ঘটনার অনুসন্ধান করিয়া ফিরিতেছি। তাহাতে যে তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাই সত্য ঘটনা বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারি।

সেনাপতি গম্ভীর স্বরে বলিলেন,—"যাহা তোমাদের অনুসন্ধানে সত্য বলিয়া স্থির হইয়াছে, তাহা আমার নিকট বল?"

স। ফৌজদার সাহেবের পুত্রকে আমাদের আড্ডায় আবদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছিল, এবং তাহার মুক্তির বিনিময়ে ফৌজদার সাহেবের নিকটে টাকা চাওয়া হইয়াছিল,—ইহা বোধ হয় আপনার স্মরণ আছে?

সে। খুব স্মরণ আছে। তারপরের ঘটনা বল?

স। সেই যে ব্রহ্মচারী আমাদের আড্ডায় আসিয়াছিল,—সে ভণ্ড। সে ফৌজদার সাহেবের লোক। ফৌজদার সাহেব তাহাকে ছদ্মবেশে আমাদের আড্ডায় পাঠাইয়া দেয়।

সে। সে সন্দেহ আমি তখনই করিয়াছিলাম,—সেই জন্যই তাহাকে বন্দী করিয়া রাখিতে আদেশ দেই।

স। হাঁ, আপনার আদেশ মতে তাহাকে বন্দী করিয়া রাখা হইয়াছিল, কিন্তু সে কৌশলক্রমে পলায়ন করে।

সে। তারপরে?

স। তারপরে সেই ব্যক্তিই প্রচুরতম সৈন্য লইয়া আসিয়া আপনাদের অনুপস্থিতিতে শিবির আক্রমণ করে,—আমাদের সৈন্যসংখ্যা নিতান্ত অল্প ছিল, কাজেই বিপক্ষপক্ষ জয় লাভ করে, এবং ফৌজদারের ছেলেকে ও স্ত্রীলোকটিকে লইয়া পলায়ন করে। বলিতে কি, বাঙ্গালা দেশে আসিয়া আমরা এমন অবমানিত ও ক্ষতিগ্রস্ত আর কখনও হই নাই।

সে। তোমরা কি অনুমান কর, ফৌজদার সাহেবের সৈন্য নিকটেই কোন স্থানে লুক্কায়িত ভাবে ছিল?

স। হাঁ। ঐ ভিক্ষুকবেশী লোকটা সৈন্যগণকে নিকটেই কোথায় লুকাইয়া রাখিয়া আসিয়া সুযোগ অন্বেষণ করিতেছিল।

সে। আমাদের পক্ষে কত জন নিহত হইয়াছে?

স। নিহতের সংখ্যা অধিক নহে, বোধ হয় দুইজন।

সে। আর সকলে কোথায় গেল?

স। আহত হইয়াছিল কয়েকজনে—তাহাদিগকে একটা জঙ্গলে লুকাইয়া রাখা হইয়াছিল।

সে। এখন তাহারা কেমন আছে?

স। অপেক্ষাকৃত ভাল আছে।

সে। অবশিষ্ট সকলে কোথায় আছে?

স। সেই জঙ্গলেই একত্রিত হইয়াছে।

সে। সকলকে সংবাদ দাও—সত্বর আসিয়া এই স্থলে একত্রিত হউক। আর দক্ষিণ বঙ্গের খড়্গাপুরের ঐ দিকে একদল মহারাষ্ট্রীয় আছে, পূর্ব্ববঙ্গেও একদল আছে, এবং একদল ঢাকার ঐ দিকে আছে—অদ্যই তাহাদিগের নিকট আমাদিগের অবমান ও লাঞ্ছনার কথা জানাইয়া সংবাদ দাও। আর এক কাজ করিতে হইবে।

স। সে কাজ কি?

সে। ফৌজদার সাহেবের নিকট তুমি নিজে যাও।

স। গিয়া কি করিতে হইবে?

সে। যাহা করিতে হইবে, তাহা তোমাকে বলিয়া দিব। আমার প্রতিরক্তবিন্দু উত্তেজিত হইয়াছে। ফৌজদার নবাবের সন্ধি-পত্রের সর্ত্ত-ভঙ্গ করিয়াছে,—আমাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিয়াছে, ইহার প্রতিশোধ লইতে হইবে। বঙ্গবাসীর রক্তে বঙ্গদেশ প্লাবিত করিতে হইবে। আর নয় বাঙ্গালীর অর্থে—ফৌজদার সাহেবের সর্ব্বস্বে পেটিকা পূর্ণ করিয়া দেশে যাইতে হইবে।

স। এখন আমাদের আড্ডা কোথায় সংস্থাপিত হইবে?

সে। এ স্থান মন্দ নয়। চারিদিকে নদীবেষ্টিত—এবং সম্মুখে প্রকাণ্ড বন।

স। তবে কি এই স্থানেই শিবির সন্নিবেশ করা যাইবে?

সে। হাঁ, তাহাই হউক।

সে আজ্ঞা প্রচার করা হইল।

আজ্ঞামতে সেই নদীবেষ্টিত জনশূন্য ভূখণ্ডে মহারাষ্ট্রীয় শিবির নির্ম্মাণ হইতে লাগিল। চারিদিকে অশ্ব, অশ্বতর, হস্তী প্রভৃতি পশুগণ চরিয়া বেড়াইতে লাগিল। বিজয়ী বীরগণ আপন আপন আবাস নির্ম্মাণ করিয়া লইতে লাগিল।

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

রাত্রি এক প্রহর অতীত হইয়া গিয়াছে—আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, টিপ্ টিপ্ করিয়া বৃষ্টি হইতেছিল। চারিদিকে বিশ্বগ্রাসী অন্ধকার। কাঞ্চন নগরের কৃষ্ণগোবিন্দবাবুর সুবিস্তৃত ও প্রকাণ্ড অট্টালিকার অদূরস্থ ঝাউগাছগুলা সেই অন্ধকারে দাঁড়াইয়া শোঁ শোঁ রব করিয়া প্রেত-জীবনের আর্ত্তস্বরের অনুকরণ করিতেছিল।

সর্ব্বত্র অন্ধকার কিন্তু কৃষ্ণগোবিন্দবাবুর বাড়ীর প্রকোষ্ঠে প্রকোষ্ঠে তখন আলো জ্বলিতেছিল। সর্ব্বত্র যথারীতি কাজকর্ম্ম সম্পাদিত হইতেছিল।

যে প্রকোষ্ঠে কৃষ্ণগোবিন্দবাবু নিজে বসিয়া কাছারি করিতেন, তথায় স্ফটিকাধারে অনেকগুলি আলো জ্বলিতেছিল। সেই আলোকমালাতলে সুরম্য চৌকীর উপরে স্থূল অথচ মসৃণ শয্যা আস্তৃত। চারিদিকে মখমল-মণ্ডিত সুগন্ধি ম্রক্ষিত তাকিয়া—সম্মুখে রৌপ্য ফর্শি। ইহাই বাবুর নিজের বসিবার স্থান। দক্ষিণে আর একখানি সুরম্য আসন—তাহাতেও উত্তম শয্যা—তাহাই ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের বসিবার জন্য নির্দ্দিষ্ট। বামদিকে উৎকৃষ্ট

এবং বৃহৎ চৌকীতে দুগ্ধফেননিভ শয্যা আবৃত—ভদ্রবৃন্দ সেই স্থানে উপবেশন করিয়া থাকেন। সম্মুখে সাধারণ ধরণের বহুদূর বিস্তৃত আসন—সাধারণ প্রজাগণ সেখানে উপবেশন করিয়া থাকে।

সে দিন সন্ধ্যার পূর্ব্ব হইতে বৃষ্টি আরম্ভ হইয়াছে বলিয়া অধিক লোক কাছারিতে আসিতে পারে নাই। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের আসনশূন্য। অপর দুইখানি আসনে কয়েকজন লোক উপবেশন করিয়াছিল মাত্র।

মধ্যস্থলের আসনে কৃষ্ণগোবিন্দবাবু উপবেশন করিয়া তখন কি একখানা দলিল পাঠ করিতেছিলেন.—এমন সময়ে একজন লোক আসিয়া যথাবিধি অভিবাদন করিয়া দাঁড়াইল।

কৃষ্ণগোবিন্দবাবু তাহার দিকে চাহিলেন। সে সামরিক বিভাগের লোক—তাহাকে দেখিয়াই হাতের দলিল শয্যার উপরে রাখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"খবর কি? তুমি পাদপীঠে গিয়াছিলে না?"

সে পুনরায় অভিবাদন করিয়া বলিল,—"আজ্ঞা হাঁ।"

কৃ। সংবাদ কি?

আ। সংবাদ ভাল। ফৌজদারসাহেবের পুত্রকে পাওয়া গিয়াছে।

কৃ। পাওয়া গিয়াছে কি বলিতেছ? সংবাদ পাওয়া গিয়াছে, বল।

আ। আজ্ঞা না—তাঁহাকেই পাওয়া গিয়াছে। মহারাষ্ট্র-শিবির হইতে আমরা তাঁহাকে উদ্ধার করিয়া লইয়া আসিয়াছি।

কৃ। তিনি এখন কোথায়?

আ। সেনাপতি তাঁহাকে এবং অন্যান্য সৈন্যগণকে লইয়া দুর্গমধ্যে গমন করিয়াছেন এবং আদেশ গ্রহণের জন্য অধীনকে আপনার নিকট পাঠাইয়াছেন।

কৃ। আমি শুনিয়া অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইতেছি যে, মহা-রাষ্ট্র-কবল হইতে কি প্রকারে তোমরা ফৌজদারসাহেবের পুত্রকে উদ্ধার করিতে পারিলে?

আ। এ সম্বন্ধে আমাদের কৃতিত্ব বড় অধিক নাই। ব্রহ্ম-চারী ঠাকুরের কৌশলেই একার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে।

কৃ। যতদূর সংক্ষেপে বলা যাইতে পারে, ঘটনাটা আমায় বল।

তখন আগন্তুক অতি সংক্ষেপে সমস্ত কথা কৃষ্ণগোবিন্দবাবুর নিকটে বলিল। শুনিয়া কৃষ্ণগোবিন্দবাবু চমকিয়া উঠিলেন। তিনি বলিলেন—"কাজ অতি গুরুতর হইয়াছে। সিংহের মুখের গ্রাস তাহার অনুপস্থিতিতে অপহরণ করা হইয়াছে। যাহা হউক, ভাগ্যে যাহা আছে তাহাই ঘটিবে, এক্ষণে ফৌজদারসাহেবের পুত্রকে এখানে লইয়া আইস।"

আগন্তুক চলিয়া গেল। কৃষ্ণগোবিন্দবাবু রৌপ্য ফর্শির হৈম-নল মুখে দিয়া সুগন্ধ-তামাকুর ধূমপান করিতে করিতে তাকিয়ায় ঠেস দিয়া মুদিত নয়নে কি চিন্তা করিতে লাগিলেন।

অনতিবিলম্বে আগন্তুক ফৌজদারসাহেবের পুত্রকে সঙ্গে লইয়া তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল,—কৃষ্ণগোবিন্দবাবু তখনও মুদিত নয়নে চিন্তা করিতেছিলেন। আগন্তুক ডাকিয়া বলিল,—"প্রভু ফৌজদারসাহেবের পুত্র আসিয়াছেন।"

কৃষ্ণগোবিন্দবাবু চকিতে চক্ষু মেলিয়া চাহিলেন, এবং হাতের

নল ফেলিয়া বালিশের উপর হইতে উঠিয়া বসিলেন এবং সসম্মানে অভ্যর্থনা করিয়া বসিবার জন্য আসন নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন।

ফৌজদারসাহেবের পুত্রও যথোচিত প্রত্যভিবাদন করিয়া আসন গ্রহণ করিলেন।

কৃষ্ণগোবিন্দবাবু সস্মিতমুখে বলিলেন—"আমার সৈন্যগণ যথেষ্ট কাজ করিয়াছে। আমি তাহাদের উপরে যথেষ্ট আনন্দিত হইয়াছি—তাহারা যে আপনাকে উদ্ধার করিয়া আনিতে পারিয়াছে, ইহাতে আমি অত্যন্ত সুখী হইয়াছি।"

ফৌজদারসাহেবের পুত্র বলিলেন,—"আমাকে উদ্ধার করিয়াছেন বলিয়া আমি আপনাকে শত শত ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। আপনার একজন সৈনিক—জানি না, তিনি আপনার সৈনিক-বিভাগে কোন্ পদে কার্য্য করিয়া থাকেন,—তিনি ব্রহ্মচারীর ছদ্মবেশে গিয়াছিলেন,—তাঁহার বুদ্ধি-কৌশল—তাঁহার অসীম সাহস—অদম্য উৎসাহ বাস্তবিকই অনন্যসাধারণ। তাঁহারই জন্য মহারাষ্ট্রগণ বিধ্বস্ত ও আমার উদ্ধার সাধন হইয়াছে।"

কৃষ্ণগোবিন্দবাবু বলিলেন,—"তিনি ছদ্মবেশী নহেন, বাস্তবিকই ব্রহ্মচারী। তিনি আমার সৈন্যমধ্যে কার্য্য করেন না—তিনি কোথাও চাকুরী করেন না। তিনি স্বাধীন—স্বাধীনভাবে কার্য্য করিয়া থাকেন। কিন্তু এখন এক কথা—"

ফৌজদারসাহেবের পুত্র বলিলেন,—"কি কথা?"

কৃষ্ণগোবিন্দবাবু কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন,—"এখন যে কথা তাহা অতি ভয়ানক। মহারাষ্ট্র-বীরগণ শিবিরে উপস্থিত ছিল না বলিয়াই আমার সৈন্যগণ আপনাকে উদ্ধার করিতে সক্ষম হইয়াছে। কিন্তু সেই অজেয় বীরগণ যখন ফিরিয়া আসিয়া

এই সংবাদ প্রাপ্ত হইবে, তখন তাহারা সুপ্তসিংহের ন্যায় গর্জ্জিয়া উঠিবে। তাঁহাদের ক্রোধবহ্নিতে দিগন্ত কাঁপিয়া উঠিবে,—আর আমরা ক্ষুদ্র পতঙ্গ সে বহ্নিতে সবংশে বিদগ্ধ হইয়া যাইব।”

ফৌ-পু। আমাকে অদ্যই বাড়ী পাঠাইয়া দিবার বন্দোবস্ত করুন। বাবাকে বলিয়া মহারাষ্ট্র-সৈন্যের বিরুদ্ধে ফৌজ প্রস্তুত করিব—আপনিও আপনার সৈন্য-সামন্ত প্রস্তুত করুন। উভয় শক্তি এক হইয়া তাহাদের শক্তির গতিরোধ করিব।

কৃ। আপনি বোধ হয় মহারাষ্ট্র-শক্তির বিষয় অবগত নহেন,—তাই ঐ কথা বলিতেছেন। বঙ্গের চারিদিকে মহারাষ্ট্র-সৈন্য ছাইয়া আছে—এক দল অবমানিত বা লাঞ্ছিত হইলে সকল দল একত্রিত হইতে পারে। তখন আমাদের ক্ষুদ্র-শক্তি সামান্য কথা—নবাবশক্তি, এমন কি বাদশাহের শক্তিও সেখানে পরাভূত হইবে।

ফৌ-পু। তবে আপনি কি করিতে চাহেন?

কৃ। কি করিব তাহা স্থির করিতে পারি নাই। বোধ হয় জ্বলন্ত আগুনের মুখে পতঙ্গবৃত্তি অবলম্বন করিতে হইবে।

ফৌ-পু। আপনার যদি এত ভয়, তবে আমাকে উদ্ধার করিতে সৈন্য প্রেরণ করিলেন কেন?

কৃ। কেবল আমার ভয় নয়, আপনার পিতাও একথা শুনিলে চিন্তিত হইবেন।

ফৌ-পু। আপনি আমাকে অদ্যই আমাদের বাড়ী পাঠাই-বার বন্দোবস্ত করুন,—তাহার পরে বাবার সহিত পরামর্শ করিয়া যেরূপ বন্দোবস্ত করিতে পারি, তাহা আপনাকে জানাইব।

কৃষ্ণগোবিন্দবাবু ফৌজদার-পুত্রের জন্য আহারাদির যথোচিত

বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন, এবং সেই দিবসই তাঁহাকে বাড়ী পাঠাইবার জন্য যানবাহকের বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। রাত্রি যখন অবসানযামে পদার্পণ করিল,—ফৌজদারপুত্র তখন কাঞ্চননগর হইতে শিবিকারোহণে যাত্রা করিলেন।

পরদিন সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে ফৌজদারপুত্র বাড়ী গিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার আগমনে সকলেই প্রসন্ন হইল, কিন্তু স্বয়ং ফৌজদারসাহেবের চিত্তের প্রসন্নতা ফিরিয়া আসিল না। যদিও তিনি হারাপুত্র প্রাপ্ত হইলেন, তথাপি তৎপূর্ব্বে মহারাষ্ট্রদূত আসিয়া তাঁহাকে যাহা বলিয়াছে, তাহাতে তিনি অত্যন্ত বিষণ্ণ হইয়া পড়িয়াছেন।

সন্ধ্যার পরে মহারাষ্ট্রদূতের কথার শেষ উত্তর দিবার সময় অবধারিত হইয়াছিল। ফৌজদারপুত্র সে কথা শুনিলেন।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইলে ফৌজদারসাহেবের দরবার-গৃহে প্রোজ্জ্বল আলোকমালা জ্বলিয়া উঠিল। স্তম্ভে স্তম্ভে বাদশাহী পাঞ্জা-অঙ্কিত লোহিত পতাকা দুলিতে লাগিল, এবং সুগন্ধি দ্রব্যের গন্ধে সমস্তগৃহ আমোদিত হইল।

ফৌজদারসাহেব আসিয়া দরবার-আসনে উপবেশন করিলে অন্যান্য কর্ম্মচারিগণও তথায় আসিয়া আপন আপন কার্য্যে নিযুক্ত হইল। মহারাষ্ট্রদূতও সেখানে একখানি সুদৃশ্য ও সম্মানের আসনে উপবেশন করিলেন। মহারাষ্ট্রদূতের সহিত কি কথোপকথন হয়, জানিবার জন্য ফৌজদারপুত্রও তথায় আসিয়া যথাস্থানে উপবেশন করিলেন।

ফৌজদারসাহেব অতি বিনীত স্বরে মহারাষ্ট্র দূতকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"মহাশয়, বর্ত্তমান কার্য্যে আমার কোন

অপরাধ নাই। অতএব আপনাদের সর্দ্দারকে আমার উপরে বৃথা রাগ করিতে নিষেধ করিবেন।"

গম্ভীরস্বরে মহারাষ্ট্র-দূত বলিল,—"আপনার অপরাধ নাই, আপনি এ কথা বলিলে তিনি শুনিবেন কেন? নবাবের সহিত যে সন্ধি হয়, আপনি তাহা প্রথমে ভঙ্গ করিয়াছেন। নবাবের সহিত যে সন্ধি হইয়াছে, আপনি কি তাহা অবগত নহেন?"

ফৌ। হাঁ, আমি তাহা জানি।

ম। কি বলুন দেখি?

ফৌ। কোন মহারাষ্ট্রপুরুষের বিরুদ্ধে আমরা অস্ত্রোত্তোলন করিব না।

ম। তবে আপনি এ কি করিয়াছেন? মহারাষ্ট্র-শিবিরে পড়িয়া তাহাদিগকে লাঞ্ছিত, অবমানিত ও নিহত করিয়া আপন পুত্রকে উদ্ধার করিয়াছেন। কিন্তু ইহার পরিণাম ভাবেন নাই,—আপনি যখন সন্ধি ভঙ্গ করিয়াছেন, তখন আমাদের সর্দ্দারও তরবারি দ্বারা সন্ধি ভঙ্গের ফল আপনাকে দেখাইবেন, এবং আপনার এই কৃত কর্ম্মের ফল নবাব পর্য্যন্ত ভোগ করিবেন।

ফৌ। আমি সন্ধি-সর্ত্ত ভঙ্গ করি নাই; আমার সৈন্য মহারাষ্ট্র-শিবিরে যায় নাই।

ম। যে সকল সৈন্য গিয়াছিল, তাহারা কি আপনার সৈন্য নহে?

ফৌ। না।

ম। তবে কাহার সৈন্য?

ফৌ। কাঞ্চন নগরের কৃষ্ণগোবিন্দবাবুর।

ম। হাঁ, কৃষ্ণগোবিন্দের নাম শুনিয়াছি বটে। ভাল, ব্রহ্মচারী বেশে একটি লোক আমাদের আড্ডায় গিয়াছিল, সে কে?

ফৌ। আমি সে বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। কৃষ্ণগোবিন্দের সৈন্য যে আপনাদের শিবিরে যাইবে তাহাও আমি জানি না—ইহা খোদার কসম করিয়া বলিতে পারি।

ম। কিন্তু এদেশ আপনার শাসনাধীন। কৃষ্ণগোবিন্দই বলুন,—আর যাহার কথাই বলুন, সকলেই আপনার অধীন।

ফৌ। সে কথা বলিতে পারেন।

ম। আমাদের সর্দ্দারের সহিত যদি আপনি মিট-মাট করিতে চাহেন, তবে তিনি যাহা বলিয়াছেন, শুনুন—

ফৌ। হাঁ, বলুন।

ম। তাঁহার শিবির ছিন্ন ভিন্ন ও সৈন্য হত ও আহত করার জন্য আপনি পঞ্চাশ হাজার আসরফি দিবেন। আপনার পুত্রের মুক্তির জন্য পূর্ব্বে যে দশহাজার আসরফি চাওয়া হইয়াছিল, তাহাও দিতে হইবে। আর সেই ব্রহ্মচারীকে ধরিয়া দিতে হইবে। যদি ইহাতে আপনি স্বীকৃত হয়েন, তবে সর্দ্দার আপনার কোন অনিষ্ট করিবেন না। নতুবা সমস্ত মারাট্টা একত্রে মিলিয়া আপনার সর্ব্বনাশ সাধন করিবে। বাঙ্গালীর বাহুতে এমন বল নাই যে, মহারাষ্ট্রীয় শক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়ায়।

ফৌ। অত আসরফি আমার নাই। আমার সর্ব্বস্ব বেচিলেও অত আসরফি হইবে না।

ম। আপনার আছে কি না, তাহা গণিতে আমি আসি নাই। আমি যে কথা বলিলাম, তাহাতে আপনি স্বীকৃত আছেন ক না, তাহাই বলুন।

ফৌ। সর্দ্দারের আদেশ পালনে আমার কোন আপত্তি নাই,—কিন্তু অত আস্‌রফি আমি কোথায় পাইব?

ম। কতক আপনি দিন্, কতক কৃষ্ণগোবিন্দবাবুর নিকট হইতে আদায় করিয়া দিন্।

ফৌ। কৃষ্ণগোবিন্দ যদি না দেয়?

ম। সে যখন আপনার বিনা অনুমতিতে সৈন্য পাঠাইয়াছে, তখন দিবে না কেন? না দেয় তাহার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিয়া লউন।

ফৌ। তাহা হইলে আমাকে কিছু দিন সময় দিতে হইবে।

ম। ভাল, অর্দ্ধেক আস্‌রফি এখন দিন, আর অর্দ্ধেক ছয়মাস মধ্যে দিবেন।

ফৌ। আমার প্রতি দয়া করিতে হইবে।

ম। কি দয়া?

ফৌ। মোট কুড়ি হাজার আস্‌রফি আমি দিব—তন্মধ্যে পাঁচ হাজার এখন এবং বাকি পনের হাজার এক বৎসরের মধ্যে পরিশোধ করিব।

ম। মহারাষ্ট্রীয়গণ অর্থের জন্য এত দূরদেশে আসিয়া শরীরের রক্ত জল করিতেছে,—অর্থের জন্যই মহারাষ্ট্রীয়গণ দুর্ব্বলের বুকে বংশদণ্ড আরোপণ করিয়াছে—অর্থের জন্যই মহারাষ্ট্রীয়গণ অত্যাচারের কলঙ্ক-কালিমা সর্ব্বাঙ্গে মাখিতেছে,—অতএব অর্থ কমাইতে পারিব না। যদি মহারাষ্ট্র-সর্দ্দারের সঙ্গে আপনার প্রীতি সংস্থাপনে ইচ্ছা হয়, তবে আস্‌রফি গুলি দিতেই হইবে।

ফৌ। আমি কোন প্রকারেই অত আস্‌রফি দিতে পারিব

না। আমার এবং কৃষ্ণগোবিন্দবাবুর সমস্ত সম্পত্তির মূল্যও অত হইবে না।

ম। দেশের প্রজার নিকট হইতে তুলিয়া লউন।

ফৌ। তথাপি অত উঠিবে না।

ম। তবে আর মহারাষ্ট্র-সর্দ্দার আপনার সহিত প্রীতি-সংস্থাপন করিতে পারিবেন না।

ফৌ। যদি আমাকে নিতান্তই নির্য্যাতন করা অভিপ্রায় হয়, তবে কোন উপায় নাই।

ম। তবে আমি যাই?

ফৌ। বুঝিলাম আমার অদৃষ্টে যন্ত্রণা আছে।

ম। যাক্, আমি এক কথা বলি।

ফৌ। কি বলুন?

ম। আপনি ভদ্রলোক, এবং নির্দ্দোষ ব্যক্তি। আপনার জন্যে আমরা সকলে মিলিয়া সর্দ্দারকে অনুরোধ করিব। আপনি চল্লিশ হাজার আস্‌রফি দিবেন।

ফৌ। যদি দয়া করিলেন, তবে যাহাতে আমি সংগ্রহ করিয়া দিতে পারি তাহা করুন—ত্রিশহাজার আস্‌রফি দিব। কিন্তু দশহাজার এখন, আর কুড়িহাজার এক বৎসরের মধ্যে।

মহারাষ্ট্রীয়-সৈনিক অনেক চিন্তা করিয়া বলিল,—"ভাল, তাহাই হইবে। এই কুড়ি হাজার আস্‌রফির জন্য একখানি দলিল লিখিয়া দিবেন, এবং দশহাজার আস্‌রফি লইয়া অদ্যই আমার সহিত লোক পাঠাইতে হইবে।"

ফৌজদার সাহেব তাহাতে স্বীকৃত হইলেন। তখন মহারাষ্ট্র-সৈনিক বলিল,—"আর সেই ব্রহ্মচারীকে ধরিয়া দিতে হইবে।

তাহাকে সর্দ্দার কখনই ক্ষমা করিবেন না। তাহার রক্তে অব-মানের প্রতিশোধ লইতে হইবে।"

ফৌজদার সাহেব বলিলেন,—"আমি তাহার নাম পর্য্যন্ত এখনও অবগত হইতে পারি নাই। অতএব কৃষ্ণগোবিন্দবাবুর নিকট তাহার নাম অবগত হইয়া তবে তাহাকে ধৃত করিব। সে কে, কোথায় তাহার বাসস্থান, সে বিষয়ে আমি কিছুই জানি না।"

ম। না না, আমি ওরূপ কথা শুনিতে চাহি না। যেরূপেই হউক, তাহাকে ধৃত করিয়া পাঠান চাই। নতুবা কেবল ত্রিশ-হাজার আস্‌রফিতে আপনার সহিত প্রীতি-সংস্থাপন হইবে না।

ফৌ। তাহাকে ধরিয়া পাঠানর জন্যে আমাকে কিছু দিন সময় দিতে হইবে।

ম। কত দিন সময়?

ফৌ। অন্ততঃ একমাস।

ম। ভাল, তাহাই দেওয়া হইল। কিন্তু স্মরণ রাখিবেন, সেই ব্রহ্মচারীকে না পাঠাইলে আপনার আস্‌রফি গুলি বৃথা যাইবে; আপনার সহিত মহারাষ্ট্র-সর্দ্দারের বিবাদ বাধিবে।

অগত্যা ফৌজদার সাহেব সে প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। তখন সেই সর্ত্তে একখানি দলিল লিখিত ও পঠিত হইল, এবং ফৌজ-দার সাহেব তাহাতে বাদসাহী পাঞ্জা অঙ্কিত করিয়া দিলেন। তৎপর দিবস আস্‌রফিপূর্ণ শকট ও রক্ষী কয়েকজন সৈন্য এবং দলিল লইয়া মহারাষ্ট্র-সৈনিক চলিয়া যাইবেন, স্থির হইল।

রাত্রি প্রহর বাজিল,—ফৌজদার সাহেবের নহবত-খানায় সানাইয়ের করুণ রাগিণী বাজিয়া বাজিয়া নিস্তব্ধতার কোলে মিশিয়া গেল।

সে দিবস মহারাষ্ট্রীয় সৈনিকের সহিত কার্য্য করিয়াই ফৌজদার সাহেব ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন, অন্য কোন কার্য্য আর হইল না.—সভা ভঙ্গের আদেশ প্রদান করিলেন।

ফৌজদার সাহেব ও তদীয়পুত্র অন্দরমহলে গমন করিলেন। ফৌজদার সাহেবের পুত্র বলিলেন,—"আমাদের সৈন্যগণের বাহুতে কি কিছুমাত্র বল নাই?"

ফৌ। সে কথা কেন বাপু?

ফৌ-পু। অত টাকা দেওয়া কেন?

ফৌ। মহারাষ্ট্র-বাহুবলের নিকটে দাঁড়াইতে পারে, এমন শক্তি কাহারও নাই, নতুবা কি দিল্লীর বাদসাহ,—ঢাকার নবাব উঁহাদের সহিত সন্ধি করিতেন!

ফৌ-পু। সন্ধিত দেশ লুঠ করিতে আদেশ দেওয়া! যে রাজা প্রজা রক্ষায় অক্ষম—তাঁহার রাজত্ব অপরের হস্তে দেওয়াই কর্ত্তব্য।

ফৌ। যখন তাঁহারাই ঐরূপ করিতেছেন, তখন আমরা কোন্ ছার!

ফৌ-পু। কিন্তু ব্রহ্মচারীকে ধৃত করিয়া দিবেন বলিয়া স্বীকার করিলেন কেন? ব্রহ্মচারী আমাদের উপকার বৈ, অপকার করেন নাই।

ফৌ। না না,—ব্রহ্মচারী উপকার করে নাই, অপকারই করিয়াছে।

ফৌ-পু। কেন? তিনি যদি আমাকে কৌশলে উদ্ধার করিয়া না আনিতেন, তবে অনেক কষ্ট সহ্য করিতে হইত।

ফৌ। অধিক দিন তোমাকে আর থাকিতে হইত না।

মহারাষ্ট্রীয়সর্দার লোক পাঠাইয়া দিয়াছিল, তাহাকে তাহার প্রার্থিত টাকা দিলেই তোমাকে মুক্তি দিত।

ফৌ-পু। কিন্তু ব্রহ্মচারীর উদ্দেশ্য অতি উৎকৃষ্ট।

ফৌ। তাহা বলিয়া আমি আপন বিপদ্ ডাকিয়া আনিতে পারি না। ফৌজদারসাহেবের পুত্র বিষণ্ণ মনে ম্লান মুখে আপন শয়ন কক্ষাভিমুখে চলিয়া গেলেন। ফৌজদার সাহেবও তাঁহার গৃহে গমন করিলেন।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

—০—

তখন সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে,—দিগন্তর মুখে ঘন কালিমা মাখিয়া পড়িতেছিল। আকাশের নীলগাত্রে পূর্ণোজ্জলকান্ত-কান্তি সন্ধ্যার তারা উঠিয়া বসিয়াছে। দূর বনান্তরাল হইতে স্ফুটনোন্মুখী ফুলকলিকা সৌরভ বিতরণ করিয়া পথিকের প্রাণে আনন্দ প্রদান করিতেছিল।

এই সময় এক প্রান্তরের সরু পথ দিয়া দুইটি মানুষ চলিয়া যাইতেছিল। একজন পুরুষ, আর একজন স্ত্রীলোক। উভয়েই বয়সে নবীন। পুরুষ ব্রহ্মচারিবেশী, রমণীরও ব্রহ্মচারিণী বেশ—কিন্তু বিধবা। উভয়েই আমাদের পরিচিত—পুরুষ অজিতনাথ; রমণী বসন্তরাণী।

উভয়ে ধীর মন্থর গমনে চলিতেছিল, এবং কথোপকথন করিতে করিতে যাইতেছিল। সন্ধ্যার আঁধার মাখিয়া ফুরফুরে হাওয়া কোন্ বনান্তরাল হইতে ফুলের সুবাস চুরি করিয়া আনিয়া

তাহাদিগের পথশ্রান্ত ক্লান্ত দেহের শুশ্রূষা করিতেছিল। বসন্ত-রাণী বলিল,—"গুরুদেব! অনেক পথ হাঁটিয়া আসিলাম, বড় কষ্ট হইতেছে,—আপনার বাড়ী আর কতদূর আছে?"

অজিতনাথ মৃদু হাসিয়া বলিলেন,—"এই গ্রামের পর যে গ্রাম, সেই গ্রামে আমাদের বাড়ী। কিন্তু তোমার কষ্ট হইতেছে কেন?"

ব। হাঁটা আমার অভ্যাস নাই—তিন দিন হাঁটিয়া আসিয়া পা ছিড়িয়া গিয়াছে—কাজেই আর হাঁটিতে পারিতেছি না।

অ। পা তুমি নও,—তোমার কষ্ট হইবে কেন? পা জড়—জড়ের কষ্টে তুমি চৈতন্য—তোমার কষ্ট হইবে কেন?

ব। যে কষ্ট হইতেছে তাহাত আমিই অনুভব করিতেছি।

অ। ইন্দ্রিয়ের পথে গ্রহণ করিতেছ বলিয়া অনুভব করিতেছ। তাচ্ছিল্য করিলে আর তোমাকে কষ্ট পাইতে হইবে না।

ব। আপনার কথা বুঝিতে পারিলাম না।

অ। জীবাত্মা সুখেও নহে, দুঃখেও নহে—সুখ-দুঃখ ইন্দ্রিয়-গণই ভোগ করিয়া থাকে। অতএব ইন্দ্রিয় নিরোধ করিতে পারিলে সুখ-দুঃখে কষ্ট পাইতে হয় না।

ব। কিন্তু এখন যে কষ্ট হইতেছে?

অ। হাঁ, তাহা হইবে। কিন্তু অভ্যাস করিতে হইবে। ইহাকে অভ্যাস-যোগ বলে। মনে কর, বাদলার হাওয়া লাগিলে তোমার অসুখ করে, আর ঐ যে কৃষকদিগকে বর্ষার ধারা মস্তকে করিয়া মাঠের কাজ করিতে দেখিতেছ, উহাদের কোন অসুখ করে না। তুমিও মানুষ—উহারাও মানুষ; তবে তোমার যাহাতে অসুখ হয়, উহাদের তাহাতে অসুখ হয় না কেন?

উহারা অভ্যাস করিয়াছে বলিয়া। সুখ-সম্পৃষ্ট ব্যক্তির দুগ্ধফেন-নিভ শয্যায় ভাল নিদ্রা হয় না, আর ঐ দরিদ্র ব্যক্তি খড়ের উপরে শয়ন করিয়া সুখে নিদ্রা যায় কেমন করিয়া? উভয়েই মানুষ। অতএব অভ্যাসেই সকল হয়। কিন্তু যাহারা আধ্যাত্মিক পথের পথিক নহে—যাহারা জ্ঞানহীন—তাহারা ইহজগতের সুখ লইয়া—ইন্দ্রিয়ের সন্তোষ সাধন করা লইয়া এই দিন কাটাইয়া দেয়।

ব। কেমন করিয়া অভ্যাস করিতে হয়?

অ। আ'জ তিন দিন হাঁটিয়া কষ্ট বোধ হইতেছে, এবার পাঁচ দিন হাঁটিয়া কষ্ট বোধ হইবে,—তিন দিন হাটিয়া কষ্ট হইবে না। এইরূপ সর্ব্বত্র। আর এক প্রধান কথা আছে

ব। সে কথা কি?

অ। সে কথা এই যে, সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, এই দেহ আমি নহি, এই ইন্দ্রিয়গণ আমি নহি—আমি এ দেশের লোক নহি। ইন্দ্রিয়গণ সুখের অভিলাষী হইয়া আমাকে মজাইতে চেষ্টা করিতেছে,—ইহাদিগকে ফাঁকি দিতে হইবে। দেশের মানুষ দেশে যাইতে হইবে। এখানকার কিছুই আমার ভোগ্য নহে—আমিও ভোক্তা নহি।

ব। এইত গ্রামের মধ্যে আসিলাম—সন্ধ্যার অন্ধকারে সমস্ত দিক্ আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে—আর পথ দেখা যাইতেছে না। এখন কি প্রকারে যাইব?

অ। যাইতে ভয় হইবে কেন?

ব। পথে সাপ থাকিতে পারে।

অ। সাপে কামড়াইয়া আমাদের কি করিবে?

ব। মৃত্যু ঘটিবে।

অ। মানুষের মরণ সাপে কামড়াইলে হয় না, বাঘে খাইলে হয় না, জলে ডুবিলে হয় না, মহামারীতে হয় না,—অদৃষ্টের ভোগ শেষ হইলেই মানুষ মরে। কিন্তু সে মরণ কি? আত্মার বিস্তৃতি—একবারকার কর্ম্ম[illegible]গের অবসান। আত্মা মরে না—দেহ পরিত্যাগ করে—মর[illegible] ভয় কি? মরণে ভয় নিবারিত হওয়াই জ্ঞানের কার্য্য—জ্ঞা[illegible] জানে আমার মরণ নাই—দেহের নাশ হয় মাত্র। জ্ঞানে[illegible]র দ্বারা এই তত্ত্ব বুঝিতে পারা যায়।

ব। কিছুতে যদি আ[illegible]ত লাগে তবে বর্ত্তমানে কষ্ট পাইতে হইবে।

অ। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার সখা ও শিষ্য অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন—

> ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি।
> ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়াণি মায়য়া॥

অতএব, তিনি এই বিশ্বের জীব-হৃদয়ে—কেবল জীব-হৃদয়ে কেন ফলে-ফুলে, আঁধারে-আলোকে, বীজে-অঙ্কুরে সর্ব্বত্রই—সকলেরই হৃদ্দেশে অধিষ্ঠিত আছেন,—এবং যন্ত্রারূঢ় পুতুলের ন্যায় নাচাইতেছেন। তিনি যাহা করিবেন, তাহাই হইবে—তুমি আমি সাবধান হইয়া কি করিব? এ জগতে সুখের ইচ্ছুক নহে কে? দুঃখে বিতৃষ্ণ নহে কে? তবে সুখের পরিবর্ত্তে দুঃখ আসে কেন? সুখ চাহিয়া পায় না কেন?

ব। কিন্তু একটা কথা।

অ। কি বল দেখি?

ব। আপনি পূর্ব্বে বলিয়াছেন, জীব আপন কর্ম্মফলেই গতাগতি করে—এবং সুখ দুঃখ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এখন বলিতেছেন,—ভগবান্ সকলের হৃদ্দেশে অবস্থান করিয়া জীবকে নাচাইয়া থাকেন। কথাটা কিছু গোলযোগের হইয়াছে।

অ। গোলযোগের কিছুই নয় মা,—আমাদের বুদ্ধিরই গোলযোগ। বলা হইয়াছে—যন্ত্রী যেমন যন্ত্রেতে আরূঢ় করাইয়া পুতুল নাচায়—ভগবান্‌ও তেমনি হৃদ্দেশে অবস্থান করিয়া মায়া দ্বারা আমাদিগকে নাচাইয়া থাকেন। আমাদের নাচাইবার জন্য মায়া আছে—মায়ার আরূঢ় হইয়া আমরা নাচিয়া থাকি। মায়া পরিত্যাগ করিলে আর নাচিতে হয় না। তবে মায়া তাঁহার—মায়ার সৃষ্টি না করিলে আমরা নাচিতাম না। এ নাচনের নটও তিনি। অতএব তিনিই সকলের সব—সবের সকল।

ব। এইত গ্রাম ছাড়াইলাম—আবার মাঠে পড়িলাম, এখান হইতে আর কতদূর?

অ। এই যে মাঠটা দেখিতেছ,—ইহা ছাড়াইতে পারিলেই গ্রামে পঁহুছিব।

ব। আর কত পথ হইবে?

অ। একক্রোশ হইবে।

ব। একটা কথা বলি বলি করিয়া বলিতে পারিতেছি না—

অ। সে কি কথা? আমার সাক্ষাতে তোমার কোন কথা বলিতে লজ্জা নাই।

ব। কিন্তু সে কথা আমায় বলিতে নাই—তাই বলিতে পারিতেছি না।

অ। এমন কি কথা?

ব। আপনি গুরু, আমি শিষ্যা,—আপনি পিতা আমি কন্যা,—কিন্তু আমাদের উভয়েরই বয়স অল্প। লোকে কুৎসা করিবে না ত?

অজিতনাথ হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। সে সরল উদাস হাসির মাধুর্য্য চুরি করিয়া বাতাস দিগন্তে লইয়া গেল। অজিতনাথ হাসিয়া বলিলেন—"লোকে কুৎসা করিলে তোমার আমার কি হইবে? পাপ লোকের মুখে, না আমাদের হৃদয়ে?"

ব। তথাপি লোকে কিছু বলিলে লজ্জা করে!

অ। যেখানে পাপ নাই—সেখানে লজ্জা আসিবে কেন?

ব। তা বলিতে পারি না,—কিন্তু সে কথা বলিয়া লোকে যদি কাণাঘুসা করে তবে আমি জীবন রাখিব না।

অ। তোমার ভুল—নিন্দা-প্রশংসা, সুখ-দুঃখ সব সমান। ভগবানে আত্ম-সমর্পণ করিয়া তাঁহার কাজ কর।

ব। আর একদিন আপনাকে বলিয়াছি,—আমি স্ত্রীলোক,—আমি ঈশ্বর বুঝি না, আমি দেবতা বুঝি না—বুঝি স্বামীসেবা; তিনি স্বর্গে গিয়াছেন।

অ। তিনি জগতে মিশিয়াছেন—জগতের হইয়াছেন, অতএব জগতের সেবা কর। জগৎ তিনি—জগৎ তাঁহাতে। অতএব সুখ-দুঃখ সমজ্ঞান করিয়া জগতের সেবা কর। জগতের করুণ শ্বাস নিবারণ কর। আপন ভাবিয়া কাজ করিও না,—পরের ভাবিয়া কাজ করিও না। তাঁহার কাজ কর। আনন্দ পাইবে—সুখ পাইবে।

ব। আপনার বাড়ীতে আর কে আছেন?

অ। আর কেহ নাই—আমি একা।

ব। আপনি বাড়ী হইতে বাহির হইয়াছেন,—এখন সেখানে কে আছে?

অ। কেহ নাই, বাড়ীর দরোজা বন্ধ আছে।

ব। কি উপায়ে আপনার সংসারের ব্যয় নির্ব্বাহ হয়?

অ। ভগবান্ দেন।

ব। ভগবান্ কি হাতে করিয়া আনিয়া দেন?

অ। ভগবান্ হাতে করিয়া কোন কাজ করেন না,—তাঁহার ইচ্ছায় জগতের কার্য্য হয়, শিশু না জন্মাইতে মাতৃ-স্তনে দুগ্ধ সঞ্চার হয়, আর আমি একটা জীবন্ত জীব, আমার আহার যুটিবে না?

ব। ঐ সম্মুখে আলো দেখা যাইতেছে,—উহা বোধহয় কোন গ্রাম। ঐ গ্রামে কি আপনার বাড়ী?

অ। হাঁ, ঐ গ্রামে। এখান হইতে অতি নিকটে বটে, কিন্তু সম্মুখে একটা জলাশয়,—ঐ জলাশয়টা ঘুরিয়া যাইতে হইবে, কাজেই আরও একটু বিলম্ব হইবে।

ব। আমি ভিখারিণী,—আপনি দরিদ্র। তবে কি দিয়া পরের উপকার করিব?

অ। পরের উপকার বলিয়া কাজ করিতে গেলে, কার্য্য সিদ্ধ হয় না। ভগবানের কাজ বলিয়া,—কাজ করিতে হয় বলিয়া কাজ করিলে কাজ অসিদ্ধ থাকে না। ভয়, কলঙ্ক, লজ্জা এসকল সেই নিষ্কলঙ্ক নামে সমর্পণ করিয়া কাজ করিতে হয়।

ততক্ষণ তাহারা গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করিল। গ্রামোপান্তে মুচীপাড়া,—মুচীপাড়ায় অনেকগুলি পালিত কুকুর ছিল,—

তাহারা পথিকের পদশব্দে ডাকিয়া ডাকিয়া নিস্তব্ধ হইল। অজিতনাথ বসন্তরাণীকে সঙ্গে লইয়া গ্রাম্যপথে চলিয়া গেল।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

যেদিন দশসহস্র আস্রফি লইয়া এবং বিংশতিসহস্র আস্রফির দলিল লেখাইয়া লইয়া মহারাষ্ট্র-সর্দ্দার চলিয়া গেল, তৎপর দিবস সকালে ফৌজদার সাহেব নিজেই কাঞ্চন-নগরে কৃষ্ণগোবিন্দবাবুর বাড়ীতে গমন করিলেন।

সহসা ফৌজদারসাহেবের আগমনে কৃষ্ণগোবিন্দ অতিশয় বিচলিত হইয়া পড়িলেন। বজ্রাঘাতের পূর্ব্বে যেমন বিদ্যুৎ দেখা যায়, সেইরূপ ফৌজদারসাহেবের আগমনে বিপদ্-বজ্রপাতের শঙ্কায় তিনি শঙ্কিত হইয়া পড়িলেন।

যথাবিধি অভ্যর্থনাদি করিয়া সর্ব্বাপেক্ষা সুদৃশ্য আসনে উপবেশন করাইয়া আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন।

ফৌজদারসাহেব বলিলেন,—"তুমি আমাকে অত্যন্ত বিপন্ন করিয়াছ। তোমার জন্যে আমি পথের ফকির হইতে বসিয়াছি।"

কৃ। হুজুরের কথা আমি বুঝিতে পারিতেছি না। অধীন আজ্ঞাবহ,—আমি আপনার কি অনিষ্ট করিতে পারি?

ফৌ। আমার পুত্রকে মহারাষ্ট্র-শিবির হইতে উদ্ধার করিয়া আনিতে তোমায় কে বলিয়াছিল?

কৃ। আপনার আদেশেই আমি ঐরূপ করিয়াছি।

ফৌ। আমি তোমাকে কি মহারাষ্ট্র-সৈন্যগণের সহিত

লড়াই করিয়া আমার পুত্রকে আনিতে বলিয়াছিলাম? তাহার সন্ধান করিতে বলিয়াছিলাম মাত্র। তুমি যাহা করিয়াছ, তাহাতে মহারাষ্ট্র-সর্দ্দার মহা কুপিত হইয়াছে,—আমার সর্ব্বনাশ করিতে সমুদ্যত হইয়াছে।

ক্ল। আমি তাহাদের বিরুদ্ধে লড়াই করিতে বলি নাই। এক ব্রহ্মচারী ঐরূপ করিয়াছে।

ফৌ। সে ব্রহ্মচারী কে?

ক্ল। তাহার নাম অজিতনাথ।

ফৌ। তাহার বাড়ী কোথায়?

ক্ল। নিকটেই হরিদ্রাপুর নামক এক পল্লী আছে,—অজিতনাথ সেই পল্লীতে বাস করে।

ফৌ। সে কি আপনার সৈন্যশ্রেণী মধ্যে, না সামন্ত?

ক্ল। না না,—তাহার সহিত আমার কোন সম্বন্ধই নাই। মহারাষ্ট্রীয়গণ এক বিধবাকে ধরিয়া লইয়া গিয়াছিল,—তাহারই সন্ধানে সেখানে যায়, এবং আপনার পুত্রের সন্ধান আনে; বলে যে, সামান্য সৈন্য পাইলে আপনার পুত্র ও সেই বিধবাকে উদ্ধার করিয়া আনিতে পারে। আমিও তখন তত বুঝিয়া দেখিলাম না,—উহার সঙ্গে কিয়ৎ সংখ্যক সৈন্য দিয়াছিলাম।

ফৌ। মহারাষ্ট্র-সর্দ্দার সেই ব্রহ্মচারীকে ধৃত করিয়া দিবার জন্য আদেশ করিয়াছে,—না দিলে আমার মাথা থাকিবে না। সে এখন কোথায় আছে?

ক্ল। সন্ধান জানি না;—শুনিলাম, সে আমার সৈন্যদের সঙ্গে আসে নাই। সেই স্ত্রীলোকটিকে সঙ্গে লইয়া একাকী চলিয়া গিয়াছে।

ফৌ। বোধহয় এত দিন বাড়ী আসিয়াছে,—তাহাকে ধৃত

করিবার জন্য অদ্যই কতকগুলি সৈন্য পাঠাও। তাহাকে ধরিয়া পাঠাইতেই হইবে।

ক্ব। আমার উপরে ঐ আদেশ না দিলে বড়ই বাধিত ও অনুগৃহীত হইব।

ফৌ। কেন?

ক্ব। আমি হিন্দু,—আপনাদের যেমন ফকিরের উপর কোন প্রকার জুলুম করিতে নাই; আমাদেরও তদ্রূপ ব্রহ্মচারী. সন্ন্যাসীর অত্যাচার করিতে নাই। ইহাতে সমাজে কলঙ্ক,—এবং পরকালে নরকবাস হয়।

ফৌ। রক্ষা করুন আপনি। আপনাকে অনেক কাজ করিতে হইবে। মহারাষ্ট্র-সর্দ্দারকে ত্রিশ হাজার আসরফি আমায় দিতে হইবে,—সে টাকার জন্য আপনি দায়ী. ঐ টাকাগুলা আপনাকে দিতেই হইবে।

ক্ব। কি সর্ব্বনাশ! ত্রিশহাজার আসরফি আমার জমিদারী ও যথাসর্ব্বস্ব বিক্রয় করিলেও হইবে না।

ফৌ। ফকির হউন—সর্ব্বস্ব আমাকে ছাড়িয়া দিন। মহারাষ্ট্র-সর্দ্দারের ঋণ পরিশোধ না করিলে, আমার সর্ব্বনাশ হইবে,—আমার মস্তক যাইবে।

ক্ব। অধীন আজ্ঞাধীন;—যাহাতে বজায় থাকিতে পারি, তাহা করিতে হইবে।

ফৌ। ভাল, পরামর্শ করিয়া সে সম্বন্ধে যাহা হয়, তাহা করা যাইবে। এখনই অজিতনাথকে ধৃত করিবার জন্য লোক পাঠাও। তাহাকে সেখানে পাঠাইতেই হইবে: আমার আদেশ প্রতিপালন কর।

কৃষ্ণগোবিন্দ ইতস্ততঃ করিতেছিলেন। ফৌজদারসাহেব ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন,—"যদি এখনই আমার আদেশ প্রতিপালন না কর, তবে আমি উঠিয়া যাইব, এবং তোমার বিরুদ্ধে সৈন্য পাঠাইব।"

তখন কৃষ্ণগোবিন্দ অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ মনে একজন সামরিক কর্ম্মচারীকে ডাকিয়া অজিতনাথকে ধৃত করিবার জন্য কয়েকজন সৈন্য পাঠাইতে আদেশ করিলেন। ফৌজদারসাহেব বলিয়া দিলেন,—"অদ্যই তাহাকে এখানে ধৃত করিয়া আনিতে হইবে। কোন প্রকারে তাহার উপর দয়া প্রকাশের কথা শুনিলে কাহারও মাথা থাকিবে না।"

কর্ম্মচারী দুর্গমধ্যে গমন করিয়া সৈন্য প্রেরণ করিলেন। তখন, ফৌজদার সাহেব কৃষ্ণগোবিন্দকে বলিলেন,—"এখন আমাদের কথা হউক। আস্‌রফির কি ?"

কৃ। আমি আজ্ঞাধীন,—যাহাতে বজায় থাকি, এরূপ করিয়া বলিলে, আমি আজ্ঞাপালনে অসম্মত হইব না।

ফৌ। দেখ, আমি বিদেশী—টাকা রোজগার করিবার জন্য এদেশে আসিয়াছি। আমি মহারাষ্ট্রগণকে টাকা দিতে আসি নাই। বিশেষতঃ তোমার দোষেই আমাকে এত টাকা দিতে হইবে। অতএব, টাকাগুলি তোমাকেই দিতে হইবে।

কৃ। অত টাকা আমি কোথায় পাইব ?

ফৌ। কত টাকা তুমি দিতে পার ?

কৃ। দশ পনর হাজার টাকা দিতে পারি।

ফৌ। সমুদ্রে পাদ্য অর্ঘ্য ! ত্রিশ হাজার আস্‌রফির স্থানে দশ হাজার টাকা ! সমুদায় আস্‌রফি গুলিই তোমাকেই দিতে হইবে।

কৃ। আমি কোথায় পাইব ?

ফো। কেন পাইবে না ? তোমার ঘর হইতে টাকা কেন দিবে ? তোমার বিস্তৃত জমিদারী,—অগণ্য প্রজা। প্রজাদের নিকট হইতে টাকাগুলা আদায় করিয়া লও।

কৃ। এত টকা তাহাদের নিকটে আদায় করিতে হইলে, দেশে হাহাকার উঠিবে। অত্যাচারের আগুনে প্রজাদিগকে দগ্ধ করিতে হইবে।

ফো। শোন, কৃষ্ণগোবিন্দবাবু ;—আমরা মহারাষ্ট্র-তরবারি আঘাতে না মরিয়া প্রজাদের উপরে অত্যাচার করিতে ভয় পাইব কেন ? মহারাষ্ট্রীয়েরা টাকা না পাইলে তোমাকে ছাড়িবে না,—অতএব অত্যাচার করিতে হয়, অত্যাচার কর ; প্রজাগণের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিতে হয়, সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন কর,—আমরা দায় হইতে রক্ষা পাইব। এ অত্যাচারের কথা নবাবের নিকটে পঁহুছিবে না। প্রজাগণ সেখানে জানাইলে তদন্তের ভার আমারই উপরে আসিবে। আমি তখন বলিব যে, কৃষ্ণগোবিন্দবাবু ভাল জমিদার—প্রজাগণই বিদ্রোহী হইয়াছে।

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ।

—০—

দীর্ঘ দিবসের পরিত্যক্ত অগুছান গৃহে সন্ধ্যার অনেকক্ষণ পরে বসন্তরাণীকে লইয়া সে দিন অজিতনাথ আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

অজিতনাথের বাড়ীর নিকটে আর কোন গৃহস্থের বাড়ী ছিল না। তাঁহার বাড়ীর তিনপাশে আম্র কাঁঠাল নারিকেল গুবাক প্রভৃতি বৃক্ষের বাগান। সেই বাগানের অপরপার্শ্বে অন্য গৃহস্থ-গণের বাড়ী। দক্ষিণে নদী।

ঘন বিন্যস্ত বৃক্ষরাশি আবেষ্টিত অজিতনাথের বাড়ী বিশ্বের অন্ধকার গায়ে মাখিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। আসিবার সময় পথে এক গৃহস্থের বাড়ী হইতে অজিতনাথ আগুন লইয়া আসিয়া-ছিলেন,—বাড়ীর প্রাঙ্গণে আসিয়া শুষ্ক-তৃণকাষ্ঠ সাহায্যে অগ্নি প্রজ্বলিত করিলেন। তারপর গৃহের দ্বার খুলিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া দীপ লইয়া আসিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। বসন্তরাণী এতক্ষণ প্রাঙ্গণে সেই অগ্নিকুণ্ডের নিকট দাঁড়াইয়া-ছিল,—অজিতনাথের আহ্বানে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল।

বসন্তরাণীর প্রাণে তখন কেমন এক দুরু দুরু কম্পিতভাব। অজিতনাথকে সে সম্পূর্ণরূপে জানিয়াছে, তিনি নররূপে দেবতা। অজিতনাথ তাহার গুরু,—অজিতনাথ তাহার পিতার তুল্য। কিন্তু তথাপি কে জানে এই জনহীন শূন্য আলয়ে অজিতনাথের নিকটে থাকিতে তাহার প্রাণের ভিতর লজ্জা মাখা ভয় এক একবার উদিত হইতেছিল। আবার প্রাণকে বুঝাইয়া দিতেছিল।

সমস্ত দিন তাহাদের আহার হয় নাই। সেই দুপুর বেলা

পথে আসিতে আসিতে এক চাষার বাড়ীতে কিছু ফল আর জল খাইয়া আসিয়াছিল।

অজিতনাথ বলিলেন,—"এই বাড়ীর দক্ষিণে নদী আছে। সেইস্থান হইতে জল আনিতে হইবে। তুমি ঘরে ব'স আমি জল আনি।"

ব। নদী কতদূর?

অ। দূর নহে,—অতি নিকটে।

ব। আমিও যাইব। বড় অন্ধকার—আপনি আলো লউন, আমি কলসী লইতেছি।

অজিতনাথ আলো লইলেন, বসন্তরাণী কলসীকক্ষে লইল। উভয়ে গৃহের বাহির হইল,—অজিতনাথ গৃহের অর্গল টানিয়া দিয়া অগ্রে অগ্রে চলিলেন, বসন্তরাণী কলসীকক্ষে লইয়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ গেল।

চারিদিকে অন্ধকারের স্তূপ—এক ক্ষুদ্র আলো লইয়া তাহারা নদীতটে গমন করিল। অন্ধকারের মধ্যে সেই ক্ষুদ্র আলো নদীর নির্ম্মল নীলজলে স্বর্ণকিরণ বিকাশ করিল।

তাহারা হস্তপদাদি প্রক্ষালন করিয়া জল লইয়া বাড়ী ফিরিল। অজিতনাথ বলিলেন—"ঘরে চাউল আর দাউল আছে, ঘৃতও আছে—আমি আতপ চাউল খাই। বাড়ী হইতে কোথায় যাইতে হইলে কিছু সংগ্রহ করিয়া রাখিয়া যাই। এক্ষণে তুমি ভাত রাঁধ। ওবেলা যখন আহার হয় নাই, তখন এ বেলা আহারে দোষ নাই—আমিও একাহারী।"

বসন্তরাণী রন্ধনের উদ্যোগ করিতে লাগিল। অজিতনাথ রন্ধনের দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিয়া তাহার নিকটে গুছাইয়া

দিতেছিল,—এমন সময় একটি প্রজ্বলিত দীপ হস্তে করিয়া বাহির হইতে আর্ত্তস্বরে একজন কে ডাকিয়া বলিল,—"আপনি কি বাড়ী আসিয়াছেন? বাহির হইয়া আমার একটা কথা শুনুন,—আমি বড় বিপন্ন।"

আর্ত্তস্বর শুনিয়া হাতের কাজ ফেলিয়া অজিতনাথ গৃহের বাহির হইয়া প্রাঙ্গণে আসিলেন।

যে ডাকিয়াছিল, সে সেই গ্রামের এক কৃষক,—নাম উমেশ মণ্ডল। উমেশ মণ্ডল বলিল—"আপনার ঘরে আলো দেখিয়া বুঝিলাম, আপনি বাড়ী আসিয়াছেন, তাই ছুটিয়া আসিলাম। আমি বড় বিপদে পড়িয়াছি।"

সমবেদনার স্বরে অজিতনাথ বলিলেন—"তোমার কি বিপদ্?"

উ। আমার স্ত্রীর আ'জ একমাস জ্বর,—সে জ্বরের কিছু উপশম হইল না। এবার বড় দুর্ব্বৎসর—হাতে পয়সা নাই। ঘরে ধানচাল নাই। ভাল চিকিৎসক দেখাইতে পারি নাই। আ'জ তিন দিন হইতে সে অজ্ঞান অবস্থায় পড়িয়া আছে। তার উপরে কোলের ছেলেটার আ'জ সাত দিন জ্বর—সে আ'জ আর থাকে না। তার সর্ব্বাঙ্গ হিম হ'য়ে উঠেছে। কোন উপায় নাই—পাড়ার কোন লোক আসিয়া একবার উঁকি মারিয়া দেখে না; ছেলেটার বোধ হয় আর সময় নাই।

অজিতনাথ গৃহমধ্যে গিয়া বসন্তরাণীকে বলিলেন,—"আমার সঙ্গে চল। একটি রমণী জ্বরে অজ্ঞান হইয়া আছে, আর তার শিশু সন্তানটির আসন্ন মরণের অবস্থা। চল, তাহাদের সেবা করিয়া আসি।"

বসন্তরাণী হাত ধুইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। অজিতনাথের মুখের দিকে চাহিয়া মধুস্বরে জিজ্ঞাসা করিল,—"ক্ষুধা হইয়াছে বলিয়াছিলেন,—রাঁধিব না?"

অজিতনাথ হাসিয়া বলিলেন,—"তোমার আমার ক্ষুধার চেয়ে, তাহাদের যন্ত্রণা অধিক। অতএব, যেটা আগের কাজ, সেইটা আগে করিতে হইবে।"

তখন বসন্তরাণী অজিতনাথের সহিত বাহিরে আসিল। অজিতনাথ গৃহার্গল বন্ধ করিয়া দিয়া উমেশ মণ্ডলকে বলিল,—"চল।"

উমেশ মণ্ডল এতক্ষণ স্থির নেত্রে বসন্তরাণীর অপ্সরারূপ নিরীক্ষণ করিতেছিল। সর্ব্বাঙ্গ দিয়া গৌরবর্ণের ছটা নির্গত হইতেছিল,—তাহার উপরে গৈরিক মৃৎরঞ্জিত বসন, মস্তকের রুক্ষ কৃষ্ণ কেশরাশি কুণ্ডলী কৃত। উমেশ মণ্ডল সে রূপ দেখিয়া ভাবিতেছিল,—এ দেবী কে? অজিতনাথ অবিবাহিত—এ বিধবা ব্রহ্মচারিণী ইহার গৃহে কোথা হইতে আসিল!

অজিতনাথ বলিলেন,—"শীঘ্র চল।"

তখন উমেশ মণ্ডল অগ্রে অগ্রে আলো লইয়া চলিল। মধ্য-ভাগে জ্যোতির্ম্ময়ী বসন্তরাণী,—পশ্চাতে ব্রহ্মচারী অজিতনাথ।

উমেশ মণ্ডলের বাড়ী গ্রামের পশ্চিম প্রান্তে। গ্রামে অত্যন্ত জঙ্গল,—চারিদিকের জঙ্গল আসিয়া তাহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গৃহ দুই খানিকে আচ্ছন্ন করিয়া ধরিয়াছে। একখানিতে রন্ধন কার্য্য নির্ব্বাহ হয়, এবং একপার্শ্বে একটি গাভী অবস্থান করে। অপর খানিতে তাহার হতচৈতন্য স্ত্রী ও পুত্র রুগ্নশয্যায় পড়িয়া রহিয়াছে। আর একটি দশবৎসরের মেয়ে তাহার অচৈতন্য মাতার শিয়র

দেশে বসিয়া আছে,—মৃৎপ্রদীপে ক্ষীণ বর্ত্তিকা জ্বলিয়া জ্বলিয়া আলোক প্রদান করিতেছিল। তাহারা তিনজনে সেই গৃহে প্রবেশ করিল।

অজিতনাথ গৃহপ্রবেশ করিয়া দেখিলেন, গৃহখানি অত্যন্ত অপরিষ্কার এবং সেঁৎসেঁতে। সে গৃহে রোগীর অবস্থান করা কিছুতেই কর্ত্তব্য নহে। যাহা হউক, তিনি বালকটির গাত্রে হস্তার্পণ করিয়া দেখিলেন, তাহার সর্ব্বাঙ্গ শীতল হইয়া গিয়াছে,—কেবল বুকের উপর একটু উষ্ণ আছে। হস্তপ্রকোষ্ঠ টিপিয়া দেখিলেন, তখনও নাড়ীপ্রবাহ অতি ধীরে ধীরে চলিতেছে, এবং একটু জ্বর আছে। বুঝিলেন, এই জ্বরটুকু ছাড়ীবার সময়ই বালকের প্রাণবায়ু বিনির্গত হইবে।

অজিতনাথ উমেশকে আগুন জ্বালিতে বলিয়া তাহার স্ত্রীর নাড়ী পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন। তাহার অত্যন্ত জ্বর,—শ্লেষ্মার প্রকোপও আছে। তখন বসন্তরাণীকে রমণীর শুশ্রূষার্থে নিয়োগ করিয়া নিজে বালকটিকে সেঁক-তাপ করিতে লাগিলেন এবং কয়েক গাছড়া সিদ্ধ করিয়া তাহাকে সেবন করাইতে লাগিলেন। কিন্তু নির্ব্বাণ-দীপে তৈলদানের ন্যায় তাহাতে কোন ফলই হইল না। গাত্রের তাপ একটু হইয়াছিল বটে, কিন্তু নিশা অবসান কালে তাহার জ্বর ছাড়িল,—সঙ্গে সঙ্গে নাড়ীও ছাড়িয়া গেল,—বালকের শেষ নিশ্বাস পৃথিবীর বুকে পড়িল।

অজিতনাথ উমেশ মণ্ডলকে বলিলেন,—"তোমার ছেলে আর নাই। কিন্তু এখন কাঁদাকাটি করিও না। তোমার স্ত্রীর অবস্থাও অত্যন্ত মন্দ,—এসময় যদি সে জানিতে পারে, তাহার ছেলে নাই, তবে তাহারও প্রাণ বিয়োগ হইবে। তোমার মেয়ে ঘুমাইয়া

পড়িয়াছে, সে এখনও জানিতে পারে নাই যে, তাহার স্নেহের ভাইটি ফাঁকি দিয়াছে। প্রাণ বাঁধ,—গোলযোগ করিও না। পাড়ার মধ্যে গিয়া একখানি পাল্কী ডাকিয়া আন,—তোমার ঘরে থাকিলে, তোমার স্ত্রী বাঁচিবে না। আমার বাড়ী লইয়া যাইতে হইবে। তোমার মেয়ে আর স্ত্রী আমার বাড়ী গেলে, তখন তোমার পুত্রের শবদেহ শ্মশানে লইয়া যাইও "

উমেশ মণ্ডল কাঁদিতে কাঁদিতে জিজ্ঞাসা করিল,—"পাল্কীর ভাড়া দিবার ক্ষমতা আমার নাই।"

অজিতনাথ বলিলেন,—"সে আমি দিব। তুমি শীঘ্র ডাকিয়া আন।"

উমেশ মণ্ডল কাঁদিতে কাঁদিতে চলিয়া গেল এবং কিয়ৎক্ষণ পরে একখানি পাল্কী লইয়া আসিল। তখন বসন্তরাণী, উমেশ মণ্ডল, আর অজিতনাথ তিনজনে ধরাধরি করিয়া উমেশ মণ্ডলের স্ত্রীকে পাল্কাতে তুলিয়া দিল। সে তখনও সম্পূর্ণ অচৈতন্য। বসন্তরাণী উমেশ মণ্ডলের মেয়েটিকে সঙ্গে লইয়া গেল,—অজিতনাথ তাহাদিগকে বাড়ী রাখিয়া আসিয়া উমেশ মণ্ডলের স্বজাতিগণকে ডাকিয়া দিলেন, এবং যাহাতে তাহার বালক পুত্রের মৃতদেহ সৎকার হয় তাহার বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া বাড়ী ফিরিয়া গেলেন।

তখন বেলা প্রায় এক প্রহর অতীত হইয়া গিয়াছে। বাড়ী গিয়াই অজিতনাথ একজন চিকিৎসক ডাকিবার জন্য লোক পাঠাইয়া দিলেন, এবং বসন্তরাণীকে রন্ধনের জন্য নিযুক্ত করিলেন। উমেশ মণ্ডলের ও তাহার বালিকা কন্যার আগের দিন হইতে আহার হয় নাই।

বসন্তরাণী উমেশ মণ্ডলের কন্যাকে সঙ্গে লইয়া নদী হইতে স্নান করিয়া আসিয়া রান্না চড়াইয়া দিল। অজিতনাথ চিকিৎসক আসিলে উমেশ মণ্ডলের স্ত্রীর চিকিৎসার বন্দোবস্ত করিয়া স্নান করিতে যাইবেন। ততক্ষণ গৃহ-প্রাঙ্গণে বসিয়া পুত্রশোকাতুর উমেশকে নানাপ্রকার প্রবোধ বাক্যে সান্ত্বনা করিতেছিলেন।

সহসা একজন লোক আসিয়া বলিল,—"দাদাঠাকুর, আপনাকে ডাকিতেছে।"

অজিতনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কে ?"

আগন্তুক বলিল,—"বোধহয় জমিদারের লোক। তারা প্রায় ছয় সাতজন বাহিরে দাঁড়াইয়া আছে।"

অজিতনাথ কিঞ্চিৎ উচ্চস্বরে বলিলেন,—"কে গা ? একটু অপেক্ষা কর, আসিতেছি।"

কিন্তু তাহারা অপেক্ষা করিল না। অজিতনাথের স্বর শুনিতে পাইয়াই তাহারা বাড়ীর মধ্যে চলিয়া আসিল, এবং বলিল,—"আপনি বন্দী, আপনাকে লইয়া যাইব।"

উমেশ মণ্ডল বেদনাপ্লুত নয়নে তাহাদের দিকে চাহিয়া রহিল। অবিচলিতস্বরে অজিতনাথ বলিলেন,—"আমি কাহার নিকট বন্দী ?"

যাহারা আসিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে যে প্রধান সে বলিল,— "ফৌজদার সাহেব এবং জমিদার কৃষ্ণগোবিন্দবাবু উভয়ের আদেশে তোমাকে বন্দী করিতে আসিয়াছি।"

অ। কি অপরাধে বন্দী হইলাম, তাহা বোধহয় তোমরা জান না ?

প্র। না, তাহা আমাদের জানিবার সম্ভাবনা কোথায় ?

অ। কিন্তু তোমাদের নিকটে আমার এক করুণ প্রার্থনা। তোমরাও মানুষ,—তোমাদেরও স্ত্রী পুত্র,—আপদ্ বিপদ্ আছে। অবশ্যই আমার প্রার্থনা গ্রাহ্য করিবে। .

প্র। কি প্রার্থনা?

অ। এই উমেশ মণ্ডল-বড় গরীব,—ইহার স্ত্রী পুত্র উভয়েরই ব্যারাম হইয়াছিল; ছেলেটি সকালে মৃত্যুমুখে নিপতিত হইয়াছে। স্ত্রীও বাঁচে না—ইহার নিজের গৃহে খড় নাই, বর্ষার জল পড়িয়া পড়িয়া সেঁৎসেঁতে হইয়া গিয়াছে, সেই ঘরে থাকিয়া ছেলেটি মারা পড়িয়াছে, ইহার স্ত্রীও আসন্ন মরণের ধারে। অর্থাভাবে চিকিৎসক ডাকিতে পারে নাই। ইহার স্ত্রীকে আমার বাড়ীতে আনিয়া চিকিৎসক ডাকিতে পাঠাইয়াছি,—তোমরা একটু অপেক্ষা কর,—চিকিৎসক আসিলে চিকিৎসার একটা বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া আমি তোমাদের সঙ্গে যাইব।

প্র। ফৌজদার সাহেবের হুকুম, তিলার্দ্ধ বিলম্ব করিতে পারিব না।

অ। বিলম্ব বড় অধিকক্ষণ করিতে হইবে না। চিকিৎসক ডাকিতে লোক গিয়াছে,—এখনই আসিবে।

প্র। আমরা বিলম্ব করিতে পারিব না।

অ। একটা লোকের জীবন নষ্ট হইবে?

প্রধান পদাতিক সঙ্গীদিগের প্রতি ইঙ্গিত করিল, তাহারা অজিতনাথকে বাঁধিয়া ফেলিল। উমেশ মণ্ডল হাহাকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। তাহার উচ্চ আকুল ক্রন্দনে বসন্তরাণী বাহির হইল, সহসা অজিতনাথকে বন্ধন করিতে দেখিয়া সেও কাঁদিয়া উঠিল,—তাহাদিগের কাঁদিতে দেখিয়া উমেশ মণ্ডলের বালিকা

কন্যাও কাঁদিয়া উঠিল, এবং সেই করুণ ক্রন্দনের মধ্য দিয়া পদাতিকগণ অজিতনাথকে বাঁধিয়া লইয়া চলিয়া গেল।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ।

কাঞ্চননগরে অজিতনাথকে লইয়া গিয়া পদাতিকগণ কৃষ্ণগোবিন্দবাবুর কাছারিতে উপস্থিত করিয়া দিল। ফৌজদারসাহেব সেদিন তথায় উপস্থিত ছিলেন, তাঁহার আদেশে পঞ্চাশ জন সৈন্য দ্বারা আবেষ্টিত হইয়া অজিতনাথ মহারাষ্ট্র-শিবিরে প্রেরিত হইলেন। অজিতনাথ জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলেন না,—তিনি কি অপরাধে বন্দী হইয়া শত্রু-শিবিরে প্রেরিত হইলেন।

মহারাষ্ট্র-শিবির সেখান হইতে প্রায় চল্লিশ ক্রোশ দূরে ছিল। কাজেই তাহাদের গমন করিতে প্রায় তিন দিন লাগিবে।

একদিন বেলা অবসান কালে, তাহারা এক পার্ব্বত্য পথে গমন করিতেছিল। পথশ্রান্তে সকলেই বড় কাতর হইয়া পড়িয়াছিল,—তাই একটি পর্ব্বতের সানুদেশে তাহারা উপবেশন করিল। স্থানটি অতি মনোহর। সম্মুখে ঝঙ্কৃতিময়ী উদার নির্ঝরিণী। তাহার মর্ম্মস্পর্শী চির কলতান, বিহঙ্গমকুলের কমনীয় কণ্ঠস্বরের সুন্দর সম্মিলন, রবিকরসমুজ্জ্বল যৌবন-স্বপ্ন-মগ্ন প্রস্ফুটিত বনফুল শ্যামল-পল্লব-দলশালী সমুন্নতশীর্ষ বন্যবৃক্ষরাজি,আর সেই আশ্রমের নির্জ্জনতা ও পবিত্রতা সৌন্দর্য্য ও শান্তিতে মিশিয়া রহিয়াছে।

যাহাদের হৃদয় মানব-শোণিত দর্শনে প্রীত হয়, তাহারা এ সকল দর্শনে বড় আনন্দিত হইল না, কিন্তু প্রায়াগতা সন্ধ্যার

প্রাক্কালে এই শান্তি-সৌন্দর্য্য দর্শনে অজিতনাথের প্রাণ পুলকে পূর্ণিত হইল, দরধারে অশ্রুবিগলিত হইল।

তখন অন্যান্য সৈন্যগণ একজন মাত্র সৈন্যকে বন্দীর নিকটে রাখিয়া স্বাভীষ্ট সিদ্ধির জন্য চারিদিকে গমন করিয়াছিল।

অজিতনাথ সেই সৈনিকের প্রহরায় শৃঙ্খলিত হস্তে এক দেবদারু-তরুতলে বসিয়া মৃদুস্বরে অনন্যমনে গান গাহিতে-ছিলেন। অনতিদূরে যেন মানব-হস্তবিরচিত একটি উদ্যান। সেই উদ্যানতল প্রক্ষালন করিয়া একটি রজতসলিলা নির্ঝরিণী অবিশ্রাম প্রবাহে ঝর্ ঝর্ শব্দে প্রবাহিতা। অবিশ্রান্ত বারি-প্রবাহে অসংখ্য প্রস্তরখণ্ডের উপরিস্থ মৃত্তিকা বিধৌত হইয়া প্রস্তর বাহির হইয়া পড়ায় উপরিভাগে অনেক গুলি নিম্নরেখা হইয়া গিয়াছে,—তাহার ভিতর দিয়া জলস্রোত প্রবাহিত হই-তেছে। অজিতনাথ যে স্থানে বসিয়া রহিয়াছেন, তাহার পরেই নির্ঝরিণী,—তাহার অপর পারে প্রাগুক্ত উদ্যান।

উদ্যানের অপূর্ব্ব শোভা। অগণ্য—মেশা-মিশি ঠেসা-ঠেসি বৃক্ষবল্লরী। বৃক্ষবল্লরীর পত্র-পুষ্পে অস্তগত সূর্য্যের রক্ত কিরণ আসিয়া পড়িয়াছে, এবং প্রায়াগতা সন্ধ্যার চন্দ্রকিরণ পূর্ব্বদিগ্-ভাগ হইতে আসিয়া অন্যালক্ষ্যে সূর্য্যের কিরণ ঢাকিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিতেছে। ফুলেরা সন্ধ্যার ধীর মারুত সংস্পর্শে প্রস্ফুটিত হইয়া বাস বিলাইতেছিল,—পত্রকুল সমীরণে আন্দোলিত হইয়া বুঝি বা কোথাকার অনুদ্দিষ্ট গাথা শুনিবার জন্য ব্যাকুল হইতে-ছিল। অজিতনাথের গান সমাপ্ত হইলে, উদাস নেত্রে নির্ঝ-রিণীর দিকে চাহিলেন, ক্রমে দৃষ্টি নির্ঝরিণীর উপরিস্থ উদ্যান-মধ্যে প্রবিষ্ট হইল। পর্ব্বতমধ্যে দিবার অবসান-দীপ্ত সময়ে সে

"অজিতনাথ দেখিতে পাইলেন, উদ্যানের একপার্শ্বে এক কুসুম-কুঞ্জ বল্লরী হইতে এক অপূর্ব্ব সুন্দরী রমণী সান্ধ্য ফুল্ল কুসুম চয়ন করিতেছে।"

(প্রেত-তর্পণ ৬৯ পৃষ্ঠা।)

শোভা সমস্ত হৃদয়মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া মধুর ভাব জাগাইয়া দিতে-ছিল,—অজিতনাথ এক দৃষ্টে সে দিকে চাহিয়া চাহিয়া সে শোভা প্রাণ ভরিয়া দেখিতেছিলেন।

সহসা—সহসা এক অপরূপ দৃশ্য অজিতনাথের নয়ন-পথে পতিত হইল। অজিতনাথ দেখিতে পাইলেন, উদ্যানের এক-পার্শ্বে এক কুসুম-কুণ্ডলা বল্লরী হইতে এক অপূর্ব্ব সুন্দরী রমণী সান্ধ্য ফুল্ল কুসুম চয়ন করিতেছে। রমণী যুবতী,—যৌবনের অপূর্ব্ব মাধুরীমা সেই বরবপু হইতে স্বপ্ন সুষমা বিকীর্ণ করিতে-ছিল। তেমন অপ্সরানিভ সৌন্দর্য্য, তেমন সুরবালা সদৃশ দীপ্তি, তেমন মানবীর ন্যায় কমনীয়তা একত্রে—একাধারে অজিতনাথ বুঝি কখনও দর্শন করেন নাই।

অজিতনাথের মনে হইল, এ সৌন্দর্য্য-প্রতিমা, এ দেববালা এ নির্জ্জন পর্ব্বতপ্রান্তে কোথা হইতে আসিল? তবে কি এ অপ্সরা হইবে? অপ্সরা কি দেখা যায়? দেববালা হইতে পারে না কি? কিন্তু নয়নে ভ্রূভঙ্গী থাকিত না। মানবী কোথা হইতে আসিবে? যদি মানবীই হয়,—তবে এ অসাধারণ মানবী।

আকর্ষণ এক প্রবলা শক্তি। অজিতনাথ এক দৃষ্টে অনন্য মনে চাহিয়াছিলেন—বুঝি বা চিত্ত তখন একমুখীও হইয়াছিল, অজিতনাথের মনে হইল, রমণীও যেন তাহার দিকে একবার চাহিল,—একবার দুইবার তিনবার চাহিল—চাহনী করুণাপূর্ণ। তারপর,—তারপর অজিতনাথ আর তাহাকে দেখিতে পাইলেন না,—কোন্ পথে, কোন্ রাজ্যে সে চলিয়া গেল, অজিতনাথ তাহা বুঝিতে পারিলেন না। নিকটে কোন গৃহাদি বা মনুষ্য

বাসের কোন প্রকার সন্ধানও প্রাপ্ত হইলেন না। ততক্ষণ সৈনিক-গণও আসিয়া যুটিয়া পড়িল, এবং বন্দী অজিতনাথকে উঠাইয়া লইয়া তাহারা গমন করিল।

পথিমধ্যে সন্ধ্যা হইল, সে দিন পূর্ণিমা তিথি,—পূর্ণিমার পূর্ণচন্দ্র রজতকিরণে জগৎ প্লাবিত করিয়া উদিত হইলেন। সেই জ্যোৎস্না-সাগরে ভাসিতে ভাসিতে সেই রমণীর বিষয় চিন্তা করিতে করিতে অজিতনাথ সৈনিকবৃন্দে আবেষ্টিত হইয়া গমন করিতে লাগিলেন।

তৎপর দিবস মধ্যাহ্নকালে সৈন্যগণ মহারাষ্ট্র-শিবিরে অজিত-নাথকে পঁহুছাইয়া দিয়া বিদায় লইল। তাহারা অজিতনাথকে বিশেষভাবে বন্দী করিয়া রাখিল।

বৈকালবেলা সর্দ্দারের আজ্ঞায় অজিতনাথকে সর্দ্দারের সম্মুখে উপস্থিত করা হইল। সর্দ্দার তাঁহার সর্ব্বাবয়ব উত্তমরূপে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলেন,—দেখিলেন, সেবারে তাঁহাকে যেমন ভাবে দর্শন করিয়াছিলেন, এবারও সেই প্রফুল্ল শ্রী। মুখের সেই সাহস প্রশান্ত ভাব। সর্দ্দার বলিলেন,—"তুমি ভণ্ড। আমাকে প্রতারণা করিয়াছিলে, কিন্তু এবার তোমার রক্ষা নাই।"

অজিতনাথ বলিলেন,—"ভগবান্ যেমন ব্যবস্থা করিবেন, তেমনই হইবে।"

স। ভগবান্ এবার তোমার জন্য ভীষণ শূলের আঘাতে মৃত্যু ব্যবস্থা করিয়াছেন।

অ। যদি সে ব্যবস্থা তাঁহার অভিলষিত হয়, তাহাই হইবে।

স। বচনে তুমি সাধু, কিন্তু আচরণে অতি নীচ।

অ। আপনি যেমন বুঝিতেছেন, তাহাই।

স। মহারাষ্ট্র নামে তোমার হৃদয় কাঁপে না কি?

অ। মহারাষ্ট্র যাঁহার সৃষ্টরাজ্যের বালুকাকণা, বাঙ্গালীও তাঁহারই সৃষ্টরাজ্যের বালুকাকণা—তার জন্যে কে কার ভয় করে?

স। এখন তুমিত সেই মহারাষ্ট্রীয়-বালুকাকণার হস্তে বিনষ্ট হইলে?

অ। আমার বিনাশ নাই—জড়দেহের নাশ হইবে। কেহ অস্ত্রাঘাতে মরে, কেহ ব্যাঘ্রাদি হিংস্রজন্তুর দ্বারা মরে, কেহ জলে ডুবিয়া মরে, কেহ গাছ হইতে পড়িয়া মরে, কেহ বিষ খাইয়া মরে, কেহ গলায় দড়ী দিয়া মরে। আমার যদি এইরূপ মৃত্যুর বিধান থাকে,—আমি এই রূপেই মরিব।

স। তবে তাহাই।

তৎপরে পার্শ্বস্থ অনুচরকে আজ্ঞা প্রদান করিলেন,—"আগামী কল্য সন্ধ্যার সময় এই হতভাগ্যকে শূল দ্বারা হত্যা করিও, এবং ইহাকে সেই সময় পর্য্যন্ত সবিশেষ সাবধানে রক্ষা করিও।"

অনুচর শৃঙ্খলিত অজিতনাথকে লইয়া চলিয়া গেল। অজিতনাথ যে প্রসন্নভাব লইয়া আসিয়াছিলেন; যাইবার সময়েও তদ্রূপ প্রসন্নতা লইয়া গেলেন।

—

ষড়্বিংশ পরিচ্ছেদ।

কি উদ্দেশ্যে বিশ্বস্রষ্টা আমাদের এই ধূলার জগৎ গড়িয়াছেন, তাহা তিনিই জানেন। জন্ম, মৃত্যু ও বিকাশ, এখানে পরে পরে সাজান। সুখ, দুঃখ, উন্নতি, অবনতি ইহার ভিত্তিগাত্রে প্রতিষ্ঠিত। আ'জ যাহা বিপুলজনপদশালী নগর, কা'ল তাহা নরকঙ্কালপূর্ণ মহাশ্মশান। আ'জ যে যৌবনের উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খল উৎসাহময় যুবক, কা'ল সে জরাগ্রস্ত ভগ্নাশ যুবক। আ'জ যে ইন্দ্রিয়-সংযমী ব্রহ্মনিষ্ঠ পুণ্যবান্, কা'ল সে মহাপাতকের নিরয়-গামী পাপী। আবার শ্মশান নগরে পরিণত হইতেছে, বৃদ্ধ মরিয়া যুবক হইতেছে, পাপী পুণ্যময় জীবন লাভ করিতেছে,—তাই বলিতেছিলাম জন্ম, মৃত্যু ও বিকাশ এখানে পরে পরে সাজান। সুখ, দুঃখ, উন্নতি, অবনতি ইহার ভিত্তিগাত্রে প্রতিষ্ঠিত।

সংযমী কৃষ্ণগোবিন্দবাবু পুণ্য ও পাপ, উন্নতি ও অবনতির মধ্যস্থলে পড়িয়া দিশেহারা হইয়াছিলেন। তাঁহার আহারে সুখ ছিল না, ভ্রমণে শান্তি ছিল না, কথোপকথনে প্রবৃত্তি ছিল না, ধর্ম্ম-কর্ম্মে আস্থা ছিল না। পাপপুণ্যের সন্ধিক্ষণে পড়িয়া তিনি ছট ফট করিতেছিলেন।

তাঁহার চিন্তা সহজ নহে। একদিকে বিষয়-সম্পত্তি মান-সম্ভ্রম এবং জীবন; অপর দিকে নীতি ও ধর্ম্ম;—ইহকাল ও পরকাল।

সন্ধ্যার পরে তর্কালঙ্কার ঠাকুরকে লইয়া কৃষ্ণগোবিন্দবাবু পরামর্শ করিতেছিলেন। এমন পরামর্শ আ'জ দশ দিন হইতে

হইতেছিল। কিন্তু আর কেবল পরামর্শ করিয়া চলে না।—ফৌজদার সাহেবের প্রথম কিস্তির টাকা দিবার দিন সমাগত, প্রথম কিস্তিতে যে টাকা দিতে হইবে,—তাহাও তাঁহার সংস্থান নাই। টাকা সংগ্রহ করিতে হইলে অত্যাচারের আগুণে দেশ দগ্ধ করিতে হইবে, প্রজার বুকে বংশদণ্ড চাপাইতে হইবে। নীতি, ধর্ম্ম দয়া, মনুষ্যত্ব পদে দলিত করিতে হইবে।

কৃষ্ণগোবিন্দবাবু বলিলেন,—"ঠাকুর, আর আপনার কথা শুনিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি না। আগামী সপ্তাহের মধ্যে প্রথম কিস্তির টাকা ফৌজদার সাহেবের নিকট না পাঠাইলে আমার দশা কি হইবে, তা জানেন কি? নিজের প্রাণদণ্ড—স্ত্রী কন্যা প্রভৃতির সতীত্ব ও জাতি নাশ। আপনার পরামর্শ ও শাস্ত্রবাক্য তুলিয়া রাখুন,—আমি দেশে অত্যাচারের অনল জ্বালিয়া টাকা সংগ্রহ করি।"

তর্কালঙ্কার ঠাকুর বিষণ্ণ বদনে গম্ভীর স্বরে বলিলেন,—"তুমি তাহা পারিবে?"

কৃ। নিশ্চয় পারিব। মানুষ একদিনে পিশাচ হইতে পারে না। কিন্তু আমি চিন্তা-আগুনে পুড়িয়া পুড়িয়া পিশাচ হইয়াছি। এখন এই পৈশাচিক তাণ্ডবে দেশ উচ্ছিন্ন দিব—দেশের নর নারীকে অত্যাচারের আগুনে দগ্ধ করিয়া টাকা সংগ্রহ করিব।

ত। মানুষ কেবল ইহ জীবনের জন্যে নয়।

কৃ। তা জানি,—কিন্তু ইহ জীবন অন্তে পর জীবন। তা' আছে কিনা তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণও নাই;—হয়ত বা এই জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই সকলের শেষ হইবে। কখন কি হইবে, কে বলিতে

পারে,—এখন স্ত্রী-কন্যা ও পুরস্ত্রীগণের লাঞ্ছনা অপমান দেখিতে পারিব না।

ত। ধর্ম্মই ধার্ম্মিককে রক্ষা করিয়া থাকেন। তুমি যদি ধর্ম্মপথ পরিত্যাগ না কর, তোমার অনিষ্ট কে করিবে?

কৃ। মিছে কথা,—কত লোককে দেখিলাম, ধর্ম্মরক্ষা করিতে গিয়া মুসলমানের তরবারিতে মহারাষ্ট্রীয়ের শূলে জীবন হারাইয়াছে।

ত। জীবন হারাইলেই সকলের শেষ হয় না। কিন্তু ধর্ম্ম হারাইলে দুর্গতির একশেষ।

কৃ। আর না তর্কালঙ্কার ঠাকুর; আর দিন নাই। এখন হইতে উদ্যোগ না করিলে টাকা সংগ্রহ হইবে না।

তর্কালঙ্কার দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন। কৃষ্ণগোবিন্দবাবুর রক্তচক্ষু জ্বলিয়া উঠিল। তিনি অস্বাভাবিক স্বরে বলিলেন,—"ঠাকুর, তোমার দীর্ঘশ্বাসে আমার প্রাণের ক্ষতে বিষম বেদনা লাগিয়াছে। জানি আমি অধঃপাতের নিম্নতর গুহায় নামিয়া পড়িয়াছি,—কিন্তু উপায় নাই, ঐ দেখ, মুসলমানের শাণিত কৃপাণ আমার গলদেশ স্পর্শ করিয়া রহিয়াছে;—ঐ দেখ মহারাষ্ট্রীয়ের ভীষণ শূল আমার বক্ষের উপরে উপস্থিত হইয়া পড়িয়াছে। আর না ঠাকুর;—এ মহাপাপীর নিকটে আর আসিও না। আমি রাত্রি প্রভাতে পিশাচমূর্ত্তি ধরিয়া টাকা সংগ্রহ করিতে থাকিব।"

তর্কালঙ্কার আরও নানাপ্রকারে বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কৃষ্ণগোবিন্দবাবু বুঝিলেন না। তিনি বলিলেন,—"জীবিত থাকিয়া শাণিত কৃপাণকে আহ্বান করিব না। জীবিত থাকিয়া

পুরস্ত্রীগণের অপমান সহ্য করিতে পারিব না। পরকাল পরের কথা,—ইহকাল গেলে পরকাল লইয়া কি হইবে? ঠাকুর, মানুষ মানুষ হইয়াই জন্ম-গ্রহণ করে, কিন্তু সমাজ ও সামাজিক ঘটনা তাহাকে পশু করিয়া তোলে। প্রতিবাসী দ্বিতলসৌধে বসিয়া ক্ষীর-সর নবনীত খাইতেছে দেখিয়া মানুষ সদ্‌ভাবে তাহার সমকক্ষ হইতে না পারিলে পশু সাজিয়া অর্থ উপার্জ্জন করে। ধনী দরিদ্রকে অবহেলা করে বলিয়াই সে অসৎপথে পা দিয়া ধনী হইবার জন্য চেষ্টা করে। ক্ষুধার্ত্তকে একমুঠা অন্ন দিতে সঙ্গতিপন্ন লোকে কৃপণতা করে বলিয়াই সে দস্যু-তস্কর হয়।"

তর্কালঙ্কার ঠাকুর বুঝিলেন, অত্যাচারের আগুনে কৃষ্ণগোবিন্দ-বাবুর হৃদয়স্থ সদ্‌বৃত্তি পুড়িয়া গিয়াছে,—এখানে এখন কোন তর্কই খাটিবে না। তিনি আরও বুঝিলেন, এ ধনলোলুপ-হৃদয়ে যথার্থ ধর্ম্মজ্ঞান,—ধর্ম্মের দৃঢ়তা ছিল না। যাহা ছিল, তাহা নীতি-মাত্র—অত্যাচারের বিভীষিকায় এখন মোহময় অন্ধকার হইয়া গিয়াছে। ভগবান্‌ই জানেন, ইহার পতন কতদূর!

তখন তর্কালঙ্কার ঠাকুর অতি ম্লান মুখে সেখান হইতে চলিয়া গেলেন, এবং ধীরে ধীরে অন্দর মহলে প্রবেশ করিলেন।

কিয়দ্দূর গমন করিতেই বিশাখার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। পার্শ্বস্থ গৃহভিত্তির আলোকে তর্কালঙ্কার ঠাকুর দেখিলেন,—বিশাখার রূপে যেন কি এক জ্যোতির অনল ঝলকে ঝলকে বাহির হইতেছিল। সে রূপের দহনকারী তীব্র জ্যোতি দেখিয়া প্রৌঢ় তর্কালঙ্কার ঠাকুর চমকিয়া উঠিলেন। বলিলেন,—"বিশাখা, এখন বোধ হয় আর তোমার কোন কষ্ট নাই?"

বিশাখা ঢিপ করিয়া এক প্রণাম করিল। তারপরে উঠিয়া

দাঁড়াইয়া মৃদু বচনে বলিল,—"ঠাকুর, দাসীর আবার কষ্ট কি ? যে পরের অধীন—তাহার কষ্ট আর সুখে প্রভেদ কি ?"

আলোক সাহায্যে তর্কালঙ্কার দেখিলেন, তাহার দীর্ঘায়ত কৃষ্ণতার নয়ন জলে পূর্ণ হইয়াছে। তর্কালঙ্কার ঠাকুর কারণানুসন্ধিৎসু হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"বিশাখা, এখনও তোমাকে কি স্বাধীনতা দেওয়া হয় নাই ?"

বিশাখা কষ্টোচ্চারিত স্বরে বলিল,—"না।"

ত। কেন, এইত স্বচ্ছন্দে বেড়াইয়া বেড়াইতেছ।

বি। বাড়ীর বাহির হইবার উপায় নাই,—তাও একজনের সঙ্গে।

ত। এখনত একা দেখিতেছি ?

বি। জামাইবাবু আসিয়াছেন,—তাঁহারই জন্য ভাঁড়ার হইতে কোন একটা দ্রব্য আনিতে যাইতেছি।

ত। এই অধীনতায় কোন কষ্ট অনুভব কর কি ?

বি। সে কথা কেন ঠাকুর ? যে পরান্নে প্রতিপালিত, তাহার এ সামান্য অধীনতায় কষ্ট কি ?

ত। তুমি এ কথা সত্য বল নাই, বিশাখা। তোমার চোখে জল দেখিয়াছি।

বি। ঠাকুর আমি স্ত্রীলোক—পরান্নে প্রতিপালিতা, ইহাতে আমার অন্য কষ্ট আর কি হইতে পারে ? কিন্তু অপমান-বিষে আমার দেহ দগ্ধ হইয়া যাইতেছে। সমস্ত দাসদাসীগণ আমার অবস্থা দেখিয়া হাস্য করিয়া থাকে ! আমি মরিয়া এজ্বালার হস্ত হইতে উদ্ধার পাইতে চেষ্টা করি,—কিন্তু সর্ব্বদাই আমার প্রতি কঠোর পাহারা।

ত। আমি তোমাকে এতদিন মুক্তি করাইতে পারিতাম, কিন্তু কৃষ্ণগোবিন্দ আর সে কৃষ্ণগোবিন্দ নাই,—এখন তিনি আর এক প্রকারের হইয়াছেন।

বি। ঠাকুর, আমি আর সহ্য করিতে পারিতেছি না।

ত। বিশাখা, তুমি বুদ্ধিমতী। কদাচ যেন পলায়ন করিও না,—তোমার রূপ-যৌবন বর্ত্তমান। বাহির হইলে বিষম কষ্টে পতিত হইবে।

বিশাখা সেকথার কোন উত্তর করিল না। তর্কালঙ্কার ঠাকুর ভাবিলেন, লজ্জা বশতই সে কথার উত্তর করে নাই। তখন তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কর্ত্তা ঠাকুরাণী কোথায়?"

বিশাখা বলিল,—"সম্মুখের ঘরের উপরের ঘরে। সেখানে জামাইবাবু আছেন।"

তর্কালঙ্কারের সর্ব্বত্রই অবারিত দ্বার। তিনি হন হন করিয়া নির্দ্দিষ্ট কক্ষে গমন করিলেন।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ

গৃহমধ্যে স্ফটিকাধারে সুগন্ধি তৈলে তিন চারিটি দীপ জ্বলিতেছিল। এক খানি মসলন্দের সুন্দর আসনে জামাইবাবু বসিয়াছিলেন। একটু দূরে—সেই গৃহে মূল্যবান্ প্রস্তরের মেঝের উপর কর্ত্রী ঠাকুরাণী ওরফে কৃষ্ণগোবিন্দবাবুর স্ত্রী বসিয়াছিলেন, তাঁহার পার্শ্বে নীরদা ও আরও তিন চারি জন স্ত্রীলোক বসিয়াছিল। জামাইবাবু শ্বাশুড়ীর সহিত কথোপকথন করিতেছিলেন। কথা কৃষ্ণগোবিন্দবাবুর বৈষয়িক ব্যাপার লইয়াই হইতেছিল।

তর্কালঙ্কার ঠাকুর সেখানে প্রবেশ করিলে কর্ত্রী ঠাকুরাণী প্রণাম করিলেন, এবং স্বহস্তে সকলের সম্মুখের দিকে একখানি সুন্দর আসন পাতিয়া দিলেন,—তর্কালঙ্কার তাহাতে উপবেশন করিলে জামাইবাবুও প্রণাম করিলেন। জামাইবাবুর নাম মোহনলাল।

তর্কালঙ্কার আশীর্ব্বাদ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"মোহন লাল, কবে আসা হইয়াছে বাবা? একটু স্থানান্তরে গিয়াছিলাম বলিয়া, আ'জ সাত দিন এবাড়ী আসি নাই।"

মোহনলাল ভ্রুকুটীভঙ্গী করিয়া বলিলেন,—"আমি আ'জ তিন দিন হইল আসিয়াছি।"

কর্ত্রী ঠাকুরাণী বলিলেন,—"জামাইকে সংবাদ দিয়া আনিয়াছেন। আপনিত জানেন ঠাকুর, ফৌজদার সাহেবের অন্যায় আদেশে কর্ত্তা বড়ই বিব্রত হইয়া পড়িয়াছেন। প্রজাদের নিকট হইতে অন্যায় করিয়া—জোর করিয়া সেই টাকা আদায় করিতে

হইবে। সকল কর্ম্মচারীকে সমান বিশ্বাস করা যায় না,—তাই জামাইয়ের উপর সেই ভার অর্পণ করিতে চাহেন। আমরা এতক্ষণ সেই কথারই আলোচনা করিতেছিলাম।"

তর্কালঙ্কার বুঝিলেন, উপযুক্ত পাত্রকেই কার্য্যভার অর্পণ করা হইতেছে। যেমন কার্য্য, তেমনি পাত্র। তিনি কৃষ্ণগোবিন্দ বাবুর জামাতা মোহনলালকে চিনিতেন। মোহনলাল ইন্দ্রিয়ের দাস, অর্থপিশাচ ও মদ্যপায়ী।

তর্কালঙ্কার ঠাকুর বলিলেন,—"মা, আমিও সেই কথা জানিবার জন্য আপনার নিকটে আসিয়াছি।"

ক। কি জানিবেন, ঠাকুর?

ত। অন্য কিছুই নয়;—আপনি সকল কথা শুনিয়াছেন, কি না, তাহাই জানিতে আসিয়াছি।

ক। হাঁ, আমি সব কথাই শুনিয়াছি।

ত। আপনি কি শুনিয়াছেন যে, আপনার অসহায় প্রজাগণের বুকে বংশদণ্ড নিক্ষেপ করিয়া, তাহাদিগকে অপমানের আগুনে বিদগ্ধ করিয়া, তাহাদিগের সাধ্যাতীত অর্থ—তাহাদিগের নিকট হইতে আদায় করার আয়োজন হইতেছে?

ক। তাহা স্পষ্টরূপে না শুনিলেও, আভাষে বুঝিতে পারিতেছি।

ত। তাহার কি প্রতিবিধান করিতেছেন?

ক। আমি স্ত্রীলোক,—আমি তাহার কি প্রতিবিধান করিতে পারিব, ঠাকুর?

ত। আপনি প্রতিবিধান না করিলে, কে করিবে মা? আপনি এ বংশের লক্ষ্মী।

ক। কিন্তু টাকা আদায় না হইলে আমাদিগকে সবংশে মজিতে হইবে।

ত। আর অত্যাচারিতের দীর্ঘশ্বাসে, বিপন্নের অভিশাপে আপনার বংশ যে, নিরয়ের নিম্নস্তরে যাইবে, তাহার কি কোন ভাবনা ভাবিতেছেন না?

ক। অত্যাচার কি এখনই হইবে?

ত। অত্যাচার? মা, বঙ্গে এখন অত্যাচারের পূর্ণ জোয়ার। রাজা বিদেশী—অর্থ শোষণই তাহার উদ্দেশ্য। বিপুলবলশালী মহারাষ্ট্র জাতি অর্থের জন্য বাঙ্গালার মানুষ গুলাকে কলা-কচুর মত করিয়া কাটিতেছে। বাধা দিবার শক্তি কাহারও নাই, কথা কহিবার ক্ষমতা কাহারও নাই। যাহাদের আছে—তাহারা ধনলোভী ও হৃদয়হীন। তার উপরে যদি জমিদারগণ অত্যাচার করিতে উদ্যত হন, তাহাদের কর্ম্মচারিগণ অত্যাচার করিতে আদিষ্ট হন,—তবে—সোণায় সোহাগা হইবে।

কথা শুনিয়া কর্ত্রী ঠাকুরাণী বড় চিন্তান্বিত হইলেন। তাঁহার সমস্ত মুখখানা যেন বর্ষার মেঘে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। মোহনলাল চক্ষু ঘুরাইয়া বলিল,—"ঠাকুর, জমিদারী করা এক, শাস্ত্র পড়া আর এক। আপনাদের ওসকল কথা পূজোর সময়, নয় শ্রাদ্ধের সময় ভাল লাগে,—এ সময় নয়।"

তর্কালঙ্কার ঠাকুর সে কথার কোন উত্তর করিলেন না। চাতক যেমন মেঘের দিকে চাহিয়া থাকে, তর্কালঙ্কার ঠাকুর তেমনি কর্ত্রী ঠাকুরাণীর মুখের দিকে চাহিয়া থাকিলেন। অনেকক্ষণ কেহ কথা কহিল না। কর্ত্রী ঠাকুরাণী একান্তে অনেকক্ষণ চিন্তা করিলেন।

প্রতিভা কখনও স্ফুটে, কখনও নিভে। কিন্তু মেঘ বর্ষিল না,—চাতকের তৃষ্ণা ভাঙ্গিল না। কেবল এক বজ্রনির্ঘোষ হইল,—চাতক প্রাণভয়ে পলাইয়া গেল। কর্ত্রী ঠাকুরাণী বলিলেন,—"আমি তাহার কি করিব, বিষয় কাজে নারীজাতি কি বুঝে।"

তর্কালঙ্কার দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া উঠিয়া চলিয়া গেলেন।

কর্ত্রী ঠাকুরাণী জামাতাকে বলিলেন,—"বাবা সব কথা শুনিয়াছ?"

মোহনলাল ব্যঙ্গের হাসি হাসিয়া বলিলেন,—"বৃদ্ধ পুরোহিত ব্রাহ্মণের কথা শুনিবার এ সময় নয় মা।"

কর্ত্রী আবেগ-কারুণ্যকণ্ঠে কহিলেন,—"বাবা, তুমিই তোমার শ্বশুরের দক্ষিণহস্ত। যাতে ধর্ম্ম বজায় থাকে, তাহাই করিয়া কাজ করিও।"

মোহনলাল মুরুব্বির হাসি হাসিয়া বলিল,—"আপনি বিচলিত হইবেন না। আমরা বুঝিয়াই কাজ করিব।"

তখন কর্ত্রী ঠাকুরাণী বিপদ্‌বারণ ভগবান্‌কে মনে মনে ডাকিতে ডাকিতে নীচের নামিয়া গেলেন। এই সময় বিশাখা আদিষ্ট দ্রব্য লইয়া সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল।

মোহনলাল একবার লালসাপূর্ণ কটাক্ষে বিশাখার মুখের দিকে চাহিলেন,—বিশাখা সরিয়া গেল।

নীরদা বিশাখাকে আপনাদের নিকটে ডাকিয়া বসিতে বলিল। বিশাখা একটু বসিল।

মোহনলাল জলযোগ সমাপ্ত করিলেন। নীরদা প্রভৃতি উঠিয়া চলিয়া গেল,—বিশাখাও নামিয়া নীচেয় গেল।

বিশাখা সেইদিন হইতে বাড়ীর মধ্যে আবদ্ধস্বরূপে ছিল। সে স্বাধীন ভাবে কোথাও যাইতে পারিত না। বাড়ীর মধ্যে থাকিলেও কৃষ্ণগোবিন্দবাবুর আদেশে সমস্ত দাসদাসীগণ তাহার উপরে প্রখর দৃষ্টি রাখিত। রাত্রে সে এক নির্দ্দিষ্ট কক্ষে শয়ন করিত,—সে গৃহ দৃঢ় চাবিদ্বারা আবদ্ধ হইত। প্রভাত হইলে খুলিয়া দেওয়া হইত। কৃষ্ণগোবিন্দবাবু বিচার করিয়া এইরূপ বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। তাঁহার ধারণা হইয়াছিল, বিশাখা যে জন্যই দুর্গদ্বারে যাউক, এরূপ বন্দোবস্তে সে আর বাহিরে যাইতে পারিবে না,—কাজেই তাহার দ্বারা আর অনিষ্টের সম্ভাবনা থাকিবে না।

বিশাখা জামাইবাবুর গৃহ হইতে একেবারে তাহার নির্দ্দিষ্ট কক্ষে গিয়া উপস্থিত হইল। একজন পরিচারিকা আসিয়া বলিয়া গেল,—"তুমি এখন আর বাহির হইও না। আহারান্তে আসিয়া দ্বার বন্ধ করিয়া দিব। আমার উপরে তোমার দৃষ্টি রাখিবার ভার পড়িয়াছে, কিন্তু জামাইবাবুর একটি কাজের ভার আমার উপরে পড়ায়, আমি স্থানান্তরে গেলাম।"

প্রাচীন পরিচারিকা চলিয়া গেলে, দরোজা ভেজাইয়া দিয়া বিশাখা শয্যায় গিয়া শয়ন করিল। শুইয়া পড়িয়া ভাবিতে লাগিল,—এমন করিয়া আর কতদিন কাটাইব! এ অপমান সহ্য করিয়া আর কতদিন থাকিব! কৃষ্ণগোবিন্দবাবু আমার প্রতিপালক মাত্র,—সম্পর্কে কেহ নহেন। আমার উপরে তাঁহার অবিশ্বাস হয়, আমাকে ভাল বলিয়া না বুঝিতে পারেন,—তাড়াইয়া দিতে পারেন। এরূপ যন্ত্রণা দিয়া, এরূপ অবমান করিয়া রাখিবার তিনি কে?

বিশাখার মনে হইল, আগে তাঁহাকে পিতার মত ভাবিতাম, কিন্তু এখন আর তাঁহার উপর আমার তেমন ভক্তি নাই,—এমন যন্ত্রণা দিলে কার ভক্তি থাকে? সেদিন তাঁহার নিকটে সে কথা বলিয়াছিলাম,—আমাকে না হয়, তাড়াইয়া দিন, এমন যন্ত্রণায় আর থাকতে পারি না। কিন্তু তাহাতেও তিনি রাগ করিলেন,—বলিলেন, এইরূপ আবদ্ধ অবস্থায় জীবন কাটাইতে হইবে। ছাড়িয়া দিলে স্বচ্ছন্দে আমার সর্ব্বনাশ সাধন করিতে পারিবে! তবে কি যথার্থই আমার জীবন এইরূপে যাইবে! এ রূপ, এ যৌবন,—ইহা কি বৃথায় যাইবে!

আগেকার বিশাখা, আর এখনকার বিশাখা সম্পূর্ণ পৃথক্। যন্ত্রণায়—অপমানে তাহার হৃদয় অন্যপ্রকার হইয়া গিয়াছে। মনুষ্যত্ব প্রেতত্বে পরিণত হইয়াছে।

ঝন্ করিয়া গৃহদ্বার সরিয়া গেল। বিশাখা তাড়াতাড়ি গিয়া দেখিল, মোহনলাল গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। বিশাখা চকিতচাঞ্চল্য-নয়নে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া, কম্পিতকণ্ঠে বলিল,—"জামাইবাবু, আপনি এখানে কেন?"

মোহনলাল মৃদু হাসিয়া বলিলেন,—"আসিতে কি নাই?"

বি। আমি হতভাগিনী বন্দিনী,—আপনাদের দাসী। আমার ঘরে আপনি কেন আসিবেন? একেই আমার মস্তকে মিথ্যা কলঙ্কের ডালি বসিয়াছে,—আপনাকে আমার ঘরে দেখিলে লোকে কি বলিবে?

মো। কিছু বলিবে না। তোমার অধীনতা দূর হইবে। বিশাখা, আমি তোমাকে ভালবাসি। আমাকে কৃপা কর।

বিশাখা বলিল,—"আপনি কি বলিতেছেন? আমি সমস্ত

কথাবার্ত্তা মাকে বলিয়া দিব। আপনি এখনই এখান হ'তে চলিয়া যান,—নতুবা আমি চীৎকার করিয়া সকলকে ডাকিব।"

মো। শোন বিশাখা, আমিই এখন আমার শ্বশুরের দক্ষিণ-হস্ত স্বরূপ। নানাবিধ দুশ্চিন্তায় আমার শ্বশুরের মাথা খারাপ হইয়া গিয়াছে,—তুমি যদি আমার হও, আমি তোমাকে পরম সুখে রাখিব। ভাল, আজ তোমাকে সময় দিলাম,—কা'ল আমাকে বলিও। বিশাখা, তুমি আমার হও—আমি চিরদিন তোমাকে যত্নে রাখিব।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ।

কৃষ্ণগোবিন্দবাবু সংসারের কুটিলতা-লৌহ-পেষণে জীবন্ত প্রেত মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন। ফৌজদার সাহেবের টাকা সংগ্রহের জন্য তাঁহার জামাতাকে প্রধান কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিয়া দিয়াছেন। জামাতা মোহনলাল্ স্বভাবতই চরিত্রহীন ও নিষ্ঠুর;—তাহাতে জমিদার কর্ত্তৃক যথেচ্ছাচারের ভার প্রাপ্ত হইয়া তিনি অত্যাচারের পূর্ণ বিগ্রহ সাজিয়া বসিয়াছেন।

মোহনলালের অধীনে প্রায় একশত গোমস্তা নিযুক্ত হইয়াছে। প্রতি গোমস্তার অধীনে প্রায় একশত করিয়া সশস্ত্র পাইক নিযুক্ত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এক একজন গোমস্তা আটদশখানি করিয়া গ্রামের প্রজাগণের নিকট অর্থাদায়ের ভার প্রাপ্ত হইয়াছে। তাহারাও এক একজন অত্যাচারের জ্বালাময় অগ্নিস্ফুলিঙ্গ।

প্রজাগণের গৃহজাত শস্য, সঞ্চিত অর্থ সমস্ত লুণ্ঠিত হইতে লাগিল। লাঙ্গলের গরু, পালিত মেষ মহিষ দলে দলে ঘিরিয়া আনিয়া অর্দ্ধমূল্যে সিকিমূল্যে বিক্রয় করা হইতে লাগিল। যাহার সর্ব্বস্ব কাড়িয়া লওয়া হইল,—তাহাকে আবার অর্থ দিবার জন্য পীড়ন করা হইতে লাগিল। মোহনলালের অত্যা-চারে, গোমস্তাগণের অত্যাচারে, পাইকগণের ইন্দ্রিয়-অনলে সুন্দরী রমণীগণের সতীত্ব রক্ষা করা দায় হইয়া উঠিল। ঘরে ঘরে হাহাকার, গ্রামে গ্রামে আর্ত্তনাদ,—দেশব্যাপী চীৎকার। প্রজাগণ দলে দলে কৃষ্ণগোবিন্দবাবুর বাড়ী গিয়া উপস্থিত হইয়া অশ্রুজলে তাঁহার চরণতল বিধৌত করিতে লাগিল, কিন্তু তিনি নির্ব্বাক্—যেন জড়মূর্ত্তি। কাহারও আর্ত্তনাদ, কাহারও হাহা কার, তিনি শুনিলেন না, কাহারও নয়নাশ্রু চাহিয়া দেখিলেন না। অধিকন্তু প্রজাগণকে ধমকাইয়া দূর করিয়া দিলেন। তাহারা তাঁহার বাড়ীর পার্শ্বে পড়িয়া করুণ ক্রন্দনের রোল তুলিয়া দিল।

প্রজাগণের সেই হাহাকার শুনিয়া,—সেই বক্ষোবিদারী করুণ-আর্ত্তনাদ শুনিয়া তর্কালঙ্কার ঠাকুর অত্যন্ত ব্যথিত হইলেন। তিনি বিপদ-ভঞ্জন মধুসূদনের নাম গান করিতে করিতে কৃষ্ণ-গোবিন্দবাবুর বাড়ীর মধ্যে কর্ত্রী ঠাকুরাণীর নিকটে গমন করিলেন। তখন বেলা প্রহরাতীত।

কর্ত্রী ঠাকুরাণী স্নান করিয়া আসিয়া তখন আহ্নিকের ঘরে শিবপূজা করিতেছিলেন। তর্কালঙ্কার ঠাকুর তথায় গিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং দুঃখাবেগ-কম্পিত অভিমান-দৃপ্তস্বরে বলিলেন,—"মা, মিছে মাটীর শিব পূজা করিয়া আর কি করিবে? তোমার

স্বামী, জামাতা পিশাচ হইয়াছে—তুমি দেবপূজা করিতে অধিকারিণী কোথায়? ফেলিয়া দাও মা, তোমার মাটীর শিব, ফেলিয়া দাও। শতলক্ষ শিবপূজাতেও তোমার ইষ্টলাভ হইবে না। তুমি কি শোন নি—'যত্র জীবঃ তত্র শিবঃ।' জীবে জীবে শিব—আজি সহস্র সহস্র জীবের হৃদয়ের শান্তি ভাঙ্গিয়া দিতেছ, সহস্র সহস্র শিবের নয়নের জল টানিয়া আনিতেছ,—তবে কেন মিথ্যা শিব গড়ান? তবে কেন মিথ্যা মন্ত্র আওড়ান? তবে কেন মিথ্যা পুষ্পবিল্বদল সংগ্রহ।

কর্ত্রীঠাকুরাণী উঠিয়া তর্কালঙ্কারের চরণে প্রণাম করিয়া বলিলেন,—"ঠাকুর, উপায় কি? আমি কতক কতক শুনিতে পাইতেছি। উপায় কি? কর্ত্তার বুঝি জ্ঞান শক্তি বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। আপনি এবংশের কুলপুরোহিত—যাহাতে হিত হয়, তাহা করুন।"

তর্কালঙ্কার ঠাকুর বলিলেন,—"তর্কালঙ্কারের কথা শুনিয়া কৃষ্ণগোবিন্দবাবু কাজ করিবেন, সে দিন গিয়াছে। এখন তোমার জামাতা মন্ত্রী—তিনিই প্রধান কর্ম্মচারী। যে সকল ধর্ম্মজ্ঞানসম্পন্ন বৃদ্ধ কর্ম্মচারী ছিল, তাহাদিগকে দূর করা হইয়াছে।

কর্ত্রী। প্রজারা কি কর্ত্তাকে আসিয়া অত্যাচারের কথা জানাইয়াছে?

তর্কা। আ'জ দশদিন ধরিয়া বহু প্রজা আসিয়া তোমাদের বাড়ী ধন্না দিয়াছে,—হাহাকারে বাড়ী পূরিয়াছে—অশ্রুজলে গ্রাম প্লাবিত করিতেছে।

কর্ত্রী। ফল কি হইল?

তর্কা। ফল? গলাধাক্কা।

কর্ত্রী। তাহাদের নিকট টাকা লওয়া হইতেছে, না আরও কোন অত্যাচার হইতেছে?

তর্কা। প্রজাদের সর্ব্বস্ব কাড়িয়া লওয়া হইতেছে,—কিন্তু সর্ব্বস্ব দিয়াও নিষ্কৃতি নাই। যাহার নাই, তাহাকেও দিতে হইবে—নাই কোথায় পায়? তখন তাহাদিগকে ধরিয়া আনিয়া প্রহারে প্রহারে জর্জ্জরিত করা হইতেছে—তাহাদের কোলের ছেলে আছাড়িয়া মারা হইতেছে,—স্ত্রী ভগিনী কন্যার সতীত্ব নষ্ট করা হইতেছে।

কর্ত্রী। আর না ঠাকুর,—আর শুনিতে চাহি না। এর উপায় কি?

তর্কা। উপায় আপনি। আপনি সমাদ্দার বংশের গৃহলক্ষ্মী,—আপনি রক্ষা না করিলে, তাহারা কোথায় যায়? আপনি প্রজাগণের দুর্দ্দশা দেখিতে পাইবেন বলিয়া, তাহারা সৈন্যগণের লাঠির গুতা সহ্য করিয়াও আপনার বাটীর পার্শ্বে দলে দলে অবস্থান করিতেছে।

কর্ত্রী। আমি কেমন করিয়া দেখিব?

তর্কা। এখন একবার ছাদে উঠিলেই দেখিতে পাইবেন। শিবপূজা ফেলুন—উঠিয়া ছাদের উপরে যান,—দেখিয়া আসুন. মানব-নয়নে কত অশ্রু। সেই অশ্রু অগ্নির আকার ধারণ করিয়া কিরূপে আপনার বংশ ধ্বংস করিতে উদ্যত হইয়াছে।

কর্ত্রী। আপনি গুরু—আপনি আমার সঙ্গে চলুন।

তর্কালঙ্কারঠাকুর অগ্রগামী হইলেন, কর্ত্রীঠাকুরাণী তৎপশ্চাৎ পশ্চাৎ সৌধশিরে আরোহণ করিলেন। তর্কালঙ্কারঠাকুর কর্ত্রীঠাকুরাণীকে অঙ্গুলী নির্দ্দেশে দুঃস্থ প্রজাগণকে দেখাইয়া

দিলেন। কর্ত্রীঠাকুরাণী দেখিতে পাইলেন—দলে দলে প্রজাগণ চারিদিকে ব্যাকুল ভাবে ঘুরিয়া ফিরিতেছে, আর জমিদারের পাইকগণ তাহাদিগকে গুতাইয়া বাহির করিবার জন্য বল প্রকাশ করিতেছে। কতক বাহির হইয়া যাইতেছে, কতক শতচেষ্টা করিয়া সেখানে থাকিবার জন্য প্রয়াস পাইতেছে, কতক বা যাইতে যাইতে ফিরিয়া চাহিতেছে। যেন তাহাদের প্রাণের বেদনা কাহার নিকট বলিতে বাকি আছে—যেন বলিতে পারিলে, তাহাদের অত্যাচারের আগুন নিবিয়া যাইত—বুঝি বলা হইল না বলিয়া তাহারা মরিয়া যাইবে।

কর্ত্রীঠাকুরাণী প্রজার হাহাকার—প্রজার দুর্দ্দশা সমস্তই দেখিলেন, আঁচলে চক্ষুর জল মুছিয়া বলিলেন,—"ঠাকুর অবস্থা দেখিলাম। এখন নিবারণের উপায় কি ?"

তর্কালঙ্কার ঠাকুরের তখন দুই চক্ষু জলে ভাসিয়া যাইতেছিল, নামাবলীর অগ্রভাগে চক্ষুর জল মুছিয়া বলিলেন—"মা, উপায় আপনি করুন। কৃষ্ণগোবিন্দবাবু যাহাতে সৎপথে আসেন, যাহাতে অত্যাচারের আগুন নির্ব্বাপিত হয়, তাহা করুন—আমি কি বলিব মা ?"

কর্ত্রীঠাকুরাণী তখন আর কোন কথা বলিতে পারিলেন না। উভয়ে নীচে নামিয়া আসিলেন। তর্কালঙ্কারঠাকুর পুনরপি বলিলেন,—"মা, যাতে ধর্ম্ম থাকে, সংসার থাকে, বংশ থাকে—আর সমাদ্দার বংশের নাম থাকে, তাহা তোমাকেই করিতে হইবে। এখন আমি চলিলাম—সন্ধ্যার সময় আর একবার আসিব।"

জলদগম্ভীর স্বরে উত্তর হইল,—"আর একবার তোমার আসিতে হইবে না।"

তর্কালঙ্কার ঠাকুর পাশের দিকে চাহিয়া দেখিলেন—স্বয়ং কৃষ্ণগোবিন্দবাবু।

কৃষ্ণগোবিন্দবাবু ক্রুদ্ধ স্বরে বলিলেন,—"যখন ষষ্ঠীপূজা লক্ষ্মীপূজা হইবে তখন তোমাকে সংবাদ দিলে আসিও। সকল সময় পুরুতের প্রয়োজন হয় না। এ শাস্ত্র পড়ার সময় নয়—কঠোর জমিদারি রক্ষার সময়। তুমি দূর হও।"

কাঁপিতে কাঁপিতে তর্কলঙ্কারঠাকুর বলিলেন,—"কৃষ্ণগোবিন্দবাবু, পুরোহিত কেবল লক্ষ্মীপূজা ষষ্ঠীপূজা করিয়া দক্ষিণা লইবার জন্য নহে। পুরোহিত বিষয় কাজে মন্ত্রী, দানকার্য্যে বান্ধব, আধ্যাত্মিক পথে পথপ্রদর্শক। মানুষ যখন তাহা ভুলিয়া যায়, তখনই সে পথ হারায়। তোমার মতি বিগড়াইয়া গিয়াছে—তাই তুমি সব ভুলিয়া যাইতেছ। আর যে লক্ষ্মীপূজায় ষষ্ঠীপূজায় এবাড়ীতে আসিব, সে ভরসা নাই। লক্ষ্মী বিচলিতা—ষষ্ঠী অপ্রসন্না। এই যাওয়াই বোধ হয়, আমার শেষ যাওয়া—আর বুঝি আমায় এখানে আসিতে হইবে না।"

তর্কালঙ্কারঠাকুর আর মুহূর্ত্তমাত্রও বিলম্ব করিলেন না, দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেলেন।

কর্ত্রীঠাকুরাণী আবেগ-করুণ স্বরে বলিলেন—"তুমি কি করিলে? পুরোহিতকে অবমাননার বাক্যে ব্যথিত করিলে? উনি যে অভিশাপ দিয়া গেলেন!"

কৃষ্ণ। গিন্নি,—যাগ যজ্ঞ ক্রিয়াহীন এখনকার ব্রাহ্মণের কি আছে। কেবল সাপের খোলসের মত শুধু পৈতাখানা। বিষ নাই—বিষধর। ওর জন্যে ভয় করিও না।

কর্ত্রী। উনি আমাদের ভাল কথাই বলিতে আসিয়াছিলেন।

প্রজাগণের যে দুর্দ্দশা হইতেছে, আমাকে তাহাই জানাইতে আসিয়াছিলেন। তোমার পায়ে ধরি; জমিদার হইয়া—দেশের রক্ষাকর্ত্তা হইয়া—প্রজার মা বাপ হইয়া তাহাদিগের সর্ব্বনাশ করিও না। তাহাদের চক্ষুর জল মুছাও তাহাদিগের অত্যাচার নিবারণ কর।

কৃষ্ণ। আজ হইতে ব্রাহ্মণের এবাড়ী প্রবেশের পথ রুদ্ধ। হতভাগার বড়ই প্রশ্রয় হইয়াছে,—সে আমার বাড়ীর মধ্যে আসিতে পারে; তাই বাহিরের খুঁটি নাটি কথা বাড়ীর মধ্যে টানিয়া আনে। শোন গিন্নি, কৃষ্ণগোবিন্দ সমাদ্দার কাপুরুষ নহে—সে তাহার বিপুলবিস্তৃত জমিদারীর কাজ এক পর্ণকুটীরবাসী দরিদ্র ব্রাহ্মণের আর তাহার অন্তঃপুরবদ্ধা স্ত্রীর কথায় করে না।

কর্ত্রী। কিন্তু ধর্ম্ম রাখিলে, ধর্ম্মে রক্ষাকরে—ইহা শাস্ত্রের মত।

কৃষ্ণ। ধর্ম্ম ঋষিপ্রণীত একটা মানুষ ভুলান নীতিপথ মাত্র।

ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

জমিদার কৃষ্ণগোবিন্দবাবুর চরণে উত্তপ্ত অশ্রুজল ঢালিয়া অত্যাচারিত প্রজাগণ কোন প্রকার উপকার প্রাপ্ত না হইয়া, দলে দলে ফৌজদার সাহেবের নিকট উপস্থিত হইল;—জমিদারের অত্যাচারকাহিনী তাঁহার সমীপে কাঁদিয়া কাঁদিয়া নিবেদন করিল;—ফৌজদার সাহেব বলিলেন,—"তোমাদের জমিদার অতি সদাশয় লোক, তিনি যে এত অত্যাচার করিতেছেন, সে কথা আমি সহসা বিশ্বাস করিতে পারি না। অতএব আমি তদন্ত করিয়া দেখিব, পরে যাহা হয়, তোমরা জানিতে পাইবে।"

প্রজাগণ বুঝিতে পারিল, ইহা ফৌজদার সাহেবের মৌখিক কথা মাত্র। আসল কথা, তিনি জমিদার কৃষ্ণগোবিন্দবাবুর পক্ষে থাকিয়াই কাজ করিতেছেন। এদিকে অত্যাচারের মাত্রাও দিন দিন বৰ্দ্ধিত হইয়া উঠিতে লাগিল। তখন প্রজাগণের মধ্যে কতকগুলি মাতব্বর লোক একত্রিত হইয়া ঢাকার নবাব বাহাদুরের নিকট অত্যাচারকাহিনী নিবেদন করিতে গমন করিল।

কিন্তু তাহাদিগের গমনের পূর্ব্বেই ফৌজদার সাহেব নবাব-সরকারে এক মন্তব্যলিপি প্রেরণ করিয়াছিলেন। তাহাতে তিনি লিখিয়াছিলেন,—কৃষ্ণগোবিন্দ সমাদ্দারের জমিদারীর সমস্ত প্রজা বিদ্রোহী হইয়াছে। তাহারা তাঁহাকে কর প্রদান করা পর্য্যন্ত বন্ধ করিয়া দিয়াছে,—আমি ফৌজ লইয়া গিয়াও তাহাদের কিছু করিতে পারি নাই। প্রজাসকল যদি হুজুরে হাজির হয়, তবে

তাহাদের কোন কথা না শোনা হয়। আমি ও কৃষ্ণগোবিন্দবাবু তাহাদিগকে অনেক কষ্টে বশে আনিবার উপায় লইতেছি। এসময় যদি তাহারা হজুর সরকার হইতে কোন প্রকার প্রশ্রয় পায়, তাহা হইলে খাজনা আদায় বন্ধ হইয়া যাইবে। খাজনা আদয় বন্ধ হইয়া গেলে, কাজেই কৃষ্ণগোবিন্দবাবু সরকার বাহাদুরের খাজনা পাঠাইতে সক্ষম হইবেন না,—এবং সে জন্য তাহাকে কোন দোষও দেওয়া যাইবে না।

প্রজাগণের উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই ফৌজদার সাহেবের পত্র পৌঁছিয়াছিল। তখনকার নবাবের খাজনার টাকা লইয়াই সম্বন্ধ ছিল—প্রজার সহিত কোন সম্বন্ধ ছিল না। কাজেই খাজনা আদায়ের ক্ষতির কথা শুনিয়া প্রজা সকলের সহিত নবাব সাহেব সাক্ষাৎ করিলেন না। অধিকন্তু তাহাদিগকে কর্ম্মচারি-গণ দূর দূর করিয়া তাড়াইয়া দিল।

শৃগাল কুকুরের ন্যায় সর্ব্বত্র হইতে তাড়িত ও লাঞ্ছিত হইয়া প্রজা সকল বাড়ী ফিরিয়া আসিল। বাড়ী থাকিয়া অত্যাচারের আগুনে দগ্ধ হইতে লাগিল। তখন একমাত্র ভগবানই সম্বল—চক্ষুর জল আর ভগবানের নাম লইয়া প্রজাগণ হাহাকার করিয়া দিন কাটাইতে লাগিল। এইরূপ প্রায় ছয় মাস অতীত হইতে চলিল।

* * * * *

মল্লিকপুরে সদর কাছারি প্রস্তুত হইয়াছিল এবং এই কাছারিতে সদর নায়েব মোহনলাল দেশের প্রজার রক্তক্রীড়া করিতেছিলেন।

একদিন সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পরে মোহনলাল তদীয় কয়েকটী বন্ধু একত্রে বসিয়া মদ্যপান করিতেছিলেন। মদ্য, তোষামোদ

এবং যথেচ্ছাচার এই পদার্থত্রয় যাহাকে আক্রমণ করে, সে কিছুতেই মানুষ সাজিতে পারে না। মোহনলালেও মনুষ্যত্ব বিন্দু মাত্র নাই ;—সে এখন নরকের অধস্তমস্তরের ঘৃণিত পিশাচ। তাহার সমস্ত সদ্বৃত্তিগুলির ক্রিয়া লোপ পাইয়া অসদ্বৃত্তিগুলি পূর্ণ জাগরিত হইয়াছে।

মোহনলাল মদ্যপান করিতে করিতে এক দল নর্ত্তকীকে আহ্বান করিতে আদেশ করিলেন। কাছারি বাড়ীতে দুই তিন দল নর্ত্তকী বেতন লইয়া অবস্থান করিতেছিল।

আজ্ঞামাত্র একদল নর্ত্তকী আসিয়া নৃত্যগীত আরম্ভ করিল,—মোহনলাল সুন্দরীগণের প্রত্যেক পদক্ষেপে অনন্ত সৌন্দর্য্য সন্দর্শন করিতে করিতে মদ্যপান করিতে লাগিলেন। রাত্রি প্রায় দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত নৃত্যগীত ও সুরাসেবন চলিল। তাহার পরে নৃত্যগীতাদি বন্ধ হইল। মোহনলাল তখন সম্পূর্ণ মত্ত।

মোহনলাল মদবিহ্বল আঁখি টানিয়া জড়িতকণ্ঠে ডাকিলেন—"রামসদয়!"

রামসদয় খানসামা। এক নিমুর বেনিয়ান গায়ে দিয়া রামসদয় আসিয়া হাজির। মোহনলাল বলিলেন,—"রামসদয়, দুখানা পাল্কী ডাক, আর দশজন বরকন্দাজ।"

প্রভু-প্রসাদ পাইয়া রামসদয়েরও তখন আঁখি বিঘূর্ণিত। সে বলিল—"হজুর এতরাত্রে পাল্কী বেহারা আর বরকন্দাজ কি হবে?"

"শোন্"—এই কথা বলিয়া রামসদয়ের কাণের কাছে মুখ লইয়া মোহনলাল কি বলিলেন। রামসদয় গম্ভীর মুখে বলিল—"কর্ত্তা যদি জানিতে পারেন?"

মোহনলাল উত্তেজিত স্বরে বলিলেন,—"এখন কর্ত্তা আমার হাতের মধ্যে। কোন ভয় নাই—মোহনলাল কোন শালায় ডরিয়ে কাজ করে না। বরকন্দাজগুলো বেছে বেছে নিস্—খুব যোয়ান আর সাহসী হয়।"

রামসদয় চলিয়া গেল, এবং দণ্ড দু'য়ের মধ্যে প্রভুর আদেশ পালন করিয়া ফিরিয়া আসিল।

তখন মোহনলাল একখানি পাল্কীতে আরোহণ করিলেন, এবং অপরখানিতে রামসদয়কে আরোহণ করিতে বলিলেন। রামসদয় পাল্কীতে আরোহণ করিলে মোহনলাল ডাকিয়া বলিলেন, "শালা রামা, তুই যেন আমার পুরুৎঠাকুর। যাবার সময় পাল্কীতে গেলি—আসার সময় তোর পাল্কীতে ক'নে আস্‌বে।"

মল্লিকপুর হইতে কাঞ্চননগর দুই ক্রোশের অধিক হইবে না। মোহনলালদিগের তথায় পঁহুছিতে এক ঘণ্টার অধিক সময় অতীত হইল না।

কৃষ্ণগোবিন্দ বাবুর বিস্তৃত প্রাসাদের নিকটে উপস্থিত হইয়া, মোহনলাল এক আম্রবাগানের নিকটে পাল্কী রাখিতে আদেশ করিলেন। সেখানে নামিয়া পড়িয়া তিনি বরকন্দাজদিগকে ডাকিয়া কি পরামর্শ দান করিলেন,—তাহারা অভিবাদন করিয়া চলিয়া গেল,—রামসদয় যে শিবিকায় ছিল, রামসদয়কে নামাইয়া দিয়া সেখানিও নিঃশব্দে তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে গেল।

মোহনলাল শিবকারোহণে কৃষ্ণগোবিন্দ বাবুর সদর দরোজায় উপস্থিত হইলেন,—রামসদয় শিবিকার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গিয়া উপস্থিত হইল। তখন সদর দরোজা বন্ধ হইয়া গিয়াছিল,—রামসদয় প্রদান দ্বার-রক্ষকের নিকটে গিয়া মোহনলালের আগমন

সংবাদ প্রধান করিয়া দ্বার খুলিয়া দিবার আদেশ দিতে অনুরোধ করিল।

প্রধান দ্বার-রক্ষী মোহনলালের শিবিকার নিকটে আসিয়া তাঁহাকে উত্তম রূপে দেখিয়া, যে তখন দেউড়ীতে ছিল, তাহাকে দ্বার ছাড়িতে আদেশ করিল। দ্বার মুক্ত হইল।

মোহনলাল শিবিকা হইতে নামিয়া রামসদয়কে সঙ্গে করিয়া বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

রামসদয় কোথায় চলিয়া গেল,—মোহনলাল মহামায়ার প্রকোষ্ঠাভিমুখে গমন করিলেন।

মোহনলালের আগমনে দাসদাসী সকলে জাগিয়া পড়িল,—নির্ব্বাপিত আলোকমালা আবার জ্বলিয়া উঠিল। কর্ত্রীঠাকুরাণীও উঠিলেন। জামাতার আহারের উদ্যোগ করিবার জন্য আদেশ করিলেন, মোহনলাল বলিলেন,—"আমার আহারাদি সারা হইয়াছে।"

তখন সকলে নিশ্চিন্ত হইয়া আপন আপন গৃহে গিয়া শয়ন করিল।

ইহার কিঞ্চিৎ পরে পশ্চাদ্দ্বারে একটা প্রবল লাঠালাঠি ও চীৎকার শব্দ উত্থিত হইল। বাড়ীর দ্বার-রক্ষকগণ সেদিকে ছুটিয়া গেল,—কিন্তু ততক্ষণ একখান শিবিকা ও কয়েকজন লোক নক্ষত্রবেগে দূর হইতে দূরান্তরে চলিয়া গেল। প্রহরিগণ সে সংবাদ হাবিলদারকে জানাইল,—হাবিলদার সুবেদারকে,—সুবেদার সেনাপতিকে জানাইল।

এ দিকে বাড়ীর মধ্যে একটা হৈ হৈ রৈ রৈ পড়িয়া গেল। যে দাসী বিশাখার গৃহে শয়ন করিত,—সে চীৎকার করিতে

করিতে আসিয়া কর্ত্রীঠাকুরাণীকে জানাইল যে, জামাইবাবু আসায় সে উঠিয়া আসিয়াছিল,—কিন্তু ফিরিয়া গিয়া বিশাখাকে দেখিতে পায় নাই। অধিকন্তু বিশাখাকে যে, জোর করিয়া ধরিয়া লইয়া গিয়াছে—তাহা তাহার বিছানার অবস্থা দেখিয়া বুঝা যায়। অনেকক্ষণ বলপ্রকাশ করিয়াছিল, তাহাতে বিছানা সমুদয় জড় সড় হইয়া গিয়াছে।

ওদিকে বাহিরের গোলযোগের কথাও ভিতরে পঁহুছিল। কর্ত্রী কম্পিত কলেবরে কর্ত্তাকে জাগাইয়া সমুদয় কথা শুনাইলেন।

কর্ত্তা বলিলেন,—"বুঝি আমার সর্ব্বনাশ উপস্থিত। বিশাখার জন্য আমার পতন নিশ্চয়। কোন বাহির শত্রু বা দুর্গের কোন প্রবল সৈন্য বিশাখার গুণ্ডার,—সেই-ই দাসীর সাহায্যে তাহাকে লইয়া গিয়াছে।"

কর্ত্তা তখনই দাসীকে বন্ধন করিতে আদেশ দিলেন। এদিকে মোহনলাল মহামায়াকে বলিলেন,—"তোমাদের সতী বিশাখা নাকি কাহার সঙ্গে পলায়ন করিয়াছে?"

মহামায়া রুক্ষস্বরে স্বরে বলিল,—"তাইত শুনিতেছি। কিন্তু তুমি দিন দিন এমন হইতেছ কেন?"

মদবিহ্বল আঁখি টানিয়া মোহনলাল বলিল,—"কি হইতেছি প্রাণেশ্বরি? আ'জ আমি দেশের মধ্যে সর্ব্বেসর্ব্বা। এ'তে কি তুমি আমার উন্নতি বুঝিতে পারিতেছ না?"

ম। না।

মো। কেন?

ম। নিশ্চয় জানিও, ইহা উন্নতি নয়;—পতনের আরম্ভ।

অত্যাচার করিয়া কেহ উন্নত হইতে পারে না। তুমিও পারিবে না। তুমি মদে আত্মহারা হইয়াছ—তুমি যাহা করিতে নাই, তাহাই করিতে আরম্ভ করিয়াছ।

মো। কি করিয়াছি। শোন, মহামায়া,—আমি তোমার পিতার অন্নদাস নই;—আমার জন্যই তোমার পিতা এখনও গদিতে আছেন।

ম। কিন্তু আর বড় অধিক দিন নয়। পাপের পূর্ণ মাত্রা ছাড়াইয়া উঠিল। পাপে প্রভুত্ব থাকে না।

মো। কেন, তুমি আমার কি দোষ দেখিলে?

ম। তোমার দোষের কথা শুনিতে শুনিতে হৃদয় দীর্ণ বিদীর্ণ হইয়া গেল। আজি আবার এ কি করিলে?

মো। কি করিলাম?

ম। অন্যে যাহা বুঝুক—বাবা যাহা বুঝুক—আমি বলিতে পারি, বিশাখা তোমা কর্ত্তৃকই অপহৃতা হইয়াছে।

মোহনলাল চোক মিলিয়া বলিলেন,—"তোমার স্পর্দ্ধা বাড়িয়া গিয়াছে। কা'লই এর প্রতিকার করিব।"

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

—০—

অতি প্রত্যুষে উঠিয়া মহামায়া শয্যাত্যাগ করত নীরদার প্রকোষ্ঠে গমন করিল। নীরদা তখন কেবলমাত্র শয্যা পরিত্যাগ করিয়া উঠিয়াছে,—তাহার শয্যা-বিশৃঙ্খলিত চুলের রাশি লইয়া গবাক্ষ-প্রবিষ্ট স্নিগ্ধ সমীর ক্রীড়া করিতেছিল। সে দাঁড়াইয়াছিল।

মহামায়া বলিল,—"আজ খুব সকালে উঠিয়াছ।"

নীরদা মৃদু হাসিয়া বলিল,—"তুমিত এত সকালে ওঠ না। মোহনলাল বুঝি উঠাইয়া দিয়াছে?"

মহামায়াও মৃদু হাসিল। বলিল,—"কেন, উঠাইয়া দিবে কেন?" আমিত আর লড়াই করা সিপাই নই।"

নী। পুরুষ মানুষ, আর পেঁচা,—এরা অন্ধকার ভালবাসে। তুমি আলো মোহনলালের ভাল লাগে না,—একটা অন্ধকার চাই, তাই বিশাখার উপর অনুগ্রহ।

ম। বিশাখাকেত বাহিরের কোন শত্রু অপহরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে।

নী। একথা কে বলিল?

ম। বাড়ীর সকলেই বলিতেছে।

নী। তোমার বাপ?

ম। তিনিও বলিতেছেন।

নী। আর তুমি?

ম। আমি কি?

নী। তুমি কি ঐ কথা বিশ্বাস করিতেছ?

ম। সকলেই যখন বলিতেছে, তখন বিশ্বাস না করিয়া কি করিব।

নী। মিছে কথা। তুমি সেকথা বিশ্বাস কর নাই।

ম। কে বলিল?

নী। তোমার ঐ নয়ন দুটি। উহারা বলিতেছে—অপরে যাহা বুঝে বুঝুক; আসল কথা তা নয়।

ম। তবে কি?

নী। তা তুমিই জান।

ম। সত্য বল নীরদা, তুমি এ সম্বন্ধে কি বুঝিতেছ? তুমি আমার পিতার গুরুকন্যা, কাজেই আমারও গুরুস্থানীয়া। কিন্তু আমি তোমাকে সেরূপ ভাবিনা। আমি তোমাকে আপনার ভগিনীর মত—সখীর মত—অন্তরাত্মার মত ভাবি।

নী। সেই জন্যই আমি এই কার্য্যের সন্ধান লইয়াছি। তোমার স্বামীই এই ঘটনার নায়ক। যদিও আমি তাহা বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইতে পারিয়াছি, তথাপি তাহা ব্যক্ত করি নাই। ব্যক্ত করিও না। তাহাতে আমার অনিষ্ট হইতে পারে। তোমার স্বামীর অনিষ্ট হইতে পারে।

বর্ষার পদ্মের মত মহামায়ার দুই চক্ষুতে জল টল টল করিতেছিল। সে আবেগ-কম্পিত স্বরে বলিল,—"আমিত তাই বুঝিয়াছি। প্রহরীবেষ্টিত বাড়ীতে অন্যে কি করিয়া তাহাকে লইয়া যাইবে? বিশেষতঃ আমার স্বামী আসিলেন, আর সে গেল। যাই হোক্, এখন উপায় কি?"

নী। কিসের উপায়?

ম। আমার?

নী। একটা সতীন জুটিল। কিন্তু সেও বাহিরের হাঁড়ী। তোমার ভয় কি?

ম। আমার ভয় নাই? আমার ভয় ষোল আনা। আমার স্বামীর চরিত্র নষ্ট হইয়াছে—তিনি পাপের পূর্ণমূর্ত্তি সাজিয়াছেন।

নী। পুরুষ মানুষ, যাহা ভাল বুঝিতেছেন, তাহাই করিতেছেন। তুমি স্ত্রীলোক; তুমি তাহার কি করিবে?

ম। আমি না করিলে, আমার যে সর্ব্বনাশ উপস্থিত। পাপে মানুষের আয়ু নষ্ট হয়। হিন্দুরমণীর স্বামী ব্যতীত আর কি আছে? বল নীরদা, আমি কি করিলে আমার স্বামী পাপ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইতে পারেন। কি করিলে আমার স্বামী-দেবতা দেবতা হন?

নী। আমি জানি না। আমি ওসুখে চিরবঞ্চিত। তবে স্বামীকে যদি বশ করিতে পার, স্বামীকে যদি রূপের ফাঁদে ফেলিতে পার, তবে তখন যাহা বলিবে, তাহাই শুনিবেন।

কথাটা মহামায়ার ভাল লাগিল না। স্বামীকে রূপের ফাঁদে ফেলিয়া বশ করিতে হইবে। সে তাহা পারিবে না। রূপ লইয়া স্বামীর সহিত সম্বন্ধ কি? যাহা লইয়া স্বামীর সহিত সম্বন্ধ,—স্বামী কি তাহা-ভুলিয়া যাইবেন? যদি যান, তবে চরণে ধরিয়া কাঁদিয়া দেখিবে। যদি তাহাতেও না শোনেন,—তবে বুকের রক্ত দিয়া স্বামিদেবতার চরণ ধৌত করিবে। তাহাতেও যদি মনোরথ পূর্ণ না হয়, তবে সে পদে আত্মবলি দিবে।

শীতের ম্লান পদ্মের মত অতি বিষণ্ণভাবে মহামায়া ফিরিয়া গেল। মোহনলাল তখন উঠিয়া প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন করিয়া বেশ পরিবর্ত্তন করিতেছিলেন।

মহামায়া তাঁহার নিকটে গিয়া উপস্থিত হইল। আবেগ-করুণ-নয়নে স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল,—তুমি এখন কোথায় যাইবে?

মোহনলাল বলিল,—কাছারি।

ম। আ'জ না।

মো। কেন?

ম। আমার প্রয়োজন আছে।

মো। তোমার প্রয়োজনের চেয়ে তোমার বাবার প্রয়োজন বেশী। এখনও অর্দ্ধেক টাকা সংগ্রহ হয় নাই।

ম। দরিদ্রের বুকে বাঁশ দিয়া—সতীর সতীত্ব, ভিখারীর মুখের গ্রাস, জননীর বুকের ছেলে ধ্বংস করিয়া আর তুমি অর্থ সংগ্রহ করিতে পারিবে না।

মো। তাই হবে।

ম। কি হবে?

মো। তোমার আজ্ঞামতই কাজ হবে।

ম। তুমি ঠাট্টা করিতেছ?

মো। তাও কি হইতে পারে! তোমার সঙ্গে ঠাট্টা! ঠাট্টা করিবার প্রয়োজন হইলে, গুরু-পুরোহিত সংবাদ দিব।

ম। আমি স্ত্রী, তুমি স্বামী;—তুমি আমার ইষ্টদেবতা। আমার কথা তোমায় রাখিতেই হইবে।

মো। সময় অতীত হইতেছে, আমি টাকা সংগ্রহ না করিলে তোমার পিতার দশা কি হইবে, তাহা ভাবিয়া দেখ না।

ম। কিন্তু মানুষের উপর অত্যাচার করিলে মানুষের যিনি প্রভু, তিনি সহ্য করেন না।

মো। পুরুষই জ্যাঠা হয়,—মেয়ে জ্যাঠা বড়ই বালাই। তুমি জ্যাঠামো ছাড়। খাও দাও থাক। এই সুবিধায় আমিও কিছু দাওমেরে নেই। গরীবের ছেলে—দশ বিশ লাখ ঘরে তুলি।

ম। সকলে সকল বেচে খায়, ধর্ম্ম বেচে খায় না। ও টাকায় আমার কাজ নাই।

মো। তোমার না থাকিলে আমার কি? আমার টাকায় কাজ আছে।

মহামায়া বিরক্ত হইল। তখন কিছু বিরক্ত, কিছু করুণস্বরে বলিল,—"যাই হোক, আ'জ তুমি যেতে পার্‌বে না।"

মো। কেন, বেঁধে রাখ্‌বে নাকি?

ম। রাখবো।

মো। কি দিয়ে?

ম। কি দিয়ে? তুমি আমার ঈশ্বর—যদি বাঁধা না দাও, বাঁধিতে পারি না। বাঁধা দিলে তবে পারি। বাঁধা কি দিবে না প্রভু?

মো। বাহবা,—একটা কীর্ত্তনের দল কর। বল্‌তে কইতে বেশ পার্‌বে।

মহামায়ার ভারি রাগ হইল। তাহার পক্ক বিম্ব বিনিন্দিত অধরোষ্ঠ কাঁপিয়া উঠিল। সে বলিল,—আমি কীর্ত্তনের দল করিব না, কিন্তু তুমি কি করিতেছ, একএকবার ভাবিয়া দেখিও। আপন আপন কাজের আপনি জমা-খরচ করিয়া না দেখিলে সর্ব্বনাশ হয়।

মো। তুমি জমিদারের মেয়ে, আমি গরীবের ছেলে, সে দিন

গিয়াছে। তোমার বাপ এখন আমার হাতের মুঠার মধ্যে। এখন বুঝিয়া সুঝিয়া কথা বলিও।

ম। তুমি যদি মুল্লুকের বাদসা হও, তথাপি আমার স্বামী। তোমার দোষ হইলে, আমি গলা চিরিয়া সে কথা বলিব। এখনও বলিতেছি,—পাপ হইতে নিবৃত্ত হও।

মো। আমি কি দোষ করিয়াছি?

ম। সহস্র দোষ করিতেছ।

মো। বেশ করিতেছি। তোমার কি? না হয়, তোমার বাপকে বলিয়া আমি চলিয়া যাইতেছি। টাকা আদায় করা যদি আমার দোষ হয়, তাঁহাকে বলিয়া সরিয়া পড়িতেছি। দোষ তোমার বাবার হইল না, আর তাঁহার আদেশ পালন করিয়া আমার দোষ হবে?

ম। বাবা তোমাকে মদ খাইতে বলেন নি।

মো। আমার মুখে আমি মদ খাব, তা লোকের কি? খাব—একশ বার খাব। কার সাধ্য আমার কাজে বাধা দেয়।

ম। তুমি বিশাখাকে কাছারী পাঠাইয়াছ।

মো। মিথ্যা কথা। কে বলিল?

ম। আমি দেখিয়াছি।

মো। শোন, মহামায়া; যাইচ্ছা তাই বলিতে আরম্ভ করিয়াছ। আমি তোমার নিকটে আর আসিব না। বিশাখাকে লইয়া গিয়া থাকি, তাহাকে লইয়াই থাকিব।

ম। লইয়া গিয়াছ?

মো। হাঁ, গিয়াছি—কি করিবে কর।

ম। বাবাকে বলিয়া দিব।

মো। আমাকে কোন কথা বলিবার সাধ্য তাঁহার নাই। টাকা না হইলে, তাঁহার মান ও মস্তক থাকিবে না।

ম। আমি যদি বাবার ছেলে হইতাম, তবে মান-মস্তকের ভয়ে এত অত্যাচার হইতে দিতাম না।

মো। এখন আমি চলিলাম,—আর আসিব না। তোমার কাছে আসিয়া আর এত কথা শুনিব না। বিশাখাকে লইয়াই থাকিব।

মহামায়া কাঁদিয়া ফেলিল। বলিল,—"তবে সত্যই বিশাখাকে লইয়া গিয়াছ। সে দাসী—প্রভুর দাসীর উপরে বাসনা কেন হইল? সে অজ্ঞাতকুলশীলা, কেন নাথ; তাহার উপরে এ পাপবাসনা?"

নম্র-ব্যঙ্গস্বরে মোহনলাল বলিল,—"সে পরমাসুন্দরী। তোমার চেয়ে সে রূপবতী। আমি রূপের আশায় তাহাতে মজিয়াছি। তুমি যদি ভাল হইয়া চল, তোমার কোন ক্ষতি হইবে না। নতুবা, তোমার মুখও দেখিব না।"

মহামায়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল,—"প্রভু, প্রাণেশ্বর; আমি আমার সুখের জন্য বলিতেছি না। আমি তোমার চরণবলে সব সহ্য করিতে পারিব, কিন্তু তোমার কথা ভাবিতে আমার বুক ফাটিয়া উঠিতেছে। আমার কত কথা মনে উঠিতেছে। বাবা যাহা শুনিয়াছিলেন,—সেকথা আমার মনে হইতেছে—ভয়ে হৃদয় আসন্ন হইয়া পড়িতেছে।"

মোহনলাল গম্ভীরস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি কথা?"

স্তিমিতনয়নে আবেগ-ক্রন্দন-স্বরে মহামায়া বলিল,—"দুর্গদ্বারে সেই জ্যোতির্ম্ময়ী রমণী বিশাখাকে বলিয়াছিলেন,—'তুমি

রূপসী, সত্বরেই তোমার রূপ লইয়া সুন্দ-উপসুন্দের যুদ্ধ বাধিবে—তোমার রূপের জন্য এই সংসারে মহাপ্রলয় উপস্থিত হইবে।' আমার ভয় হইতেছে, সেই দিন বুঝি উপস্থিত।"

মোহনলাল হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। তারপরে বলিল,—"দুষ্টু মাগীরা লোক ভুলানের জন্য অমন কথা বলে।

মহামায়া সেকথার কি উত্তর করিতে যাইতেছিল, কিন্তু মোহনলাল সোপান-পথে নীচে নামিয়া গেলেন। মহামায়ার আর কথা বলা হইল না।

তখন সে শয্যায় গিয়া শয়ন করিল। উপাধানে মুখ গুঁজিয়া অনেক কান্না কাঁদিল। তারপরে বিপদবারণ মধুসূদনের নাম করিয়া স্বামীর সুমতির জন্য অনেক প্রার্থনা করিল। এ কান্নার কারণ পাঠক বুঝিবেন না,—পাঠিকাকেও বলিতে হইবে না।

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

দিবা দ্বিপ্রহর। মল্লিকপুরের সদর কাছারি বাড়ীর জন-কোলাহল তখন কিঞ্চিৎ নিবৃত্ত। প্রজাগণের দেহ-রক্তধারা তখন পৃথিবীতলে শুষ্ক হইতেছিল। যাহারা অর্থদানে অসমর্থ হইয়া শত অত্যাচার সহ্য করিতেছিল; কর্ম্মচারিগণের মধ্যাহ্ন-শান্তিভঙ্গের আশঙ্কায় তাহাদিগকে কারাগৃহে লইয়া গিয়াছে। পদাতিকগণ গ্রামান্তর হইতে যাহাদিগকে ধরিয়া আনিয়াছিল, তাহাদিগকেও এখন কারাগৃহে পূরিয়া রাখিয়াছে।

প্রধান কর্ম্মচারী মোহনলাল কাঞ্চননগর হইতে অনেকক্ষণ

হইল, কাছারিতে প্রত্যাগমন করিয়াছেন। অনেক দরিদ্রের বুকে বংশদণ্ড নিষ্পেষণ করিয়া, অনেকের জীবনান্তকর প্রহারের আজ্ঞা প্রদান করিয়া, অনেকের নিকট হইতে অযথা অর্থ আদায়ের আজ্ঞা দিয়া সুখ-শান্তির আশায় বাসাবাড়ীতে প্রবেশ করিয়াছেন।

এক নিস্তব্ধ গৃহমধ্যে বিশাখাকে আনিয়া রাখা হইয়াছিল। স্নানাহার অন্তে মোহনলাল সেই গৃহে প্রবেশ করিলেন।

পাপ-হৃদয়ে রূপের আগুন জ্বলিয়া উঠিল। একখানি কম্বলের উপরে বিশাখা পড়িয়াছিল—মোহনলাল দেখিল, স্বর্গ হইতে পারিজাত পুষ্প আনিয়া তোড়া গাঁথিয়া কে ফেলিয়া রাখিয়াছে। মোহনলাল নিকটস্থ হইল,—বিশাখা উঠিয়া বসিল।

মোহনলাল কামকলুষিত হৃদয়ের আবেগপূর্ণ স্বরে বলিল,—"বিশাখা, আমিই তোমাকে এখানে আনিয়াছি।"

দর্পিতা সিংহীর ন্যায় গ্রীবা বাকাইয়া বিশাখা বলিল,—"বুঝিতে আমার বাকি নাই। কিন্তু কেন আনিয়াছেন ?"

মোহনলাল মৃদু হাসিয়া বলিল,—"কেন আনিয়াছি ?—এখনও কি বলিতে হইবে, কেন আনিয়াছি ? আমি তোমাকে প্রাণাপেক্ষা ভালবাসি, তাই আনিয়াছি।"

বি। মিথ্যা কথা। তুমি আমাকে ভালবাস না,—ভালবাসিতে তুমি জান না। জানিলে, মহামায়াকে ফেলিয়া আমায় আনিতে না।

মো। আমি মহামায়াকে ভালবাসি না,—তোমাকে ভালবাসি।

বি। কেন,—এ প্রবৃত্তি কেন? তিনি জমিদারকন্যা, আমার প্রভুকন্যা। তিনি ঠাকুরাণী—আমি চাকরাণী। তোমার এ প্রবৃত্তি কেন?

মো। ঠাকুরাণীর চেয়ে চাকরাণীর রূপ অনেক বেশী। আমি চাকরাণীকে রাজরাণী করিব।

বি। বৃথা আশা,—রূপ দেখিয়া ভালবাসিতে উদ্যত হইয়াছ। রূপে ভালবাসা নাই। রূপ আজ আছে কা'ল নাই। কা'ল আমাকে দূর করিবে।

মো। না না বিশাখা, তোমায় কখনও ত্যাগ করিব না। যাবজ্জীবন তোমাকে প্রতিপালন করিব। তোমার ঘর দুয়ার প্রস্তুত করিয়া দিব। তোমাকে অনেক অলঙ্কার ও টাকা কড়ি দিব।

বি। বিশাখা চির উদাসিনী—বিশাখার জগতে কেহ নাই। সে ঘর বাড়ী কি করিবে? অলঙ্কারে তাহার কি হইবে? টাকাকড়ি তাহার কে খাইবে?

মো। তবে তুমি কি চাও?

বি। কি চাই? যে যাহা চায়, জগতে কি তাহা মেলে?

মো। বিশাখা, তুমি আমার বর্ত্তমান ক্ষমতা জানিতেছ না কি? আমি এখন এতদ্দেশের সর্ব্বে-সর্ব্বা। তোমার প্রভু—আমার শ্বশুর—দেশের জমিদার আমার করতলস্থ। এমন লোক নাই, যে আমার এক বিন্দু কৃপার ভিখারী নয়। আমার শ্বশুরের সুবিস্তৃত জমিদারী—এই জমিদারীতে লক্ষ লক্ষ লোকের বাস। লক্ষ লক্ষ লোক আজ আমার নিশ্বাসে উড়িতেছে, নিশ্বাসে স্থির হইতেছে।

বি। তায় আমার কি ?

মো। তুমি আমায় যে আদেশ করিবে, তুমি যাহা চাহিবে—আমি তাহাই তোমাকে প্রদান করিব।

বি। আমি যাহা চাই—তাহা কে দিতে পারে ? আমি চাই ফুলের পরিমল নিংড়ান সৌরভ, আমি চাই চাঁদের ভিয়ান সুধা,—আমি চাই কবিতার প্রাণের শেষ সুর—

মো। সে সকল রাশি রাশি তোমাকে দিব।

বিশাখা বিকট হাসি হাসিল। তীব্র কটাক্ষে মোহনলালের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল,—"সে কোথায় কিনিতে পাওয়া যায় জান ? তার মূল্য কত বোঝ ?"

মোহনলাল সে উৎকট কটাক্ষের, সে বিকট হাসির কোন অর্থবোধ করিতে পারিল না। কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ ভাবে, কিঞ্চিৎ ভাঙ্গাস্বরে বলিল,—"যত মূল্য লাগে তাই দিব। সহর হইতে ক্রয় করিয়া আনিব।"

বিশাখা উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিল। বলিল,—"দাম দিয়া তা মিলে না। তার দাম রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শের সহিত একটি প্রাণ। আর প্রেমের বাজারে তাহা পাওয়া যায়।"

মোহন বড় অপ্রতিভ হইল। কিন্তু অপ্রতিভ হইয়া সে পশ্চাৎপদ হইবার লোক নহে। বলিল,—"প্রেম ? আমার হৃদয় ভরা। এখন স্পষ্ট কথা শোন,—তুমি আমার হও। তোমাকে আমি চাই। তুমি যাহা বলিবে, আমি তাহাই করিব।"

বি। করিবে ?

মো। হাঁ।

বি। কেন করিবে ?

মো। তোমায় ভালবাসি।

বি। যথার্থ ভালবাস ?

মো। যথার্থ ভালবাসি।

বি। যদি ভালবাস, তবে আমার সুখ সন্ধান কর।

মো। নিশ্চয় করিব। তুমি যাহা বলিবে তাহাই করিব।

বি। আমি বলি। আমার সুখের জন্য আমাকে পরিত্যাগ কর। আমি আমার সুখানুসন্ধানে গমন করি।

মো। তা পারিব না,—আমি তোমায় চাই।

বি। তবে তুমি ভালবাস না,—ভাল বাসিতে জান না। তুমি চাও তোমার সুখ। তোমার সুখের জন্য আমাকে দাসী করিতে ইচ্ছা কর। কিন্তু আভিরিণী বালা সে প্রেম চাহে না।

মো। তুমি না চাহিলেও আমি তোমাকে চাই।

বি। সে আশা পরিত্যাগ কর। তোমার মত পশুপ্রকৃতি মানবের সহিত আভিরিণীর প্রণয়সম্বন্ধ হইতে পারে না। যে পরিণীতা পত্নীকে পদদ্বয়ে ঠেলিয়া অন্যাসক্ত হয়,—পশুতে আর তাহাতে কোন প্রভেদ নাই। দেবতা প্রেমের অধিকারী—পশু ইন্দ্রিয়ের দাস।

মোহনলাল জ্বলিয়া উঠিল। অহঙ্কারে মাৎসর্য্যে এখন মোহনলালের সমুদয় বৃত্তি নিমগ্ন ছিল। সে উঠিয়া দাঁড়াইল, বলিল,—"সিংহের কপোলস্থ হইয়া শৃগালীর এত স্পর্দ্ধা। কিন্তু ইহা থাকিবে না। যেরূপেই হউক, তোমার অহঙ্কার চূর্ণ করিব।"

বিশাখা আবার হাসিল। উদাস অবজ্ঞার চাহনিতে মোহন-লালের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল,—"আমায় নাকি তুমি

ভালবাস? বেশ ভালবাসা—এর প্রতিদানে তোমাকে আমার সর্ব্বস্ব দিব।”

মোহনলাল সে শ্লেষ বাক্য বুঝিতে পারিল। সে বলিল—“সহিবে কেন? আমার আদর-যত্ন আমার অসীম ধনৈশ্বর্য্য তোমার সহিবে কেন? কিন্তু নিশ্চয় জানিও, যাহার জন্যে তোমাকে এখানে আনিয়াছি, তাহাতে বিফলমনোরথ হইব না। ইচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায় হউক, আমার আশা পূর্ণ করিতেই হইবে।”

বিশাখা দাম্ভিকার ন্যায় বলিল,—“জানি না, ভগবান্ কি করিবেন। তবে শুনিয়াছি, তিনি সতীর সতীত্ব রক্ষা করিয়া থাকেন। তিনি বিপন্নের উদ্ধারকর্ত্তা। তিনি দীনের বন্ধু—অসহায়ের সহায়।”

মোহনলাল বিরক্ত হইল। বুঝিল সহজে বিশাখা তাঁহাকে উপাসনা করিবে না। সহজে সে তাঁহার বশীভূতা হইবে না।

তখন আর বাক্যব্যয় করা কর্ত্তব্য নহে, বিবেচনা করিয়া মোহনলাল উঠিয়া গেল। যে আশা, যে উৎসাহ, যে উদ্যম লইয়া বিশাখার নিকটে আসিয়াছিল, তাহা সমস্ত ভগ্ন হইয়া গেল।

মোহনলাল কাছারিগৃহে গমন করিল। তখন দ্বিপ্রহর অতীত হইয়া গিয়াছিল,—সূর্য্যদেব ঈষৎ পশ্চিমাকাশে ঢলিয়া তাঁহার প্রখর কর বর্ষণ করিতেছিলেন। রৌদ্রতাপ-তপ্ত বিহগকুল তখন বৃক্ষপত্রান্তরাল মধ্যে লুকাইয়াছিল। কিন্তু যে সকল অত্যাচার-ক্লান্ত প্রজাগণকে দ্বিপ্রহরে কারাগারে প্রেরণ করা হইয়াছিল, তাহাদিগকে আবার কাছারিতে আনিয়া টাকার জন্য তাগাদা করা হইতেছিল। মোহনলাল তথায় গিয়া উপস্থিত হইল।

কাছারি গৃহের মধ্যস্থলে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড তিনখানি তক্তপোষ

সম সংলগ্ন করিয়া পাতিত। তদুপরি সতরঞ্চ আস্তৃত। সতরঞ্চের উপর পুরু তোষক—তোষকের উপরে শুভ্র চাদর, তদুপরি সারি সারি তাকিয়া বালিশ। মোহনলাল তাহার উপরে উপবিষ্ট হইলেন। একজন ভৃত্য তাড়াতাড়ি আসিয়া রৌপ্য ফর্শিতে মৃগনাভি-ম্রক্ষিত তামাকু সাজিয়া দিয়া গেল। মোহনলাল ফর্শির নল হাতে করিয়াছেন, এমন সময়ে একজন কর্ম্মচারী শৃঙ্খলাবদ্ধ তিনজন প্রজাকে দেখাইয়া বলিল,—"হজুর, এই তিনজন প্রজাকে আজ তিনদিন হইতে সমানে অপমান ও প্রহার করা হইতেছে, কিন্তু ইহারা কোন মতেই টাকা দিতে স্বীকৃত হইতেছে না।

বিশাখার কৃপালাভে বঞ্চিত হইয়া, ব্যর্থ চেষ্টার বিষ-দহনে তখন মোহনলালের হৃদয় জ্বলিয়া যাইতেছিল। কর্ম্মচারীর ঐ কথায় তিনি আরও বিরক্ত হইয়া হুকুম দিলেন,—"উহাদিগকে কুত্তা দিয়া খাওয়াও।"

আদেশ শুনিয়া সকলেই কাঁপিয়া উঠিল। শৃঙ্খলাবদ্ধ প্রজাত্রয় হাহা করিয়া কাঁন্দিয়া উঠিল।

যে কর্ম্মচারী কথা বলিয়াছিল, সে বলিল—"ইহাদের বাড়ী শ্যামপুর। শ্যামপুরের মধ্যে ইহারাই মোড়ল। আজ কুড়ি দিন হইল শ্যামপুর থেকে ইহারা দশহাজার টাকা তুলিয়া দিয়াছে। কিন্তু শ্যামপুরে আমাদের পঞ্চাশ হাজার টাকা আদায়ের ফর্দ্দ হইয়াছে। আর চল্লিশহাজার টাকা উহারা দিতে চাহে না।

মোহনলাল তীব্রস্বরে বলিলেন,—"উহাদিগকে কাটিয়া না ফেলিলে টাকা আদায় হইবে না। কাট—এখনই আমার সম্মুখে উহাদিগকে কাটিয়া ফেল। তার পরে মাধবপুরের মোড়লদের কাটা মাথা যেমন বর্শার আগায় গাঁথিয়া সেই গ্রামে লইয়া গিয়া

গ্রামের মধ্যে ঘুরাইয়া বেড়াইয়া, সে গ্রাম হইতে কতক টাকা আদায় হইয়াছিল—এদের মাথা সেইরূপ লইয়া গেলেও টাকা আদায় হইবে।

শৃঙ্খলিত হস্ত যতদূর সাধ্য সংযুক্ত করিয়া কম্পিত কণ্ঠে একজন প্রজা বলিল,—"দোহাই ধর্ম্মাবতার শ্যামপুর গ্রাম অতি ক্ষুদ্র। গ্রামে পঞ্চাশ ঘরের অধিক লোক নাই। সকলেই কৃষিজীবী প্রজা—অবস্থা সকলেরই শোচনীয়। ধান-খন্দ যাহার যাহা ছিল. সমস্ত বেচিয়া আজ তিনমাস হইল, হুজুরের আদেশ মতে পনর হাজার টাকা কাছারিতে দাখিল করা হয়। তারপরে আজ কুড়িদিন হইল, আর দশহাজার দেওয়া হইয়াছে,—এ টাকাগুলি যে, কি প্রকারে সংগ্রহ করা হইয়াছে, তাহা দেখিলে আপনার চক্ষুতেও জল আসিত। প্রথমবারে কৃষকের সঞ্চিত ধান-খন্দ বেচিয়া লওয়ায় তাহাদের মধ্যে খাদ্যাভাব হইয়া উঠিয়াছিল। অনেকেরই আহার যুটিতেছিল না। তাহার উপরে দ্বিতীয়বারের টাকা সংগ্রহের সময় লাঙ্গলের গরু, ভেড়া, ছাগল প্রভৃতি বিক্রয় করা হইয়াছে,—কিন্তু তাহাতেও কুলায় নাই,—তখন সোণা রূপা ঘটী বাটী যাহার যাহা ছিল, কাড়িয়া লইয়া হুজুরের লোকজন বিক্রয় করিয়া লইয়াছেন। এখন গ্রাম শ্মশান,—বালক বালিকা, বৃদ্ধ বৃদ্ধা অন্নাভাবে—শয্যাভাবে—বস্ত্রাভাবে হাহাকার করিয়া ফিরিতেছে। মানুষ মানুষী প্রেত মূর্ত্তি—পেটে অন্ন নাই, গৃহে বস্ত্র নাই—চালে খড় নাই। তার উপরে আর টাকা কোথায় মিলিবে? সমস্ত গ্রাম লুট করিলে—সমস্ত গৃহ তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিলে আর দশটি টাকাও পাওয়া যাইবে না।

মোহনলাল বলিলেন,—"কেন, প্রজাদের বৌ ঝি নাই?"

প্রজা দীনকণ্ঠে ঘৃণার স্বরে বলিল—"আছে কিন্তু না খাইতে পাইলে আর কয়দিন থাকিবে?"

মো। বিক্রয় করিয়া আমার টাকা দিক।

প্র। কিনিবে কে? দেশ যুড়িয়া হাহাকার। কার বৌ-ঝি কে কিনিবে? বৌ-ঝি এদেশে কখনও বিক্রয় হয় না,—তার উপরে দেশের সকলেরই অবস্থা এইরূপ।

মো। আমি সে কথা শুনিতে চাহি না,—টাকার কি?

প্র। টাকা হইবার উপায় নাই।

মোহনলাল আজ্ঞা দিলেন, "উহাদিগকে যৌ গৃহে লইয়া যা।"

যৌ গৃহ অর্থে, একখানি বায়ুসঞ্চারণহীন ক্ষুদ্র কুটীর। কুটীর মধ্যে প্রজাগণকে লইয়া গিয়া বুকে পাথর চাপা দিয়া রাখা হয়।

মোহনলালের আদেশ প্রতিপালিত হইল। কয়েকজন সিপাহী সেই রুদ্যমান উপায়হীন প্রজাগণকে ধরিয়া লইয়া চলিয়া গেল।

দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

এখন একবার অজিতনাথের কথা বলিব।

অজিতনাথ সর্দ্দারের আজ্ঞায় আবদ্ধ হইয়া সবিশেষ প্রহরায় রক্ষিত হইলেন। সর্দ্দারের নিতান্ত অনুরক্ত ও বিশ্বাসী লোক সকল অস্ত্রশস্ত্র লইয়া লৌহশৃঙ্খলাবদ্ধ অজিতনাথকে পাহারা দিতেছিল।

রাত্রি দ্বিপ্রহর। মহারাষ্ট্রসৈন্যাবাসের অধিকাংশ লোকই নিদ্রিত। মধ্যাকাশে বসিয়া চন্দ্রদেব আপনমনে স্নিগ্ধ হৈমকর-রাশি ঢালিতেছিলেন। অসংখ্য কুসুমামোদসুবাসিত নৈশবায়ু দিক্ হইতে দিগন্তে বহিয়া যাইতেছিল।

অজিতনাথ প্রহরিবেষ্টিত হইয়া বসিয়া বসিয়া ভগবান্‌কে ভাবিতেছিলেন। এ ভাবনার মধ্যে তাঁহার মুক্তি বা তজ্জন্য কোন চিন্তার রেখাও ছিল না। এমন প্রফুল্ল রজনীতে যেমন প্রিয়জনকে ভাবিতে হয়, অজিতনাথ তেমনই ভাবিতেছিলেন। ভাবিতে ভাবিতে হৃদয় পুলকে পূর্ণ হইল। আনন্দ-গদ্গদ কণ্ঠে গাহিতে লাগিলেন ;—

বীক্ষ্যালকাবৃতমুখং তব কুণ্ডলশ্রী-
গণ্ডস্থলাধরসুধং হসিতাবলোকম্।
দত্তাভয়ঞ্চ ভুজদণ্ডযুগং বিলোক্য।
বক্ষঃ শ্রিয়ৈকরমণঞ্চ ভবাম দাস্যঃ॥

কা স্ত্র্যঙ্গ তে কলপদামৃতবেণুগীত-
সম্মোহিতার্য্যচরিতান্ন চলেৎ ত্রিলোক্যাম্।
ত্রৈলোক্যসৌভগমিদঞ্চ নিরীক্ষ্য রূপং
যদ্গোদ্বিজদ্রুমমৃগাঃ পুলকান্যবিভ্রন্॥

গান গাহিয়া গাহিয়া অজিতনাথ নিস্তব্ধ হইলেন। প্রহরিগণ অজিতনাথের গান শুনিয়া হাসিতে লাগিল। একজন আর এক-জনকে স্পষ্টই বলিল,—"আর কয়েক দণ্ডের জন্য এ চিৎকার। কা'ল সকালেই সব নিবিয়া যাইবে।"

অজিতনাথ সে কথা শুনিতে পাইলেন, কিন্তু চঞ্চলতাশূন্য সে হৃদয় তাহাতে হর্ষান্বিত বা শোকান্বিত হইল না। কিন্তু সহসা তাঁহার অত্যন্ত নিদ্রাকর্ষণ হইল। অজিতনাথ নিদ্রা জয় করিবার চেষ্টা করিলেন। তাহার মনে হইল, জীবনের শেষ সময় যদি উপস্থিত হইয়া থাকে, তবে এইকয় মূহূর্ত্ত জগৎ ও জগন্নাথকে দেখিয়া লই কিন্তু নিদ্রাবেগ সহ্য করিতে পারিলেন না। অগত্যা বাহু উপাধান করিয়া ভূমিতলে শয়ন করিলেন, এবং নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন।

নিদ্রিতাবস্থায় অজিতনাথ এক স্বপ্ন-দর্শন করিলেন। দেখি-লেন, অনিন্দ্য সুন্দরী এক রমণী আসিয়া তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইয়াছে। রমণীর রূপ অসামান্য। রূপে লাবণ্য নাই; কেবলই জ্যোতির লহরীলীলা। অজিনাথ তাঁহাকে মা বলিয়া সম্বোধন করিলেন। তার পরে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কে তুমি মা?"

বীণাবিনিন্দিতস্বরে রমণী বলিলেন,—"আমি ব্রহ্মচর্য্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। লোকে আমাকে মহাশক্তি বলিয়া থাকে।

যে ব্রহ্মচর্য্য রক্ষা করে, আমি তাহাকে রক্ষা করি। ব্রহ্মচর্য্য মহা-শক্তির অধিষ্ঠান। তুমি আমার ভক্ত—আমিও তোমার অনুরক্ত। ব্রহ্মচর্য্যের বলে মানুষ সর্ব্বজয় করিতে পারে, মহারাষ্ট্রশক্তিত অতিক্ষুদ্র।”

অজিতনাথ বলিলেন,—“মহারাষ্ট্র সর্দ্দার আমাকে আবদ্ধ করিয়াছে। স্বদেশী শক্তিধরেরা আমাকে ধরিয়া দিয়াছে—আমি ক্ষুদ্র,—আমি তাহাদের কি করিব?”

স্বপ্নদৃষ্ট রমণী বলিলেন,—“তোমার স্বদেশিগণ ক্ষুদ্র স্বার্থে অভিভূত। মহাস্বার্থ তাহাদের নাই—কিন্তু তুমি ব্রহ্মচারী। ব্রহ্মচারী জগৎ রক্ষা করিতে সমর্থ। লক্ষ্মণ ব্রহ্মচর্য্য রক্ষা না করিলে রাক্ষসযুদ্ধে রামের বিজয়লাভ ঘটিত না। অদৃশ্য দানবশক্তি বিনাশ করিতে ব্রহ্মচর্য্যই একমাত্র ভরসা। লক্ষ্মণ ব্রহ্মচর্য্যব্রত পালন করিয়া লঙ্কার চণ্ডীর মন্দিরে পঁহুছিতে পারিয়াছিলেন। তুমি যদি এপথ হইতে স্খলিত না হও, একা তোমার দ্বারাই পতিত দেশ উদ্ধার হইবে। আর্ত্তের হাহাকার বিনিবারিত হইবে।”

অজিতনাথের নয়নে জল আসিল। অশ্রুপূর্ণ লোচনে গদগদ-কণ্ঠে অজিতনাথ বলিলেন,—“মা, আর্ত্তের হাহাকার যাহাতে বিনিবারিত হয়, তাহার উপায় কি?”

র। উপায় তোমার মুক্তিলাভ।

অ। আমার মুক্তি অসম্ভব।

র। অসম্ভব নহে—মহারাষ্ট্র সর্দ্দারের শূলবেদনা আছে। যে দিন বেদনা ধরে, সেদিন বেদনার জ্বালায় সে ছটফট করিতে থাকে। কোন দিন ক্রমান্বয়ে দুই তিন দিন মৃত্যুকল্প যন্ত্রণায় কাটায়, কোন দিন তাহারও অধিক হয়।

অ। তাহাতে আমার কি হইবে?

র। তুমি ব্যাপকন্যাস জান?

অ। হাঁ জানি।

র। কা'ল প্রত্যুষে—তোমার শূলদণ্ডের কিছু আগে তাহার সেই বেদনা ধরিবে। তুমি তাহার মস্তক হইতে পা পর্য্যন্ত সাতবার ন্যাস করিও। তাহাতেই তাহার বেদনা তদ্দণ্ডেই নিবারিত হইবে।

অ। তারপর?

র। তারপর যাহা ঘটে,—তাহাই ঘটিবে।

অ। কিন্তু দরিদ্রের অশ্রুজল কে মুছাইবে?

র। সময়ে সকলই হয়,—সময়ের প্রতীক্ষা করিও।

সহসা একটা সিপাহী অজিতনাথের পদসংলগ্ন শৃঙ্খল ধরিয়া টান দিল। পায়ে অত্যন্ত ব্যথা লাগিল—অজিতনাথের নিদ্রাভঙ্গ হইয়া গেল। অজিতনাথ উঠিয়া বসিলেন।

তাঁহার প্রাণের মধ্যে হু হু করিতে লাগিল। স্বপ্নের কথা মনে আসিতে লাগিল। চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন,—তখন ভোর হইয়া গিয়াছে, কিন্তু কাননান্তরাল হইতে অন্ধকার সম্পূর্ণ অপসারিত হয় নাই। বন্য বিহঙ্গমে তখনও প্রভাতী ধরে নাই।

যে প্রহরী শৃঙ্খল ধরিয়া টানিয়াছিল, সে বলিল—"হতভাগ্য বন্দী, উঠিয়া প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া জীবনের মত ভগবান্‌কে ডাকিয়া লও। তোমাকে ধার্ম্মিক বলিয়া বোধ হয়। তোমার শেষমুহূর্ত্ত সমাগত। সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই শূলদ্বারা তোমাকে নিহত করা হইবে।

অজিতনাথ তাহাই করিলেন। প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন করিয়া ভগবানের স্তোত্রগাথা গান করিতে লাগিলেন।

দেখিতে দেখিতে দিগন্ত উজ্জ্বল অরুণকিরণে প্রতিভাসিত হইল। দেখিতে দেখিতে সূর্য্যোদয় হইল। দেখিতে দেখিতে দিনের আলো জগতে বিকীর্ণ হইল। কিন্তু অজিতনাথকে নিহত করিতে কোন লোক আসিল না।

প্রধান প্রহরী অপর একজন প্রহরীকে বলিল,—"সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই লোক আসিয়া বন্দীকে নিহত করিবে, কথা ছিল। বেলা প্রায় চারিদণ্ড হইল, কিন্তু কেহ আসিল না। ব্যাপার কি, জানিয়া আয়।"

সে চলিয়া গেল, এবং অনতিবিলম্বে ফিরিয়া আসিয়া বলিল, —"সর্দ্দারের সেই ব্যথা ধরিয়াছে। আ'জ আর বন্দীকে হত্যা করা হইবে না। সকলে সর্দ্দারকে লইয়া ব্যস্ত আছে।"

অজিতনাথ শিহরিয়া উঠিলেন। স্বপ্নের কথা তাঁহার মনে মনে পড়িল। চক্ষু ফাটিয়া জল আসিল। মনে মনে ভক্তি-গদ্‌গদ কণ্ঠে ডাকিয়া বলিলেন,—"মা, ব্রহ্মচর্য্যাধিষ্ঠাত্রী দেবি। মহামায়ে, মহাশক্তি! সত্যই তবে কি দয়া করিয়া দাসে দর্শন দিয়াছিলেন? দয়াময়ি! দীনহীন সন্তানকে যদি দেখা দিলে, তবে আবার এ ভবঘোরে রাখিয়া গেলে কেন? মা, তুমি ইচ্ছাময়ী,—তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক। দাস আজ্ঞা প্রতিপালন করিবে।

তারপরে প্রধান প্রহরীকে ডাকিয়া বলিলেন,—"আ'জ আমার প্রাণ বিনষ্ট করা হইবে না?"

প্র। না।

অ। কেন?

প্র। আমাদের সর্দ্দারের অসুখ করিয়াছে।

অ। কি অসুখ?

প্র। তাঁহার শূল বেদনা আছে,—তাই হইয়াছে।

অ। তিনি যদি বড় কাতর হইয়া থাকেন, আমি সারিয়া দিতে পারি।

প্র। ক'দিনে সারিতে পার?

অ। এখনই—এক মুহূর্ত্তে সারিতে পারি।

প্র। তিনি তোমার প্রদত্ত ঔষধ খাইবেন না। তুমি বন্দী—প্রাণদণ্ডের আজ্ঞায় বন্দী। কোন বিষও দিতে পার।

অ। না, আমি কোন ঔষধ খাওয়াইব না। কেবল হস্তচালনা দ্বারা রোগ উপশমিত করিব।

প্রহরী অপর সকলকে প্রহরায় রাখিয়া সর্দ্দারের নিকটে গেল, এবং সমস্ত কথা বলিল।

সর্দ্দার তখন শূলবেদনার প্রবল ব্যথায় ছট্‌ফট করিতেছিলেন, তিনি সে কথা শুনিয়া তখনই অজিতনাথকে আনিতে আজ্ঞা করিলেন। তাঁহার আজ্ঞা পালিত হইল।

অজিতনাথ সর্দ্দারের নিকট উপস্থিত হইলে, ক্ষীণকণ্ঠে ব্যথিতস্বরে সর্দ্দার বলিলেন,—"বন্দী, যদি এখনই আমাকে ব্যথার যন্ত্রণা হইতে মুক্ত করিতে পার, আমি তোমার পুরস্কার করিব।"

অজিতনাথ মৃদু হাসিয়া বলিলেন—"কয়েক মুহূর্ত্ত বাদে যাহার দেহ শৃগাল কুকুরে খাইবে, তাহাকে আর কি পুরস্কার করিবেন। তবে আপনার বেদনা নিবারণ করিতে পারিলে, আমার যে

আনন্দ হইবে, তাহাই আমার যথেষ্ট পুরস্কার। অন্ত পুরস্কারে আশা আমার নাই।"

অজিতনাথ সর্দ্দারের মস্তক হইতে পদতল পর্য্যন্ত সাতবার ব্যাপক ন্যাস করিলেন। এক খণ্ড জ্বলন্ত অঙ্গারে এক কলসী জল ঢালিয়া দিলে, তাহা যেমন একবারে নির্ব্বাপিত ও শীতল হয়, সর্দ্দারের বেদনাও সেইরূপ নির্ব্বাপিত ও শীতল হইল। সর্দ্দার গিয়া অজিতনাথের চরণধূলা গ্রহণ পূর্ব্বক নিজ মস্তকে প্রদান করিলেন; এবং অনুচরগণকে অজিতনাথের অঙ্গ হইতে শৃঙ্খল মোচন করিতে আজ্ঞা দিলেন। শৃঙ্খল মুক্ত হইল।

সর্দ্দার বলিলেন,—"আপনি কি সিদ্ধ?"

অজিতনাথের প্রাণের মধ্যে ভক্তি-বিস্ময়ের একটা উত্তাল তরঙ্গ ক্রীড়া করিতেছিল। স্বপ্নের সেই মূর্ত্তি তাঁহার মানসপটে অঙ্কিত হইয়াছিল। অজিতনাথ সেই রূপজ্যোতি প্রাণ ভরিয়া পূজা করিতে করিতে ডাকিয়া বলিতেছিলেন,—"মা! আমায় যদি দেখা দিলে, তবে কৃষ্ণসেবার পথ বলিয়া দিলে না কেন! মা! আমায় কৃষ্ণসেবা করিবার অধিকার দাও।"

সর্দ্দার উত্তর না পাইয়া মনে করিলেন, কোন দৈবশক্তি দ্বারা আমার রোগ উপশম করিয়াছেন, কিন্তু এখনও সে চিন্তা দূর হয় নাই। তিনি আর কোন কথা কহিলেন না।

অনেকক্ষণ পরে অজিতনাথের জ্ঞান হইল। তিনি দেখিলেন, সর্দ্দার কৃতাঞ্জলি হইয়া তাঁহার পার্শ্বে উপবিষ্ট। মৃদু হাসিয়া অজিতনাথ বলিলেন—"আমি ক্ষুদ্র মানুষ আমার নিকট অত কেন।"

সর্দ্দার বলিলেন,—"আপনি সামান্ত মানব নহেন। যাঁহার

হস্তসঞ্চালনে শূল ব্যাধির দারুণ যন্ত্রণা উপশমিত হয়, তিনি মানব নহেন,—দেবতা।"

অজিতনাথ হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। বলিলেন—"আপনার উপরে দৈবদয়া হইয়াছে, তাই আপনি যন্ত্রণার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইলেন।"

স। আমার এ রোগ কি স্থায়ী ভাবে আরোগ্য হইল?

অ। তা আমি জানি না। বোধ হয়, আবার হইতেও পারে—কিন্তু ঐরূপ ব্যাপকন্যাসে পুনরায় উপশম হইতে পারে।

স। আপনাকে তখন কোথায় পাইব?

অ। আমাকে খুঁজিয়া পাওয়া আর অসম্ভব হইবে,—কারণ মুহূর্ত্তপরে আপনার আদেশে শূলদণ্ডে আমি মর্ত্ত্যভূমি হইতে বিদায় লইব।

স। আমায় ক্ষমা করুন,—আপনার পায়ের নখাগ্রও আমার দ্বারা ছিন্ন হইবে না। এক্ষণে দাসের সঙ্গে থাকিতে হইবে। আমি আপনার শিষ্য হইলাম।

অ। না না,—আমার শিষ্য হইতে পারিবেন না।

স। কেন?

অ। আমার ধর্ম্ম—জীবে দয়া, নামে রুচি আর আত্মোন্নতি।

স। আমিও তাহাই করিব।

অ। আপনার ধর্ম্ম ধনলুণ্ঠন—জীবহিংসা।

স। আমি সে সমুদয় পরিত্যাগ করিব। কি প্রভু, আমার এত বল, এত সাহস, এত বীর্য্য, এত ধনরত্ন—এত সৈন্য সামন্ত, কিন্তু শরীরের যন্ত্রণা রোধ করিবার কোন ক্ষমতা নাই। কিছুতেই আমার এ যন্ত্রণার নিবারণ নাই—কিন্তু আপনি বাহ্যদর্শনে দীনহীন,

তথাপি আপনার হস্তসঞ্চালনে ব্যাধির যন্ত্রণা দূরে গেল। আমি বাহ্য সম্পদ চাই না, আমি আপনার ক্ষমতার অভিলাষী।

সর্দ্দারের পার্শ্বে চারি পাঁচ জন মহারাষ্ট্রীয় যোয়ান বসিয়াছিল, তাহারা ভ্রূকুঞ্চিত করিল।

সর্দ্দার তাহাদের মনের ভাব বুঝিতে পারিলেন। বলিলেন, "তোমরা কি বল?"

একজন গম্ভীর ভাবে বলিল,—"জাতীয় মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছি। মরণ পর্য্যন্ত তরবারি ছাড়িব না।"

অপর কয়েকজন তাহার অনুমোদন করিল।

অজিতনাথ বলিলেন—"তরবারি দ্বারাও জীবক্লেশ বিনিবারিত হয়।"

সমস্বরে মহারাষ্ট্রীয়গণ বলিল,—"জীবনে ধিক্! কলা কচুর মত বাঙ্গালী কাটিয়া বাঙ্গালীর ধর্ম্মশিষ্য হবি। কেন আমাদের দেশে কি ধার্ম্মিক নাই!"

সর্দ্দার বলিল—"আমাকে তোমরা পরিত্যাগ কর। আমি এই প্রভুর সঙ্গে চলিয়া যাই।"

একজন মহারাষ্ট্রীয় বীর বলিল—"তবে কি আপনি এই সেনাদলের সর্দ্দারী পরিত্যাগ করিলেন?"

সর্দ্দার অম্লান বদনে বলিলেন,—"হাঁ।"

যাহারা কথা কহিতেছিল, তাহারা শিঙ্গা বাজাইল। চক্ষুর নিমিষে অনেক মহারাষ্ট্রীয় বীর তথায় সমাগত হইল। তাহাদের নিকটে সকল কথা বর্ণিত হইল। ভীমসিংহ নামক একজনকে সকলে সর্দ্দার পদে নিযুক্ত করিল।

ভীমসিংহ অজিতনাথের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন—

"বন্দী তুমি চলিয়া যাও। পূর্ব্ব সর্দ্দার তোমাকে মুক্তি দিয়াছেন, সুতরাং আমি তোমাকে কোন দণ্ড দিতে পারি না। কিন্তু পুনর্ব্বার আমাদের কোন প্রকার অনিষ্ট করিলে তোমার নিস্তার নাই।"

সর্দ্দার বলিলেন,—"আমিও প্রভুর সঙ্গে যাইব।"

ভী। কেন?

স। আমার ব্যাধির যন্ত্রণায় জীবনে সুখ নাই,—প্রভুর হস্তসঞ্চালনে সে যাতনা দূর হয়। আমি উহাঁর সঙ্গ পরিত্যাগ করিব না।

ভী। আপনি মহারাষ্ট্রীয় বিধান জানেন। কোন মহারাষ্ট্রীয় বাঙ্গালী বা মুসলমানের অনুগত হইলে তদ্দণ্ডেই তাহার জীবন নাশ করিতে হয়।

স। আমি প্রতিজ্ঞা করিয়া তরবারি পরিত্যাগ করিব।

ভী। আপনি ভুলিয়া যাইতেছেন, যিনি সর্দ্দার হইয়াছেন তিনি কখনও জীবনেও তরবারি পরিত্যাগ করিতে পারিবেন না। তরবারি পরিত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে জীবনও পরিত্যাগ করিতে হইবে।

"তবে তাহাই হউক।"—সর্দ্দারের মুখ হইতে এই কথা নির্গত হইবা মাত্র ভীমসিংহের হস্তস্থিত তীক্ষ্ণধার তরবারি পূর্ব্বসর্দ্দারের স্কন্ধদেশে পতিত হইল, এবং তাঁহার দেহ দ্বিধা বিভক্ত করিল। অজিতনাথ চমকিয়া উঠিলেন, কিন্তু মহারাষ্ট্রগণের মধ্যে কোন উচ্চ বাচ্য হইল না।

ত্রয়স্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

অজিতনাথ মহারাষ্ট্রীয়গণের নিষ্ঠুরতা দর্শনে অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন, কিন্তু মুখে কিছু বলিতে পারিলেন না,—বলা বৃথা বলিয়াই কিছু বলা হইল না। তখন অতি ক্ষুণ্ণ মনে তথা হইতে বহির্গত হইয়া চলিয়া গেলেন।

বনবিটপিবহুল পার্ব্বত্য পথে অজিতনাথ চলিয়া যাইতে লাগিলেন। সে পথ তিনি ভাল চিনিতেন না, তথাপি যে পথে আসিয়াছিলেন, কতকটা তাহা অনুমান ছিল—অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া চলিয়া যাইতে লাগিলেন।

ক্রমে দিবা অবসান হইল। সন্ধ্যার ঘনান্ধকারে দিগন্ত ছাইয়া পড়িল। বন্যপশু সকল অন্ধকারে আনন্দিত হইয়া তাহাদের হিংসাকলুষিত ভৈরবরবে কোলাহল করিতে লাগিল। অজিতনাথ নির্ভীক—তবে সে অন্ধকারে তাঁহার গতিভঙ্গ হইয়া আসিল। একে বন্ধুর পার্ব্বত্য পথ, তাহাতে বনরাজি, আবার রজনীর আবাস।

অজিতনাথ তখন কি করিবেন, চিন্তা করিলেন। চিন্তা করিয়া স্থির করিলেন, কোন বৃক্ষোপরি গিয়া রাত্রি অতিবাহিত করা কর্ত্তব্য। রাত্রি প্রভাত হইলে আবার চলিয়া যাইতে হইবে। অজিতনাথ পার্শ্বস্থ এক বৃক্ষে উঠিবার চেষ্টা করিতেছিলেন,—সহসা অদূরে—সেই ঘন বনরাজির মধ্যে—পাহাড়তলে একটি আলোক দেখিতে পাইলেন। তাঁহার মনে হইল,—ওখানে কোন মানবের অবস্থান সম্ভব। হয় ত এই জনশূন্য পর্ব্বতগুহায় কোন

সংসারত্যাগী মহাপুরুষ, তাঁহার জীবনের জঞ্জাল বিদূরিত করিতে তপস্যাশ্রম স্থাপিত করিয়াছেন। অজিতনাথ তখন সেই দিকে গমন করিলেন। এক পর্ব্বতগুহা মন্দিরাকৃতিতে গঠিত। কিন্তু কবাট শূন্য। সেই গহ্বর মধ্য হইতে আলোকরশ্মি বিকীর্ণ হইতেছিল। অজিতনাথ সাহসে নির্ভর করিয়া সেই গহ্বর মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

গহ্বরের পরপর দুইটি প্রকোষ্ঠ। প্রথম প্রকোষ্ঠে উপস্থিত হইয়া অজিতনাথ যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার হৃদয় ভক্তিরসে আপ্লুত হইল।

অজিতনাথ দেখিলেন,—প্রস্তরময়ী দীর্ঘাকৃতি এক কালীমূর্ত্তি "নগ্না" নৃমুণ্ডমালিনী, লুলিতকুণ্ডলা, খড়্গধরা মহামায়া শবোপরি দণ্ডায়মানা। সম্মুখে বসিয়া এক লোহিত বসন বসনা রুদ্রাক্ষধারিণী তন্বী যুবতী—বনফুলে মাতৃ-চরণ অর্চ্চনা করিতেছে। অজিতনাথ অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া সে মোহন দৃশ্য দর্শন করিলেন।

রমণী অর্চ্চনা সমাপ্ত হইলে স্তবপাঠ করিয়া দেবীপদে প্রণাম করিল, তারপরে উঠিয়া পশ্চাতে চাহিল। অজিতনাথ সে রূপ দেখিয়া চমকিয়া একটু হটিয়া দাঁড়াইলেন।

রমণী যুবতী। রূপে স্বর্গীয় প্রভা বিচ্ছুরিত। সে মুখ, সে চোখ, সে লাবণ্য দেখিয়া অজিতনাথের স্বপ্ন-স্মৃতি মনে পড়িল। মনে পড়িল, স্বপ্নে যেন এই স্বর্গীয় মূর্ত্তিই তাঁহাকে দর্শন দিয়াছিল। মনে পড়িল, যে দিন মহারাষ্ট্র-শিবিরে তাঁহাকে ধৃত করিয়া লইয়া যাইতেছিল, সে দিন এই মূর্ত্তিকেই উদ্যানে পুষ্প-চয়ন করিতে দেখিয়াছিলেন।

যুবতী তাহার দীর্ঘায়ত নয়নদ্বয় বিস্ফারিত করিয়া বলিল,—

"তুমি আসিয়াছ? যদি আসিয়াছ, তবে আমার আতিথ্য গ্রহণ কর।"

অজিতনাথ বিস্ময়াবিষ্ট স্বরে উত্তর করিলেন,—"আমাকে আপনি কি করিয়া জানিলেন?"

রমণী মৃদু হাসিয়া বলিল,—"আমি তোমাকে তুমি বলিয়াছি, তুমিও আমাকে তুমি বলিও, আপনি বলিলে রাগ করিব। হাঁ, তুমি আসিবে, তাহা আমি জানিতাম। বোধহয় তুমি সাধন-বল বিশ্বাস কর। সাধন-বলে আমি ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান জানিতে পারি। যাক্ এখন ঐ স্থানে উপবেশন কর—মায়ের প্রসাদী ফলমূল কিছু ভোজন কর। তারপরে অন্যান্য সমস্ত কথা হইবে।"

অজিতনাথ রমণীর আদেশ পালন করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে সেই তেজস্বিনী রমণী অজিতনাথের অদূরে এক পাষাণ বেদীর উপরে উপবেশন করিল। অজিতনাথ বলিলেন,—"দেবি, আপনার পরিচয় জানিবার জন্য আমি নিতান্ত উৎকন্ঠিত হইয়াছি। অনুগ্রহ করিয়া আমায় পরিচয় দিবেন কি?"

রমণী তাহার দীর্ঘায়ত লোচনযুগল অজিতনাথের লোচন-যুগলের উপর সংস্থাপিত করিয়া বলিল,—"আমার পরিচয় তোমাকে দিব। কিন্তু আমার কতকগুলি কথা আছে, আগে তাহাই বলিতে চাই।"

অ। যদি দয়া হয়, তবে বলুন।

র। আমাকে দেখিয়া তোমার কি বোধ হইতেছে? আমি কি খুব সুন্দরী নই?

অ। আপনার মত সুন্দরী আমি আর কখনও দেখি নাই। বুঝি মানবে এমন রূপ সম্ভবে না।

র। তবে কি আমার রূপ উপভোগ করিতে তোমার ইচ্ছা হয়? যদি ইচ্ছা কর, তবে এরূপ তোমার উপভোগের জন্য দিতে পারি।

সুপ্ত মানবের পদতলে সূচী বিদ্ধ করিলে সে যেমন চমকিত বিত্রস্ত ও বিচলিত হইয়া উঠে, অজিতনাথ যুবতীর কথায় তদ্রূপ হইলেন। তিনি বলিলেন,—"তোমাকে দেবী বলিয়াই ভাবিয়াছিলাম, কিন্তু আমাকে কি ছলনা করিতেছেন? আমার কি চিত্ত পরীক্ষা করিতেছেন?"

রমণী তখন হাসিয়া উঠিল। তরল জ্যোৎস্নার ন্যায়—ধন্বন্তরী-কলস নিঃসৃত সুধাধারার ন্যায় সে হাসি অজিতনাথের হৃদয়ে প্রবেশ করিল। রমণী বলিল,—"না, না, অজিতনাথ; আমি ছলনা করি নাই। তুমি যদি ইচ্ছা কর, এই দণ্ডেই আমার রূপ ভোগ করিতে পার।"

অজিতনাথ অধিকতর বিস্মিত হইলেন। বলিলেন,—"কেমন করিয়া জানিব, তোমার মনের ভাব কি। কিন্তু এই বিজনারণ্যে—পর্ব্বতগুহায়—জনহীন স্থানে বাস কি কেবল রূপ বিলাইবার জন্য?

রমণী বলিল,—"আমার দুই শক্তি আছে। এক মাতৃ-শক্তি, অপর কুমারীশক্তি। মাতৃশক্তিতে পুরুষাশক্তি কুমারীশক্তিতে পুরুষানাসক্তি—শক্তিরপূজায় পুরুষ ভোগ হইতে জয়ী হয়। মাতৃশক্তিতে জগতের জীবস্রোত বৃদ্ধি পায়। এক ভোগ, অপরে নিবৃত্তি। তুমি যদি এ রূপ ভোগ করিতে চাও, আমি তোমাকে এ রূপ দান করিতে প্রস্তুত আছি। তুমি ভোগ কর।"

অজিতনাথ গদ্গদকণ্ঠে কহিলেন,—"না মা, আমি তোমার

কল্যাশক্তি চাই—আমি তোমায় মা বলিয়া ডাকিতে চাই। আমি তোমার স্বর্গীয়রূপ উপভোগ করিতে চাহি না। কিন্তু মা, তোমার স্বরূপ-পরিচয় প্রদান কর। তোমার পরিচয় জানিবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছি।

রমণী গম্ভীর স্বরে বলিল,—"তুমি একটু অপেক্ষা কর, আমি ফিরিয়া আসিয়া তোমাকে সমস্ত কথা বলিতেছি।"

রমণী উঠিয়া চলিয়া গেলেন। অজিতনাথ মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় সেই স্থানে বসিয়া রহিলেন।

চতুস্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হইল—অজিতনাথ সেই শবারূঢ়া মহাভীমা গভীর ঘনঘোরা প্রস্তরময়ী কালীমূর্ত্তি-সম্মুখে বসিয়া রহিলেন। অজিতনাথ সেখানে একা। গহ্বর-বাহিরে ভীমনাদে সিংহ-ব্যাঘ্র ভীষণ কোলাহল করিতেছিল। নৈশ বায়ু শন্ শন্ করিয়া বহিয়া বহিয়া গহ্বরমধ্যস্থ ক্ষীণশিখ অনাচ্ছাদিত প্রদীপকে কাঁপাইয়া দিতেছিল। অজিতনাথ রমণীর প্রতীক্ষায় সেই স্থানে বসিয়াছিলেন।

সহসা মেঘ ডাকিয়া উঠিল। প্রথমে অজিতনাথের মনে হইয়াছিল, বাহিরে কোন হিংস্র পশু রব করিতেছে—কিন্তু সত্বরেই সে ভ্রম বিদূরিত হইল। মেঘগর্জ্জনের সঙ্গে সঙ্গে বাতাসের বেগ বৃদ্ধি হইল,—এবং সেই সঙ্গে বৃষ্টিপতনের শব্দ হইতে লাগিল। বাতাস ক্রমে ঝড়ে পরিণত হইল—সম্মুখস্থিত

প্রদীপটা সেই প্রচণ্ড বাতাসের সঙ্গে প্রাণপণে কিয়ৎক্ষণ যুঝিয়া অবশেষে নিবিয়া গেল। গভীর অন্ধকারে সমস্ত গহ্বব পরিপূর্ণ হইল।

অজিতনাথ অটল। তাঁহার মনে দৃঢ়তা অপরিমিত। অজিতনাথ ভাবিলেন,—বাহিরে থাকিলে হয়ত এতক্ষণ মৃত্যুমুখে পতিত হইতাম, অদৃষ্টের বলে যে আশ্রয় পাইয়াছি, তাহাই যথেষ্ট। আরও এক কথা—অদৃষ্ট সম্ভবতঃ সুপ্রসন্ন; নতুবা এই অদ্ভুত রমণীর দর্শন পাইব কেন? ইনি নিশ্চয়ই কোন দেবী। কথার ভাবে বুঝিতে পারিলাম, ইনি যেন স্বয়ং কালভয়হারিণী কালী। নতুবা মাতৃত্ব ও কন্যাত্ব উভয় শক্তি আর কাহার আছে! কিন্তু—কালী আবার পাষাণের কালী পূজা করিবেন কেন? তিনি আসিবেন, বলিয়া গেলেন—এখনও আসিলেন না কেন? তবে কি আর আসিবেন না? যদি না আসেন, এই অন্ধকারে—এই জনশূন্য স্থানে একা থাকিব কি প্রকারে? গহ্বরের মুখ অনাবৃত—হয়ত সিংহ-ব্যাঘ্র এখানে চলিয়া আসিতে পারে। আলোক থাকিলে হয়ত আসিত না।

সহসা সেই গভীর অন্ধকার ভেদ করিয়া সূর্য্যরশ্মির ন্যায় আলোকরশ্মি প্রকাশ পাইল। অজিতনাথ পশ্চাৎ ফিরিয়া চাহিয়া দেখিলেন, সেই অপার্থিব জ্যোতির্ময়ী রমণী তাহাব পশ্চাৎ দিকে। তাঁহার হস্তে একখানি সুবর্ণথালা—সুবর্ণথালে একখানি প্রস্তর। প্রস্তরখানি হইতে সূর্য্যরশ্মিবৎ আলোক বিকীর্ণ হইতেছিল। রমণী ঘুরিয়া আসিয়া অজিতনাথের সম্মুখীন হইলেন।

অজিতনাথ বিস্ময়োৎফুল্ল স্বরে বলিলেন,—"মা, এসেছ? তোমার সন্তান তোমার ভাবনায় ভীত হইয়াছিল।"

রমণীর বিম্বাধরে হাসির একটু ক্ষুদ্র তরঙ্গ বহিয়া গেল। বলিলেন,—"হা, বঙ্গবাসী যুবক; তোমরা কি আমার ভাবনায় ভীত হও? তোমরা তোমাদের ভাবনায় ভীত হও: দারুণ অন্ধকার হইয়াছে—ঝড়ে জলে হিংস্র পশুরবে আত্মপ্রাণে ভয় পাইয়াছ—হয়ত আমি কাছে থাকিলে রক্ষা পাইবে, তাই আমার কথা মনে হইয়াছে। তোমার জন্য আমার কথা মনে হইয়াছে,—আমার জন্য আমার কথা মনে হয় নাই।"

রমণী পার্শ্বের একখণ্ড শিলাতলে উপবেশন করিলেন। হাতের স্বর্ণথালা পার্শ্বে রক্ষিত হইল। অজিতনাথ কথাগুলির কোনরূপ মর্ম্মোদ্ঘাটন করিতে সক্ষম হইলেন না।

তখন বাহিরের ঝড় জল থামিয়া গিয়াছিল। বৃষ্টিপাত-মৃদু সমীরণের সহিত নৈশফুল্ল কুসুমের মৃদুগন্ধ আসিতেছিল।

অজিতনাথ বিনীতস্বরে বলিলেন,—"আপনার কথা আমি বুঝিতে পারিলাম না।"

রমণী গম্ভীর অথচ মৃদুস্বরে বলিলেন,—"তা পারিবে না। এসব কথা বুঝিবার শক্তি তোমাদের আর নাই। শক্তিহারা হইয়াই তোমরা শব হইয়াছ।"

অ। "আপনি কে মা?

র। আমাকে অনেক লোকে অনেক নামে অভিহিত করিয়া থাকে। তোমার নিকট কি পরিচয় দিলে তুমি আমাকে চিনিতে পারিবে, জানি না। আমি যোগীর যোগশক্তি, ভোগীর ভোগ-শক্তি, ভক্তের ভক্তি, মুমুক্ষুর মুক্তি, ব্রহ্মচারীর ব্রহ্মচর্য্যশক্তি। সন্তানের জননী, কামীর কামিনী, পুরুষের প্রকৃতি, বৈরাগীর কুমারী। আমাকে চিনিতে পারিলে কি?

অ। না।

র। এই বিশ্ব আমারই মূর্ত্তি। আমি তোমাদের মা।

অ। মা.—এ তোমার কোন্ মূর্ত্তি ?

র। আমার যে মূর্ত্তি দেখিতেছ ?

অ। হাঁ।

র। তোমরা আমার সন্তান—আমি তোমাদের মা। সজলা সফলা, শস্যশ্যামলা, পর্ব্বতকুন্তলা, দ্রুমদলশোভিতা যে দেশে তোমরা বাস করিতেছ,—উহা আমারই মূর্ত্তি।

অ। তবে মা, সম্মুখের ঐ পাষাণ মূর্ত্তি ও কি তোমার ?

র। না,—সমুদ্রে আর তরঙ্গে যে ভেদ, জ্বলিত অনলে আর স্ফুলিঙ্গে যে ভেদ উহাঁতে আর আমাতে সেই ভেদ। উনি ত্রিগুণপ্রসবকারিণী, আর আমি গুণময়ী। উনি কালী—আমি কালের অধীন। কালের অধীন বলিয়াই আজ আমি নিরাশ্রয়া।

অ। কেন মা, তুমি নিরাশ্রয়া কেন ?

র। কাল আমার সর্ব্বস্ব হরণ করিয়াছে। আমি যোগীর যোগশক্তি—কিন্তু শক্তি লইয়াই আছি, কাল সে শক্তি আমার সন্তানে প্রদান করিতে দিতেছে না। আমার সব আছে—কিন্তু আমার সন্তানগণে ভক্তি নাই, ব্রহ্মচর্য্য নাই, ব্রহ্মণ্য নাই, বৈরাগ্য নাই। আমার সব থাকিতে সন্তানে অনুস্যূত হইতেছে না।

অ। কেন মা, মাতৃশক্তি সন্তানে প্রাপ্ত হইতেছে না কেন ?

র। বলিয়াছিত আমি কালের অধীন। কালের বুঝি তা ইচ্ছা নয়।

অ। যাহা কালের ইচ্ছা নয়, আর তা যদি না হইতে পারে, তবে তাহার জন্য দুঃখ কেন মা ?

র। দুঃখ করি না। চেষ্টা করি। কালও সাধনের বশ। সন্তানগণ যদি সাধন করে, তবে কালজয় করিতে পারে। তাই কালীর চরণে জবাবিল্বদল দিতেছি,—যদি কালভয়বারিণী আমার সন্তানগণের কালভয় নিবারণ করেন।

অ। সে সাধনা কি তুমি করিলেই তোমার সন্তানগণের কালভয় বিদূরিত হইবে?

র। না। সাধনা সকলেরই চাই। তুমি ব্রহ্মচারী,—চিত্তজয়ী, তাই আমার সাক্ষাৎ পাইয়াছ। এখন আমার একটি কথা শোন।

অ। কি কথা বল মা?

র। তুমি অদৃষ্ট মান কি?

অ। সমস্ত হিন্দুই অদৃষ্ট মানে, আমি মানিব না কেন? অদৃষ্ট ছাড়া পথ নাই—সে কথা আমি দৃঢ় বিশ্বাস করি।

র। অদৃষ্ট ছাড়া পথ নাই, কি কথা বলিতেছ? অদৃষ্ট রচায় কে?

অ। পুরুষকার।

র। পুরুষকারের জনক কে?

অ। কর্ম্ম।

র। তবে সেই কর্ম্মই প্রধান। তুমি গীতা পড়িয়াছ, গীতার অমৃত—উপদেশ অবগত আছ। তবে কেন ভুলিয়া যাইতেছ? আমার সন্তানগণ কর্ম্ম ভুলিয়া গিয়াছে,—অকর্ম্ম করিয়া যাইতেছে। তাই তাহাদের জীবনযোড়া দুঃখ। সৎকর্ম্ম বা অসৎকর্ম্ম যাহাই কর, তদ্দ্বারা অদৃষ্ট রচিত হইবেই। আমার সন্তানগণ অসৎকর্ম্ম করিতেছে,—অসৎ অদৃষ্ট সংগ্রহ করিয়া

দুঃখময় জীবন লইয়া জন্মগ্রহণ করিতেছে। যে যত ক্ষুদ্র,—দুঃখ তাহার তত বড়। যে আত্মদেহে প্রীত, আত্মপরিবারে অনুরক্ত, দুঃখ তাহাকে দাবানলের ন্যায় দগ্ধ করিয়া থাকে। ভগবান্ স্বয়ং বলিয়াছেন ঃ—

ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া॥
তমেব শরণং গচ্ছ সর্ব্বভাবেন ভারত।
তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্॥ *

এ শ্লোক ত তুমি পড়িয়াছ। জীবে জীবে ভগবান্—আমি প্রকৃতি বাহ্য পদার্থ বিরচন করি। অন্তরে অন্তরে পুরুষ—তবে তোমরা জীবে জীবে ভাই ভাই—এক হওনা কেন? যদি সুখ চাও—ক্ষুদ্রত্ব পরিত্যাগ কর, মহৎ হও। এক জন কাঁদিলে আর একজনের চক্ষুতে জল আসুক,—কেন একখানি মুখের দিকে চাহিয়া—একটু ক্ষুদ্র স্বার্থ লইয়া মরিতে হয়! এই মহা-পাপেই আমার বঙ্গ-সন্তানগণ দীর্ণ বিদীর্ণ, পশুপালের ন্যায় তাড়িত ও লাঞ্ছিত।

অ। বুঝিলাম সব মা,—তুমি আমাদের বঙ্গমাতা। তুমি প্রকৃতিরূপিণী—তুমি হৃদয়ের বল, দেহের শক্তি। কিরূপ সাধনায় তোমার সন্তানগণ আবার মানুষ হইতে পারে?

---

* অর্থ—"হে অর্জ্জুন। যেমন সূত্রধার দারুযন্ত্রে আরূঢ় কৃত্রিম ভূত সকলকে ভ্রমণ করাইয়া থাকে, তদ্রূপ ঈশ্বর ভূত সকলের হৃদয়ে অবস্থান করিয়া তাহাদিগকে ভ্রমণ করাইতেছেন। হে ভারত। এক্ষণে তুমি সকল বিষয়ে তাঁহারই শরণাপন্ন হও, তাঁহার অনুকম্পায় শান্তি ও শাশ্বত স্থান প্রাপ্ত হইবে।"

র। এক দিন তাহারা মানুষ ছিল,—আবার তাহাদের সেই পুরাণ আচার, পুরাণ ব্যবহার অবলম্বন করুক—আবার পরবিপদ বিনাশের জন্য আত্মদেহ বলি দিক্। তবেই দুঃখ ঘুচিবে। কিন্তু তার জন্য ব্রহ্মচারী হইতে হইবে। ব্রহ্মচারী ব্যতীত ত্যাগ স্বীকার করিতে পারে না। ত্যাগের কিছু থাকে না। না থাকিলে দিবে কি প্রকারে? এই জন্যই ব্রাহ্মণগণ নবম বর্ষ বয়সে গায়ত্রী দীক্ষা গ্রহণ পূর্ব্বক ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া গুরুগৃহে বাস করিতেন এবং দীর্ঘকাল ব্রহ্মচর্য্য ব্রত পালন করত দারপরিগ্রহাদি করিতেন। সেই জন্যই তাঁহারা পরোপকার সাধন করিতে পারিতেন—দেশের এবং দশের উপকার সাধন করিতে পারিতেন। তুমি ব্রহ্মচারী—সর্ব্বভূতে সমদর্শী। তাই তোমাকে দেখা দিয়াছি। তোমার দেশে হাহাকার উঠিয়াছে। অত্যাচারের প্রবল আগুনে—অবিচারের মহাগরলে দেশের লোক পুড়িয়া মরিতেছে। দেশে যাও—স্বদেশবাসীর উদ্ধারের জন্য আত্মবলি দাও—তোমার কল্যাণে তোমার দেশ হইতে অবিচার-অত্যাচার বিদূরিত হইবে।

অজিতনাথের অশ্রু পুলক ও রোমাঞ্চ উপস্থিত হইল। গদ্গদ-কণ্ঠে, আবেগ-রুদ্ধ স্বরে অজিতনাথ বলিলেন,—"মা মা, আমি ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র। আমার প্রাণ দিলে যদি দেশের লোকের সুখ-শান্তি ফিরিয়া আসে, আমি তাহা করিতে পারিব। কিন্তু মা, আমার শক্তিতে কি হইতে পারিবে?"

রমণী বলিলেন,—"বৎস, প্রাণ দিলে প্রেম মিলে। ঈশ্বর পরিতৃপ্তির নাম প্রেম। আর আত্মপ্রীতির নাম কাম। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমার দুই শক্তি—মাতৃ শক্তি ও কুমারী শক্তি।

কুমারী শক্তি আনন্দ শক্তি—আনন্দশক্তিতে প্রেম মিলে। জীবে জীবে ভগবান্,—জীবের প্রীতিই প্রেম। প্রেম বিস্তৃতি। ব্রহ্মচারী ব্যতিত প্রেমিক হইতে পারে না। তুমি যদি ক্ষুদ্র 'আমি'র গণ্ডীতে আবদ্ধ না হও, দেখিবে, তোমার দ্বারা সহস্র মানুষের কাজ হইবে। আর যদি তোমার বলিয়া একবার চিন্তা কর—সমস্ত শক্তি হারাইয়া বসিবে। প্রেমের বাঁধনে জগৎ বাঁধা পড়ে। কিন্তু স্মরণ রাখিও, বিশ্বামিত্র প্রভৃতি ঋষিরও ব্রহ্মচর্য্য ভঙ্গ হইয়াছিল। প্রাণপণে ব্রহ্মচর্য্য রক্ষা করিও। আপদে, বিপদে, সম্পদে, পরার্থে কাজ করিও—আর আমাকে মধ্যে মধ্যে মা বলিয়া ডাকিও।"

সহসা বাহিরে সিংহ-ব্যাঘ্রের ভীষণ কোলাহল শুনিতে পাইয়া অজিতনাথ পশ্চাৎ ফিরিলেন। অতি সন্নিকটে একটা ব্যাঘ্র থাবা পাতিয়া শিকারমুখী হইয়া বসিয়াছিল। অজিতনাথ তাড়াতাড়ি উঠিয়া লক্ষ্যস্থান হইতে সরিয়া দাঁড়াইলেন,—পার্শ্বে ফিরিয়া রমণীর দিকে চাহিলেন। সমস্ত অন্ধকার—সে আলো নাই রমণী নাই। ব্যাঘ্রের ভয়ে সে দিকে লক্ষ্য করিলেন, কিন্তু ব্যাঘ্র দেখিতে পাইলেন না। মনে হইল, হয়ত অন্ধকারে তাহাকে দেখা যাইতেছে না। অজিনাথ সরিয়া গুহার দিকে চলিয়া গেলেন। সমস্ত নিস্তব্ধ—সমস্ত নীরব।

তারপরে সেই স্থানে একা বসিয়া অজিতনাথ অবশিষ্ট রাত্রিটুকু কাটাইয়া দিলেন। যখন প্রভাত হইল—প্রভাতের আলোকে চারিদিক্ সুস্পষ্টরূপে দেখা গেল, তখন অজিতনাথ দেখিলেন, সেখানে কালীমূর্ত্তী বা কালীপূজার পুষ্প বিল্বদলের কোন চিহ্নও নাই। সেখানে যে লোক সমাগম হইয়াছিল, তাহার চিহ্নও

নাই। গহ্বরের উপর হইতে প্রভাতসমীরণ সংস্পর্শে বকুল-কুসুম বৃন্তচ্যুত হইয়া তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে এবং গহ্বর মধ্যে পতিত হইতেছিল।

পঞ্চত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

ঐন্দ্রজালিকের ইন্দ্রজাল-বিদ্যাসম্ভূত ব্যাপার সন্দর্শন করিয়া মানুষ যেমন কেমন এক প্রকার হতজ্ঞান হইয়া যায়, অজিত-নাথের সেইরূপ হইল। তাঁহার মনে হইতে লাগিল—এ কি ব্যাপার! ইহা কি আমার মনের উন্মাদকল্পনা! কিন্তু উন্মাদ-কল্পনায় এত শৃঙ্খলা থাকিবে কি প্রকারে? যে দিবস মহারাষ্ট্রীয় শিবিরে বন্ধনাবস্থায় লইয়া যায়, সে দিবস যে মূর্ত্তিকে কুসুম চয়ন করিতে দেখিয়াছিলাম,—সেই সুন্দরী মূর্ত্তিকে মহারাষ্ট্রীয় শিবিরে স্বপ্নে সন্দর্শন করিলাম। কেবল সন্দর্শন নহে, তাঁহার নিকট যে উপদেশ প্রাপ্ত হইলাম, তদ্দ্বারা মহারাষ্ট্র সর্দ্দারের রোগ আরোগ্য হইল—আমার মুক্তির পথ হইল। তারপরে স্পষ্টতররূপে এই গহ্বরে তাঁহাকে দেখিতে পাইলাম—বহুক্ষণ ধরিয়া তাঁহার সহিত কথা কহিলাম—সম্মুখে প্রস্তরময়ী নৃমুণ্ডমালিনী কালী দেখিলাম—কিন্তু সব কোথায় গেল! তিনি আমাদের জন্মভূমি বলিয়া পরিচয় দিলেন। জন্মভূমি! জন্মভূমি কি জীবন্ত পদার্থ?

অজিতনাথের মস্তক ঘুরিয়া গেল। কিছুই ঠিক হইল না। তখন তিনি উঠিয়া ধীরে ধীরে সে স্থান হইতে বাহির হইলেন, এবং সেই বিজনারণ্য হইতে দক্ষিণাভিমুখে গমন করিলেন।

অবিশ্রান্ত গমন করিয়া সন্ধ্যার সময় একটি পল্লীতে উপস্থিত হইলেন। সেখানে কতকগুলি পার্ব্বতীয় জাতির বসতি—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পর্ণ-কুটীর। কুটীরে কুটীরে শীর্ণশিখা আলো জ্বলিতেছে। পথের ধারে বনের পাতা জ্বালাইয়া কতকগুলি স্ত্রীপুরুষ ঘিরিয়া বসিয়া বিশ্রান্তালাপ করিতেছিল। অজিতনাথ তথায় উপস্থিত হইলেন।

একজন বৃদ্ধ বলিল,—"আপনি কে? পরিচ্ছদ দেখিয়া বাঙ্গালী সন্ন্যাসী বলিয়া বোধ হইতেছে। এখানে কি মনে করিয়া আসিয়াছেন?

অজিতনাথ বিনীত স্বরে বলিলেন,—"হাঁ, তুমি ঠিক অনুমান করিয়াছ, আমি বাঙ্গালী সন্ন্যাসী। মহারাষ্ট্রীয় সৈন্যেরা আমাকে ধরিয়া লইয়া তাহাদের শিবিরে কয়েদ করিয়া রাখিয়াছিল,—তার-পরে এখন ছাড়িয়া দিয়াছে। আমি দেশে যাইতেছি।"

বৃদ্ধ বলিল,—"ঠাকুর; পথ ভুলিয়া ঘুরিয়া পড়িয়াছ। মহা-রাষ্ট্র শিবির হইতে পিছাইয়া দুই দিনের রাস্তা আসিয়াছ। এখন এখান হইতে পাঁচ দিনের পথ গেলে, তবে বঙ্গদেশে পৌঁছাইতে পারিবে।"

অ। আ'জ আমি তোমাদের অতিথি। ক্ষুৎপিপাসায় বড় কাতর হইয়াছি।

বৃদ্ধ, অজিতনাথকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়া এক পর্ণকুটীরে উপস্থিত হইল, এবং তাহার এক কন্যাকে ডাকিয়া অতিথি সেবা করিতে বলিল। কন্যাটির বয়স দশ বৎসরের উপর নহে,—মাথায় ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া কালো কালো চুল—দেহ হৃষ্টপুষ্ট। সে আসিয়া পরিচিতের ন্যায় অজিতনাথকে সম্বোধন করিল। তারপর

জিজ্ঞাসা করিল,—"তুমি কি খাও? আমাদের মত মাংস খাও কি?"

অজিতনাথ বলিল,—"না না, আমি মাংস খাই না। একটু জল আর কিছু ফল।"

কন্যাটি তাহার কচি মুখে এক গা'ল হাসি হাসিয়া বলিল—"বুঝিয়াছি. তুমি ঠাকুর। ভাল, একটু অপেক্ষা কর—আমি একটা মহিষ দুহিয়া এক ঘটী দুধ আনিয়া দিতেছি।"

বালিকা ছুটিয়া গেল। কিয়ৎক্ষণপরে এক ঘটী দুধ, একটু জল ও কিছু ফল আনিয়া অজিতনাথের নিকট দিল। অজিতনাথ তখন একটা কুটীরদাওয়ায় উত্তরীয় বিছাইয়া শয়ন করিয়াছিলেন। বালিকার আগমনে তিনি উঠিয়া বসিলেন,—বালিকা তাঁহাকে সেগুলি আহার করিতে বলিল।

অজিতনাথ যথাসাধ্য সেবন করিলেন.—বালিকা আরও খাইবার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিল। অজিতনাথের দুই চক্ষু জলে পূর্ণ হইল—মনে মনে বলিল, "মা! এই তোমার কুমারী মূর্ত্তি। এ মূর্ত্তিতে তুমি সরলা—বিশ্বপালিনী। কুটিলতা ও আত্মপ্রীতি বিহীনা। আমি তোমার কেহ নহি—নবাগত জীবমাত্র, তথাপি আমার উপর কত স্নেহ।"

অজিতনাথ বালিকাকে মিষ্ট কথায় তুষ্ট করিলে. সে উঠিয়া গেল। অজিতনাথ সেই দাওয়ায় পড়িয়া নিদ্রা গেলেন। প্রভাত হইলে উঠিয়া বৃদ্ধকে ডাকিয়া পথের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন,—বৃদ্ধ সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়া পথ দেখাইয়া দিয়া আসিল।

পথে প্রায় পাঁচ ছয় দিন নানাবিধ কষ্ট সহ্য করিয়া দেশে গমন করিলেন।

দেশ বলিতে তাঁহার নিজ বাড়ী। সেখানে গিয়া দেখিলেন, বসন্তরাণী সেখানে নাই। গ্রাম প্রজাশূন্য—শূন্য গৃহ সকল খা খা করিতেছে। পার্শ্ববর্ত্তী পাঁচ খানা গ্রামের ঐরূপ দশা। গৃহ-পালিত পশু নাই, গৃহে মানব নাই,—কেবল গ্রাম্য কুকুরগণ গ্রাম্য লোকের অভাবে দ্বারে দ্বারে ছুটিয়া বেড়াইতেছে, আর বনের শৃগালেরা বন ছাড়িয়া গৃহস্থের প্রাঙ্গণে বাসা গাড়িয়াছে।

অজিতনাথ ইহার কারণ স্থির করিতে পারিলেন না, সহসা দেশের কি হইল—কেন সমস্ত লোক গ্রাম ছাড়িয়া পলায়ন করিল।

তখন অজিতনাথ একবার জমিদার বাড়ী যাইবার কল্পনা করিলেন, ভাবিলেন, সেখানে গেলে সমস্ত সংবাদ অবগত হইতে পারা যাইবে।

যেমন চিন্তা, অজিতনাথ অমনি উঠিয়া গমন করিলেন। তখন প্রায় সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছিল,—সূর্য্যের শেষ রশ্মিটুকু দিগন্তের কোলে লুকাইয়া পড়িয়াছিল। বিহগমিথুন মিলিত হইয়া বাসায় ফিরিতেছিল। অজিতনাথ নদীকূলের পথ ধরিয়া চলিতেছিলেন।

সহসা একজন বৃদ্ধের সহিত সাক্ষাৎ হইল। বৃদ্ধের সর্ব্বাঙ্গে রক্তের দাগ—মুখে বিষাদের কালি ঢালা। চক্ষু কাঁদিয়া কাঁদিয়া ফুলিয়া গিয়াছে। সেমূর্ত্তি দেখিয়া অজিতনাথ চমকিয়া উঠিলেন। বলিলেন,—"তুমি কে?"

বৃদ্ধ শুনিয়াও শুনিল না, হন্ হন্ করিয়া চলিয়া যাইতেছিল। অজিতনাথ তাহার পথ আগুলিয়া দাঁড়াইলেন এবং পুনরপি করুণকণ্ঠে বলিলেন,—"তুমি কে? তোমার অবস্থা দেখিয়া প্রাণ ফাটিয়া যাইতেছে, আমার নিকট স্বরূপ পরিচয় দাও।"

সে করুণ-কোমলস্বর বৃদ্ধের হৃদয় স্পর্শ করিল। বৃদ্ধ দাঁড়াইয়া তাহার স্ফীত নয়নের তীব্র চাহনিতে অজিতনাথের সর্ব্বাঙ্গ নিরীক্ষণ করিল। তারপরে রুদ্ধস্বরে বলিল,—"মহাশয়, কথা কহিবার শক্তি আমার নাই। আজ তিন দিন জমিদারের কাছারিতে আবদ্ধ ছিলাম। প্রহারে প্রহারে সর্ব্বাঙ্গ কাটিয়া রক্তধারা ছুটিয়াছে। আজ ছাড়িয়া দিয়াছে—তাই চলিয়াছি।"

দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া অজিতনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কেন তুমি জমিদারের কি করিয়াছিলে?"

আর একবার অজিতনাথের সর্ব্বাঙ্গ উত্তমরূপে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিয়া বৃদ্ধ বলিলেন,—"মহাশয় কি এদেশের লোক নহেন, অথবা আপনি কি এদেশে নূতন আসিয়াছেন?"

অ। হাঁ, আমি আপাততঃ এদেশে নূতন আসিয়াছি।

বৃ। চারিদিকে গ্রামসকল জনশূন্য—সকলে পলাইয়া বনে বনে মাথা গুঁজিতেছে। টাকার জন্য লোকের মান সম্ভ্রম জাতি—অবশেষে দেহ পর্য্যন্ত যাইতে বসিয়াছে। টাকার জন্য লোক ধরিয়া লইয়া গিয়া জমিদারে কয়েদ করিয়াছে—প্রহারে প্রহারে সর্ব্বাঙ্গ জর্জ্জরিত করিয়াছে—মুখের গ্রাস কাড়িয়া লইয়াছে—গৃহ শূন্য করিয়াছে। তারপরে আরও চাই—কুলের কুলবধূ টানিয়া কাছারি লইয়া গিয়াছে—স্বামী শ্বশুর পিতা ভ্রাতা প্রভৃতির সম্মুখে তাহার সতীত্ব নষ্ট করিতেছে—উদ্দেশ্য টাকা।

অ। ইহা কি জমিদারের লোক করিতেছে?

বৃ। আজ্ঞা হাঁ।

অ। তোমরা কেন জমিদারকে জানাও নাই।

স্ব। জানাইতে বাকি নাই। তিনি নিরুত্তর—অধিক বলিলে কয়েদ করেন।

অ। তাঁহার উপরেও লোক আছে,—ফৌজদার সাহেব নবাবের নিয়োজিত—দেশের শান্তি রক্ষার্থে নিযুক্ত; তাঁহার নিকট জানান হয় নাই কি?

স্ব। সেখানেও জানান হইয়াছিল—একই ব্যবস্থা। অধিকন্তু ফৌজের সঙ্গিনের গুঁতা।

অ। তবে নবাবের নিকটে যাও নাই কেন?

স্ব। সেখানে জানাইতে অনেক কষ্ট—অনেক সাধ্য সাধনা। কিন্তু প্রজাগণ নাকি বিদ্রোহী। বিদ্রোহী প্রজাগণকে যথোচিত শিক্ষা দিবার জন্য আদেশ করিয়া শৃগাল কুকুরের ন্যায় বিতাড়িত করিয়া দিয়াছেন।

অ। দিল্লীর বাদসাহ আছেন—আর সকলে কর্ম্মচারী, তিনি আমাদের রাজা—সেখানে জানাইলে সর্ব্বদুঃখ মোচন হইবে।

স্ব। মহাশয় আপনি এবিষয়ে ভুক্তভোগী নহেন। আমরা ভুগিয়া ঠেকিয়া শিখিয়াছি। দিল্লীর বাদসাহ—প্রজা চাহেন না, চাহেন অর্থ। তিনি এ দেশবাসী নহেন—বিদেশী। দেশের মায়া তাঁহার নাই—সাতসমুদ্র-তেরনদী পার হইয়া এদেশে আসিয়াছেন, অর্থ গ্রহণ করিতে,—এদেশে আসিয়াছেন, তাঁহার স্বজাতির অন্নসংস্থান করিতে। তাঁহার স্বদেশীয়েরা বলিতেছে, প্রজারা বিদ্রোহী হইয়াছে—আপনাকে ভারত-ছাড়া করিবার চেষ্টা করিতেছে; কাজেই তিনি ভীত হইয়াছেন—আমাদিগকে বিষ-নয়নে দেখিতেছেন। দিল্লীর সম্রাটের নিকট উপস্থিত হইয়া সকল বেদনা জানাই, সে সাধ্য আমাদের নাই,—মোক্তার

দিয়া দরখাস্ত করিয়াছিলাম,—বিচারে আমাদের বন্ধনের আদেশ হইয়াছে। একজন সেনাপতিও নাকি বঙ্গদেশে আসিতেছে।

অজিতনাথ অনেকক্ষণ নিস্তব্ধে চলিলেন। তারপরে দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন, "মহারাষ্ট্রীয়েরা এদেশের উপর এখনও কি অত্যাচার করিতেছে?"

র। এদেশ কামধেনু—যাহার দুধের প্রয়োজন, সেই দুইয়া লইতেছে। টানের চোটে অস্থির হইলে প্রহারে দেহ কাটিতেছে।

অ। সম্রাট বাহুবলে দেশ জয় করিয়াছেন, দেশের অর্থ না হয়, তিনিই লইবেন,—তিনিত মহারাষ্ট্রীয়গণকে তাড়াইয়া দিতে পারেন?

র। সন্ধি-সর্ত্ত আছে। সম্রাট সে সন্ধি ভঙ্গ করিতে পারেন না. যদি বঙ্গদেশ সম্রাটের স্বদেশ হইত, বঙ্গবাসী যদি সম্রাটের স্বদেশবাসী হইত, তবে তিনি লুণ্ঠন নিবৃত্তির জন্য চেষ্টা করিতেন।

অ। তবে কি কোন উপায় নাই?

র। না,—এখন উপায় যম। বুঝি বঙ্গবাসীর মরণই শান্তির উপায়।

অ। আর এক উপায় আছে।

র। কি উপায় মহাশয়?

অ। সন্তানের দুঃখ মা যেমন বুঝেন, এমন আর কেহ বুঝে না। যে সন্তান মায়ের নিকট কাঁদিয়া আপন যাতনা বলিতে পারে, মা তার সব যাতনা দূর করেন।

র। আমাদের মা কে?

অ। যাঁহা হইতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি। আমাদের জন্মভূমি। ডাক ভাই মাকে ডাক। আমাদের সর্ব্ব দুঃখ দূর হইবে।

বৃ। কেমন করিয়া ডাকিতে হয়? আমরা জানি না— আপনি আমাদিগকে শিখাইয়া দিন।

অ। ভাই ভাই মিলিত হইয়া এক প্রাণে একতানে "মা" বলিয়া ডাকিতে হয়। তুমি এখন কোথায় যাইবে?

বৃ। সে কথা পরে বলিব—যদি ইচ্ছা হয়, আপনি আমার সঙ্গে চলুন।

ষট্‌ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

—০—

বৃদ্ধের কথার ভঙ্গীতে অজিতনাথ বুঝিতে পারিলেন, বৃদ্ধ তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করিতে পারে নাই; তাই তাঁহাকে তাহার বাড়ীর ঠিকানা বলিতে সাহস করিল না। এরূপ সময়ে —অত্যাচার-পীড়িত-হৃদয়ে বিশ্বাস সহজে আইসে না। অজিতনাথ বলিলেন,—"বোধহয়, আমাকে তুমি সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করিতে পার নাই। তাই তোমার বাটীর ঠিকানা বলিতেছ না। কিন্তু আমিও প্রজা,—আমিও তোমাদের। আমাকে অবিশ্বাস করিও না।"

বৃদ্ধ বলিল,—"না, আপনাকে আমি অবিশ্বাস করিতেছি না। কিন্তু আমি যেখানে যাইব, সে এক অতি গোপনীয় স্থান। সে স্থানের কথা কাহাকেও বলিতে নিষেধ। এদেশ বাসীর মান-সম্ভ্রম জাতিকুল এখন সেই স্থানে অবস্থিত।"

অ। সেস্থানের কথা যদি বলিতে নিষেধ, তবে আমাকে তথায় লইয়া যাইবে কি প্রকারে?

ব্র। আপনি যদি আমার সঙ্গে যান, আপনাকে অন্যত্র রাখিয়া যাইব,—সেখানে লইয়া যাইব না। তবে যেখানে রাখিয়া যাইব, সেখানে অনেক প্রজার সহিত আপনার সাক্ষাৎ হইবে। দশজনের সহিত সাক্ষাৎ হইলে, আপনি তাহাদের সহিত দেশের বিষয়ে পরামর্শ করিতে পারিবেন, এবং তাহাদিগকে মাতৃ-মন্ত্রে দীক্ষা দিতে পারিবেন।

অ। আমি জমিদার বাড়ী যাইতেছিলাম,—তাহা আর যাইব না। এখন তোমার সঙ্গেই যাইব। কিন্তু একটি কথা জিজ্ঞাসা করিব।

ব্র। কি কথা ঠাকুর?

অ। যে স্থানে গেলে দেশের দশজনের সহিত সাক্ষাৎ হইবে বলিতেছ, সে কি কোন গ্রাম?

ব্র। না ঠাকুর, কোন গ্রামে আমাদিগের তিষ্ঠান দায় হইয়াছে। তাই দেশের অনেক লোক জঙ্গলে আশ্রয় লইয়াছে,—যাহারা দুর্ব্বল, ভীরু অথবা বালক, বৃদ্ধ, কিম্বা স্ত্রীলোক তাহারা আপাততঃ দূরদেশে চলিয়া গিয়াছে।

অ। যাহারা আছে, তাহারা কি করিতেছে?

ব্র। কিসে জমিদারের কঠোর অত্যাচার হইতে দেশ রক্ষা পায়, তাহারই চিন্তা করিতেছে।

অ। চল, আমি সেখানে যাইব। কিন্তু তুমি কোথায় যাইবে? বোধহয় তোমার বাড়ী।

ব্র। না ঠাকুর, আমার বাড়ী জনশূন্য। সেখানে এখন কেহ

নাই। পুরুষানুক্রমিক-যত্ন-চেষ্টাগঠিত বাড়ী এখন জনশূন্য,—বন্য পশুর আবাসস্থল। আর আমরা বনে বনে ফিরিতেছি।

অ। তবে কোথায় যাইবে?

বৃ। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, যেখানে যাইব, সেখানকার নাম বলিব না। তবে আপনিও শুনিবার জন্য নিতান্ত উৎসুক হইয়াছেন, বুঝিতেছি। তাই স্থানের নাম গোপন রাখিয়া বলিতেছি,—আমি আমার এক কন্যাকে দেখিতে যাইব।

অ। সে কন্যা কোথায়? তুমি একটু আগে বলিলে, দুর্ব্বল বালক বৃদ্ধ ও রমণীগণকে দূরদেশে পাঠাইয়া দিয়াছ, তবে কি সেই দেশে যাইবে?

বৃ। সকলের ভাগ্যে কি আর সে সুবিধা ঘটিয়াছে। যখন প্রজাগণ টাকা দিয়া দিয়া আবার দিতে অসমর্থ হইয়া পড়িল,—তখন জমিদারের জামাই গৃহপালিত পশু-আদি বিক্রয় করিয়া লইল। কিন্তু তাহাতেও তাহাদের পাপ-বাসনা নিবৃত্তি হইল না। তখন,—তখন যাহা করিল, তাহা শুনিলে পাষাণও গলিয়া যায়। আমাদের কুলবধূ,—কুলকন্যা প্রভৃতি ধরিয়া লইয়া গিয়া কাছারি বাড়ীতে, আমাদেরই সম্মুখে নানাবিধ অত্যাচার করিতে আরম্ভ করিল।

কথা বলিতে বলিতে বৃদ্ধ কাঁদিয়া ফেলিল। অজিতনাথের চক্ষুর্দ্বয়ও জলে পূরিয়া গেল। বলিল,—"তারপর?"

বৃ। তারপর যাহা ঘটিল, তাহা দৈব-দয়া। এক মহা-তেজস্বিনী রমণী কোথা হইতে দেশে আবির্ভূত হইলেন। তিনি গ্রামে গ্রামে ফিরিয়া রমণীগণকে অভয় প্রদান করিতে লাগিলেন। যাহাদিগকে জমিদারী কাছারিতে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল,

তাহাদিগকে জানি না কোন্ উপায়ে বিমুক্ত করিয়া লইলেন। এখন তিনি তাহাদিগকে লইয়া এক পর্ব্বতগুহায় আশ্রয় লইয়াছেন,—সেখানে এক অপূর্ব্ব শক্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। আমার মেয়েও সেখানে আছে, আমি একবার সেখানে তাহাকে দেখিতে যাইতেছি।

অ। তুমি এতদিন কোথায় ছিলে?

বৃ। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমাকে কাঁছারিতে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। প্রহারে প্রহারে দেহ জীর্ণ করিয়া দিয়াছে;—মেয়েটিকে সেই দেবী লইয়া গেলে, অত্যাচার আরও বাড়াইয়াছিল,—তারপরে কোন প্রকারে উপায় নাই দেখিয়া এখন ছাড়িয়া দিয়াছে।

অ। তুমি সেখানে যখন আবদ্ধ ছিলে, তখনই কি তোমার মেয়েকে সেই রমণী লইয়া গিয়াছেন?

বৃ। হাঁ।

অ। তুমি কি পূর্ব্ব হইতেই জানিতে যে, সেই রমণী এক আশ্রয় প্রস্তুত করিয়া অত্যাচার-পীড়িতা রমণীগণকে উদ্ধার করিয়া লইয়া গিয়া তথায় আশ্রয় দিতেছেন?

বৃ। হাঁ, তাহা জানিতাম। জানিতাম বলিয়াই যখন শুনিলাম, আমার কন্যা পলাইয়াছে, তখন বুঝিতে পারিলাম, সেই নারী রূপিণী দেবী আমার কন্যাকে লইয়া গিয়াছেন, এবং তাই ভাবিয়াই এত অত্যাচার-পীড়িত হইয়াও আশ্বস্ত থাকিতে পারিয়াছিলাম।

অ। চল, এখন আমরা চলিয়া যাই। রাত্রি হইয়া আসিয়াছে—আজ বড় অন্ধকার রাত্রি।

বৃ। ঠাকুর, এ অন্ধকার হইতেও দেশ নিবিড় আঁধারে ডুবিয়াছে।

আর কোন কথা হইল না। উভয়ে তথা হইতে পূর্ব্বাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন।

রাত্রি যখন দ্বিপ্রহর, তখন তাঁহারা এক ঘন নিবিড় জঙ্গলে প্রবেশ করিলেন। একে কৃষ্ণ পক্ষের ঘন-ঘোরা রজনী,—তাহাতে ঠেসাঠেসি, মেশামেশি অগণ্য বৃক্ষশ্রেণী, সেখানে বিশ্বের অন্ধকার জমাট পাকাইয়া ছিল। কিছু মাত্র দৃষ্টিগোচর হইতেছিল না। অজিতনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন,—"এই বনের মধ্যে যাইতে হইবে কি?

বৃদ্ধ বলিল,—"শুনিয়াছি, এই বনের মধ্যেই দেশের অনেক লোক আশ্রয় লইয়াছে।"

অ। তুমি কি তাহাদের নিকট কোন দিন যাও নাই?

বৃ। না। তবে আমি বিশ্বস্ত সূত্রে জানি, তাহারা এই বনে আছে।

অ। থাকিলেও এই অন্ধকারে সন্ধান করা দুর্ঘট হইবে। পাপহীন জানিলে—এই অন্ধকারে কেমন করিয়া যাইব?

বৃদ্ধ চিন্তিত হইল। অজিতনাথ বলিলেন,—"সে রমণীর আশ্রম কোথায়?"

বৃ। সে এদিকে নহে। ত্রিস্রোতার দক্ষিণ পারে গ্রামসমূহে এখনও এ অশান্তি প্রবেশ করে নাই। সে সকল জনপদে কৃষ্ণগোবিন্দের জমিদারি নহে। সেখানে তাঁহার কঠোর অত্যাচার প্রবেশ করে নাই। সেই রমণী সেই দেশে আছেন,—তাঁহার আশ্রিত রমণীগণকেও সেই দেশে লইয়া গিয়াছেন।

অ। এখন আমরা কোথায় যাইব, ভাবিতেছ?

বৃ। আমি আর পথ ঠিক করিতে পারিতেছি না। আপনার যাহা বিবেচনা হয়, করুন।

সহসা পার্শ্ব বনরাজি নড়িয়া উঠিল। বৃদ্ধ ভয় পাইল, অজিতনাথ সতত নির্ভয়-চিত্ত—তিনি নির্ভয়ে সে দিকে চাহিলেন।

গাঢ় অন্ধকারে এক দীর্ঘাকার মনুষ্যমূর্ত্তি দেখা গেল। মূর্ত্তি অতি নিকটে। অজিতনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কে তুমি?"

মূর্ত্তি আরও নিকটে আসিল। বলিল,—"তোমাদের কোন ভয় নাই; আমি মানুষ—আশ্রয় হীন, স্বজন হীন,—কৃষ্ণগোবিন্দের অত্যাচার-পীড়িত প্রজা।"

বৃদ্ধ এত ভয় পাইয়াছিল যে, সহসা কোন কথা কহিতে পারিল না। অজিতনাথ বলিলেন,—"আমরা আপনাদিগেরই অনুসন্ধানে যাইতেছিলাম, কিন্তু অন্ধকারে পথ ঠিক করিতে অক্ষম হইয়াছিলাম। আপনার নাম কি?

সে বলিল,—"আমার নাম শঙ্কর চক্রবর্ত্তী। আমি ঘাটির মুখে—এই জঙ্গলে অধিকাংশ সময় থাকি। আপনাদের ভয়ের কথা শুনিয়া আমাদের বন্ধু জানিয়া দেখা দিয়াছি। নতুবা—

অ। নতুবা কি করিতেন?

র। নতুবা গলা টিপিয়া মারিয়া ফেলিতাম। শত্রুদিগকে এ জঙ্গলে প্রবেশ করিতে দিই না। এখন চলুন, আপনাদিগকে লইয়া যাই।

অ। কোথায় লইয়া যাইবেন?

র। আপনারা যেখানে যাইবার জন্য এ জঙ্গলে প্রবেশ করিয়াছেন।

অ। তবে চলুন।

তখন আর কোন কথা হইল না। শঙ্কর চক্রবর্ত্তী সর্ব্বাগ্রে, বৃদ্ধ মধ্যস্থলে এবং অজিতনাথ তৎপশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন।

সপ্তত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

অনেকক্ষণ পরে এক পর্ব্বত-পাদদেশে কয়েকটি আলোক-শিখা দেখা গেল। অজিতনাথ শঙ্কর চক্রবর্ত্তীকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"মহাশয়, ঐ স্থানে কি দেশের দশ জন অবস্থান করিতেছেন ?"

শঙ্কর চক্রবর্ত্তী বলিলেন,—"হাঁ মহাশয়, আপনি ঠিক অনুমান করিয়াছেন।"

আরও কিয়ৎক্ষণ গমনের পরে তাহারা তিন জনে সেখানে উপস্থিত হইল।

পর্ব্বতের সানুদেশে অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পর্ণকুটীর রচিত হইয়াছিল। সেখানে অনেক লোক বাস করিতেছিল। সকলেই পুরুষ,—সকলেই বলবান্।

শঙ্কর চক্রবর্ত্তী দীর্ঘদেহী এবং বলবান্। সে একজনের নিকটে উপস্থিত হইয়া বৃদ্ধ ও অজিতনাথের কথা জানাইল। বৃদ্ধ ও অজিতনাথকে নিকটে বসাইয়া তিনি বলিলেন, "আমি উভয়কেই চিনিয়াছি। তোমার নাম অজিতনাথ। অজিতনাথ, তুমি কি আমায় চিনিতে পারিয়াছ ?"

অজিতনাথ সেই ব্যক্তির মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন,—"বাঁড়ুয্যে মহাশয়—আপনাকে আমি চিনিতে পারি নাই ?"

বাঁড়ুয্যে মহাশয়ের চক্ষুতে জল আসিল। তিনি বলিলেন,—"দেশের অবস্থা বড় ভয়ানক। কিসে দেশ রক্ষা হইবে, সেই চিন্তাতে অস্থির হইয়া পড়িয়াছি। তোমাকে জানি, তুমি স্বদেশপ্রেমিক—স্বদেশ, স্বজাতি ও স্বধর্ম্মের জন্য তোমার আন্তরিক অনুরাগ। তুমি আসিয়াছ ভাল হইয়াছে। এখন যাহাতে দেশ ও দেশের নর-নারী রক্ষা পায়, তাহা কর।"

অ। এখানে আপনারা কতজন আছেন ?

বাঁ। অধিক নয়—চারি পাঁচ শো জন হইব।

অ। আপনারা দেশের দুরবস্থা-মোচনের জন্য কি উপায় স্থির করিতেছেন ?

বাঁ। দেশোদ্ধারের জন্য যুদ্ধ করিব। এই স্থানে—এই গোপনীয় জঙ্গলে আমরা গোলা-গুলি, কামান বন্দুক অস্ত্র-শস্ত্র প্রস্তুত করিতেছি।

অ। চারি পাঁচ শত লোক জমিদারের তোপের মুখে একমুঠা তূলা মাত্র।

বাঁ। যুদ্ধ করিতে কি তোমার ভয় হয় অজিতনাথ ? দেশের জন্য মরিতে কি তোমার আনন্দ হয় না অজিতনাথ ?

অ। শুধু মরণেই যদি দেশের দুরাবস্থা দূর হয়, আমি আনন্দে মরিতে পারি। কিন্তু তাহা হইবে না। আর এক কথা—দিল্লি হইতে এক জন মুসলমান সেনাপতি অনেক সৈন্য লইয়া এদেশ শাসন করিতে আসিতেছেন।—সে কথা কি সত্য ?

বাঁ। হাঁ সত্য।

অ। নবাব-সৈন্য, ফৌজদারের ফৌজ, জমিদারের সামন্ত সৈন্য, সবই তাহাদিগের সহিত যোগ দিতে পারে ?

বাঁ। পারে কি, নিশ্চয় দিবে।

অ। মহারাষ্ট্রীয়গণও লুণ্ঠনে ক্ষান্ত হয় নাই—নিত্য নিত্য শত শত নরনারী কণ্ঠরুধিরের সহিত অপহরণ করিতেছে।

বাঁ। তাহাত চক্ষুর উপরেই দেখিতেছি।

অ। এতগুলি প্রবল শক্তির সহিত আপনারা এই কয়জনে কি করিতে পারিবেন। মুহূর্ত্তে মরণসাথী হইতে হইবে। মৃত্যুভয়ের কথা বলিতেছিলেন, কিন্তু আপনি আমি মরিলেই দেশের উপকার হইবে না।

বাঁ। তবে কি কোন উপায় নাই ?

অ। উপায় আছে।

বাঁ। সে উপায় কি ?

অ। মাতৃপূজা।

বাঁ। বুঝিতে পারিলাম না।

অ। জননী জন্ম-ভূমি এক মহাশক্তি। সেই মহাশক্তির পূজার্থে সমস্ত সন্তানগণের এক হইতে হইবে। মানুষ যদি জানিতে পারে, তাহারা এক মায়ের সন্তান, তবে পরস্পরে পরস্পরের সুখ-দুঃখের ভাগী হয়। আরও মাকে চিনিতে পারিলে, জানিতে পারিলে বুঝা যাইবে, মা আমাদের অত্যাচারগ্রস্তা, তুমি আমি ক্ষুদ্র—মরণ সাথী; দুদণ্ডের স্থায়ী। কিন্তু মা আমাদের অনন্তকালস্থায়িনী, তাঁহার দুঃখ দূর করিয়া মরণই মানুষের কর্ত্তব্য। যে সন্তান মায়ের দুঃখ দূর করিতে চেষ্টা

করিল না, তাহার জন্মই বৃথা। অতএব আমাদিগকে দেশের লোকের দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া মাতৃ-শক্তি ও মাতৃপূজার কথা বলিতে হইবে। যখন দেখিবে দেশের নর-নারী সকলে মাকে চিনিয়াছে —মায়ের মহাশক্তি বুঝিয়াছে,—মাতৃপূজা করিতেছে—তখনই দেশ উদ্ধার হইবে,—অত্যাচারীর প্রবল অত্যাচার হইতে নর-নারী সকলে পরিত্রাণ পাইবে।

বা। তোমার কথা বুঝিয়াছি,—সকলে একতা না হইলে অত্যাচারীর অত্যাচার নিবারণ হইবে না।

অ। হাঁ, তাহা নিশ্চয়। কিন্তু উহার মধ্যে আরও তত্ত্বকথা আছে।

বা। সে কথা কি?

অ। আপনি যেরূপ ভাবে কথা বলিলেন, তাহাতে বুঝিতে পারা গেল, দেশের লোক সব এক হইয়া অত্যাচারীর সঙ্গে যুদ্ধ করিলে তাহার পতন হইবে। কিন্তু কেন হয়, সে কথার—সে তত্ত্বের ভাব যেন ভাসা-ভাসা হইল। সে তত্ত্ব আরও প্রগাঢ়— আরও মহৎ।

বা। তাহা আমাকে বল।

অ। সে তত্ত্ব হিন্দুর পুরাণেতিহাসে উজ্জ্বলবর্ণে চিত্রিত আছে। দৈত্যগণ যখন স্বর্গরাজ্যে আপনাদের অত্যাচার-রাজ্য বিস্তার করিয়াছিল, তখন দেবগণ একত্র হইয়া একপ্রাণে মাতৃ-পূজা করিয়াছিলেন। সকলের শক্তি সম্মিলনে এক মহাশক্তির আবির্ভাব হইয়াছিল,—সেই মহাশক্তি দানব-দলন করিয়া স্বর্গরাজ্যে দেবগণের পুনরাধিপত্য সংস্থাপন করিয়া দিয়াছিলেন।

বা। তাহার জন্যে ব্যবস্থা কি?

অ। সমগ্র বঙ্গদেশের সমগ্র পল্লীতে পল্লীতে ঘুরিয়া সকলের মনে মাতৃশক্তি জাগরূক করিয়া দিতে হইবে। যখন সকলে জানিবে, আমাদের জননী জন্মভূমি দানব-দলনে ক্লিষ্টা—আমরা মায়ের সন্তান অত্যাচারে ব্যথিত দীর্ণ বিদীর্ণ, তখন অত্যাচার আপনিই রুদ্ধ হইবে।

বাঁ। দিল্লি হইতে সৈন্য লইয়া সেনাপতি আসিতেছে। আপাততঃ কে তাহাদের অত্যাচার-গতিরুদ্ধ করিবে?

অ। এই মুষ্টিমেয় লোক লইয়া আপনি আমি তাহাদের সম্মুখীন হইয়াই বা কি করিব? যখন ভাই ভাই মায়ের জন্য কোমর বাঁধিব—তখন শত ঐরাবতের বল স্রোতস্বিনীর মুখে ভাসিয়া যাইবে। আরও বলি শোন,—মা আমাদের কল্যাণে সাধনা আরম্ভ করিয়াছেন—সময় হইয়াছে, সকলে ক্ষুদ্র স্বার্থ পরিত্যাগ করিলেই অমর সুখ-প্রাপ্ত হইবে।

বাঁড়ুয্যে মহাশয় সেই পরামর্শই শ্রেয় জ্ঞান করিলেন।

তারপরে স্থির হইল, কামান বন্দুক যেমন প্রস্তুত হইতেছে, তেমনই হউক। অস্ত্র-শস্ত্র যেমন রচিত হইতেছে, তেমনই হউক। লোকবল যেমন বৃদ্ধি করা হইতেছে, তেমনই হউক। আর দেশে দেশে প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ ঘুরিয়া ফিরিয়া মাতৃ-পূজার ব্যবস্থা করা হউক। প্রতি নরনারীর প্রাণে যাহাতে মাতৃ-শক্তির সঞ্চার ও স্ফুরণ হয়, তাহার ব্যবস্থা করিবার বন্দোবস্ত করা হউক।

তার পরদিন সকালে উঠিয়া অজিতনাথ বিদায় লইলেন। বাঁড়ুয্যে মহাশয় প্রভৃতি কয়েক জন লোক মাতৃশক্তির বীজ লইয়া প্রচার কার্য্যে বহির্গত হইলেন।

অষ্টত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

অজিতনাথ জমিদার বাড়ী গমন করিলেন। সেখানকার অবস্থা জানিতে তাঁহার একান্ত ইচ্ছা হইয়াছিল। যেখান হইতে অত্যাচার অবিচারের আগুন উপ্ত হইয়া নরনারীগণকে দগ্ধ করিতেছিল, সেস্থানে গিয়া একবার তাহার অবস্থা দর্শন করা অজিতনাথ প্রয়োজন বলিয়া জ্ঞান করিয়াছিলেন।

অজিতনাথ সেখানে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, জমিদারবাড়ীর সে শোভা, সে শান্তি, সে আনন্দ বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। চতুস্পাঠীতে বসিয়া আচার্য্যগণ আর ছাত্রগণকে বেদপাঠ প্রদান করেন না। ধর্ম্মসঙ্গীতে গায়কগণ আর ধর্ম্মপথের মধুর আওয়াজে মানব মানবীর কর্ণে সুধা ঢালে না। বালকবালিকাগণ স্বচ্ছন্দ মানসে সেরূপ আর ক্রীড়া করে না। পুকুরে, দীঘিতে ফুল্লনলিনী-সদৃশী কামিনীগণ আর মরালীর ন্যায় ধীরে সাঁতার কাটে না। দেবমন্দিরে আর দেবতাস্তোত্র বা গীতা অথবা চণ্ডীপাঠ হয় না। শঙ্খঘণ্টার রবে প্রাণে আর সত্বগুণ জাগে না। সে সকল বন্ধ হইয়া গিয়াছে—আছে সব, কিন্তু সবই যেন কৃত্রিম, কাহারই যেন প্রাণ নাই। কেবল সজীব হইয়া দাঁড়াইয়াছে, এক অশান্তির আগুন। স্বয়ং জমিদার কৃষ্ণগোবিন্দ বাবু অশান্তির আগুনে পুড়িয়া পুড়িয়া দগ্ধ হইতেছেন। বাড়ীর স্ত্রীপুরুষ বালকবালিকা সকলেই যেন সে আগুনে বিদগ্ধ—হইতেছে। গৃহপালিত পশু-পক্ষী পর্য্যন্ত যেন সে আগুনের আঁচে অস্থির হইয় পড়িয়াছে।

সন্ধ্যার পরে অজিতনাথ কৃষ্ণগোবিন্দ বাবুর সহিত সাক্ষাতের জন্য তাঁহার কাছারিতে গমন করিলেন। আগে যেমন প্রকাশ্য-ভাবে উদার চিত্তে বসিয়া কৃষ্ণগোবিন্দবাবু কাছারির কার্য্য সম্পন্ন করিতেন—আগে যেমন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ সেখানে বসিয়া তাঁহার কার্য্যে সহায়তা ও পরামর্শ প্রদান করিতেন এখন, আর তাহা নাই। সেখানে শাস্ত্রের পরিবর্ত্তে শস্ত্র স্থান পাইয়াছে;—প্রকাশ্য কথার স্থলে অপ্রকাশ্য কথা আসিয়াছে, শান্তির পরিবর্ত্তে অশান্তির উদয় হইয়াছে। অজিতনাথকে দেখিয়া কৃষ্ণগোবিন্দ বাবু বলিলেন, তুমি কি চাও?"

যথাযোগ্য সম্মান করিয়া অজিতনাথ বলিলেন—"না. কিছু চাহিতেছি না। আপনার সহিত আমার কয়েকটী কথা আছে।"

বিরক্তস্বরে কৃষ্ণগোবিন্দ বাবু বলিলেন—"কথা শুনিবার অবকাশ আমার নাই।"

অ। কথা অধিক নহে। আপনি হিন্দু, আপনি শাস্ত্রজ্ঞ, আপনি জমিদার, দুর্ব্বল প্রজার আশ্রয়স্থল। অত্যাচারে অবিচারে আপনার প্রজাকুল ব্যথিত বিদীর্ণ হৃদয়ে বন হইতে বনান্তরালে ফিরিতেছে;—আপনি কি তাহাদের মুখপানে চাহিবেন না?

কৃ। একথা অনেকবার শোনা হইয়াছে,—অন্য কোন কথা থাকে বল?

অ। আর কি বলিব প্রভু? আপনি আপনার কর্ত্তব্য ভুলিয়া যাইতেছেন। কর্ত্তব্য পালন করিয়া জড়দেহ বলি দিলেও অনন্ত স্বর্গলাভ হয়।

কৃষ্ণগোবিন্দবাবু কর্কশস্বরে বলিলেন,—"আমার জ্ঞান উপদেশ আমি শুনিতে চাহি না। এখান হইতে দূর হও।"

অজিতনাথ তথাপি অতি বিনীতস্বরে বলিলেন,—"আপনি ইচ্ছা করিলে সহস্র সহস্র নরনারীর প্রাণের বেদনা দূর করিতে পারেন। আপনি"—

কথা বলা সারা হইল না। কৃষ্ণগোবিন্দবাবু চীৎকার করিয়া বলিলেন—"কে আছিস্ এ হতভাগাকে দূর করিয়া দে।"

কিন্তু দূর করিয়া দিতে কাহাকেও আসিতে হইল না। অজিতনাথ আপনিই তথা হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

সে দিন শুক্লপক্ষের রজনী। নির্ম্মল চন্দ্রকিরণে দিগন্ত ভাসিয়া গিয়াছে। অজিতনাথ তথা তথা হইতে বহির্গত হইয়া বাটীর উত্তরদিকের রাস্তা বহিয়া চলিয়া গেলেন এবং ঘুরিয়া আসিয়া বাটীর পার্শ্বস্থ এক পুষ্করিণীর বাঁধা ঘাটে উপবেশন করিলেন।

মৃদু মারুত সঞ্চালনে পুষ্করিণীর নীলজল কাঁপিতেছিল। কম্পনশীল জলতলে চন্দ্রকিরণ কাঁপিতেছিল, এবং পুষ্করিণীর পার্শ্বস্থ পুষ্পোদ্যান হইতে কুসুমসৌরভ আসিয়া দিকে দিকে ভাসিয়া যাইতেছিল। অজিতনাথ সোপানোপরি বসিয়া ভাবিতেছিলেন,—সুপণ্ডিত কৃষ্ণগোবিন্দবাবুর এত অধঃপতন কেন হইল? দেবতার সংসারে কেন দানবের আবির্ভাব হইল? মানুষের এ পরিবর্ত্তন কিসে হয়? ইহা পুরুষকার, না অদৃষ্ট!

সহসা পশ্চাতে মনুষ্যপদ-শব্দ হইল। অজিতনাথ চাহিয়া দেখিলেন। দেখিলেন চন্দ্রকিরণ অঙ্গে মাখিয়া এক অনিন্দ্য-সুন্দরী যুবতী তাঁহার নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইল। যুবতীর অন্য কোন কার্য্য থাকিতে পারে বিবেচনা করিয়া অজিতনাথ উঠিয়া যাইতেছিলেন। যুবতী ধরাগলা ঝাড়িয়া বলিল—"তুমি যাইতেছ কেন, আমি তোমারই নিকটে আসিয়াছি।"

অজিতনাথ বিস্মিত হইলেন। বলিলেন—"আমার নিকট? না না, তোমার ভুল হইয়া থাকিবে আমি বিদেশী।"

যুবতী বলিল,—"আমার ভুল হয় নাই। তুমি অজিতনাথ। তুমি কি আমায় চিনিতে পার নাই?"

অজিতনাথ আরও বিস্মিত হইলেন। বলিলেন,—"না, আমিত তোমাকে চিনিতে পারিলাম না। কখনও দেখিয়াছি বলিয়াও মনে হইতেছে না!"

যুবতী দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিল—"ততটুকুও তোমার মনে নাই। আমি কিন্তু মনকে বুঝাইতে পারি নাই। কেবল তুমিই আমার মনে আছ,—আর জাতিকুল নারী-ধর্ম্ম সব ভুলিয়া গিয়াছি।"

অজিতনাথ অধিকতর বিস্মিত হইলেন। বলিলেন,—"কে তুমি?"

যুবতী দৃঢ়স্বরে বলিল,—"আমি নীরদা। তোমার বাড়ীর কাছে জলে ডুবিয়া মরিতাম, তুমি বাঁচাইয়া বিষম পোড়াইতেছ। আর পারি না প্রভু! হৃদয় অগ্নিময় হইয়াছে—সে আগুন কি তুমি নিবাইবে না?"

অ। এখন তোমায় চিনিয়াছি। কিন্তু আমি ব্রহ্মচারী। তুমিও কুলকামিনী;—এরূপস্থলে আমায় কেন ভালবাসিলে?

যু। কেন ভালবাসিলাম? অন্যায় কথা বলিতেছ কেন? কেহ কখনও ইচ্ছা করিয়া ভাল বাসে না।

অ। তবে কি ভালবাসা কোন দুর্দ্দমনীয় পদার্থ বলিয়া বিশ্বাস কর? ভালবাসা একটা বাতিক। গান ও কবিতার মত উহা বিনাইয়া বাঁধিতে হয়।

যু। তোমার ভুল। গান বা কবিতার মত ভালবাসা বিনাইয়া বাঁধিতে হয় না। ভালবাসা, ঝড়ে মাতা মানব। স্বাধীন, উন্মত্ত,—অবাধ—শাসনশূন্য।

অ। আর সেইরূপ সাগরের মত চঞ্চল, পরিবর্ত্তনশীল।

যু। তুমি কি জীবনে কখনও ভালবাস নাই?

অ। ভালবাসিয়া কিছু পাইব,—ভালবাসিয়া সুখী হইব,—এইরূপ যে ভালবাসা, তাহা কাম। আর ভালবাসিয়া তাহাকে সুখী করিব, ইহাই প্রেম। আমি প্রাণপণে সকলকে ভালবাসিতে চেষ্টা করি। কোন এক সীমাবদ্ধস্থলে ভালবাসা হয় নাই।

যু। ভালবাসা বোঝ নাই। ভালবাসায় মজ নাই। ভালবাসার বিশালভাব প্রাণে আঁকিয়াছ—প্রেমের সিংহ সাজিতেছ, কিন্তু কোন এক মুহূর্ত্তে এমন এক যাদুকারীর হাতে পড়িবে, যে তোমাকে পোষ মানাইয়া লইবে।

অ। ভগবান্ করুন্, তোমার অশুভ লগ্ন যেন আগমন না করে।

যু। কিন্তু আমি তোমার প্রেমভিখারিণী—আমাকে দয়া কর। আমায় সঙ্গে লও।

অ। আমি এখানে আসিয়াছি, তুমি কি প্রকারে জানিতে পারিলে?

যু। আমার প্রাণে বেদনা অসীম—তোমার জন্য প্রতি মুহূর্ত্তে পুড়িয়া মরিতেছি। তোমার সন্ধান রাখিবার জন্য আমি লোক নিযুক্ত করিয়া রাখিয়াছি। তুমি এ বাড়ীতে আসিবামাত্রই, সে আমাকে সংবাদ দিয়াছিল। তারপরে ক্ষুধিত ব্যাঘ্রী যেমন

ছাগশিশুর প্রতি শিকারের অবসর লক্ষ্য রাখে, আমিও তেমনি তোমার নির্জ্জন অবসর লক্ষ্য রাখিয়াছিলাম। আর যন্ত্রণা দিও না—আমাকে একবার বল, তুমি আমায় ভালবাস।

অ। আমি তোমায় ভালবাসি—ভগিনীর মত, গর্ভধারিণী মায়ের মত ভালবাসি। তুমি আমার মা—কৃপা করিয়া সন্তানের ন্যায় এ দাসের প্রতি স্নেহ রাখিও।

অদূরে পুষ্পোদ্যান হইতে অতি মধুর কণ্ঠে কে ডাকিয়া বলিল,—"ধন্য সংযমী পুরুষ।"

নীরদা সে স্বর চিনিত। লজ্জায়, ক্ষোভে, ঘৃণায় এবং ব্যর্থ প্রণয়ের বিষম বেদনায় ম্রিয়মাণ হইয়া সে ফিরিয়া গেল। অজিতনাথও দ্রুতপদে তথা হইতে চলিয়া গেলেন।

ঊনচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

অজিতনাথ জ্যোৎস্না-বন্যায়-বিভাসিত, কুসুম-গন্ধামোদিত পথে দাঁড়াইয়া কি চিন্তা করিলেন; তারপরে যেমন দ্রুততরগমনে যাইতেছিলেন, তেমনই দ্রুততর গমনে চলিয়া গেলেন।

পথপার্শ্বে তর্কালঙ্কারঠাকুরের বাড়ীর ক্ষুদ্র দ্বার। অজিতনাথ দ্বার উন্মুক্ত করিয়া বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

বাটীর সম্মুখে একখানি খড়ের ছাউনি গৃহ,—গৃহখানিতে তর্কালঙ্কারঠাকুরের শিষ্যবর্গ অধ্যয়ন করিত। তৎপার্শ্বে গোবিন্দজীর ইষ্টক-মন্দির। উভয়ের মধ্য দিয়া অন্দরে প্রবেশ করিবার ক্ষুদ্র দরোজা।

তখনও রাত্রি এমন অধিক হয় নাই, যাহাতে বাড়ীর সকলে নিদ্রিত হইয়া পড়ে; কিন্তু অজিতনাথ কাহাকেও কোথাও দেখিতে পাইলেন না। ইতঃপূর্ব্বে অনেকবার এমন সময় সে পথ দিয়া যাইবার কালে ছাত্রবর্গের পাঠাভ্যাস-কোলাহল শ্রুত হইয়াছেন—আজি কিন্তু কেহ কোথাও নাই। ডাকিয়া কাহারও সাড়া মিলিল না। তখন অজিতনাথ ফিরিয়া যাইতেছিলেন,—এমন সময় একজন অতি মধুর স্বরে অন্দর দরোজার পার্শ্ব হইতে জিজ্ঞাসা করিল,—"আপনি কাহাকে খুঁজিতেছেন?"

অজিতনাথের কর্ণে সে স্বর বীণাঝঙ্কারের ন্যায় প্রবেশ করিল। অজিতনাথ ফিরিয়া যাইতেছিলেন,—স্বর শ্রবণে আবার অন্দরাভিমুখে ফিরিলেন, নির্ম্মল জ্যোৎস্নায় দেখিতে পাইলেন। ঈষদুন্মুক্ত দরোজার মধ্য হইতে দুইটি পটলচেরা সুন্দর চক্ষুর সুন্দর চাহনি ভাসিয়া আসিতেছে। কে জানে কেন সে চাহনি অজিতনাথের দর্শনেন্দ্রিয়ের ভিতর দিয়া মর্ম্মে প্রবেশ করিল। সে চাহনিতে কে জানে কেন অজিতনাথের সর্ব্বাঙ্গের রক্ত অতি দ্রুত কাঁপিয়া উঠিল।

অজিতনাথ বলিলেন,—"আমি তর্কালঙ্কারঠাকুরকে খুঁজিতেছি।"

যে দরোজায় দাঁড়াইয়াছিল, সে দরোজা খুলিয়া ফেলিয়া অগ্রসর হইল। গলা ঝাড়িয়া, মুখ লাল করিয়া বলিল—"আপনি? আপনি কোথা হইতে আসিলেন? আপনাকে না মহারাষ্ট্রীয়েরা হত্যা করিতে ধরিয়া লইয়া গিয়াছিল?"

অ। হাঁ, লইয়া গিয়াছিল। এক্ষণে ছাড়িয়া দিয়াছে। তুমি এখানে কবে আসিলে বিশাখা?"

বিশাখা তাহার আকর্ণ-বিশ্রান্ত নীলনয়নেন্দীবরযুগল ঈষন্নমিত করিয়া বলিল,—"সে অনেক কথা।"

অ। যদি খুব সংক্ষেপে বলা সম্ভব হয়, তবে বল; শুনিতে ইচ্ছা হইতেছে।

বিশাখা মৃদুস্বরে অতি সংক্ষেপে সমস্ত কথা বলিল।

অ। তোমাকে কাছারি হইতে কে উদ্ধার করিয়া আনিল?

বি। রাণী মা।

অ। রাণী মা কে?

বি। কে তাহা জানি না। তিনি অনিন্দ্যসুন্দরী। যৌবন-শ্রী সে দেহে উচ্ছ্বলিত। দৈবীদ্যুতি সে দেহে উদ্ভাসিত। এক মহামহিমময়ী মহাশক্তিতে তিনি শক্তিমতী। আর্ত্তের পীড়া নিবারণ করিতে, অত্যাচারিতের অত্যাচার দূর করিতে তিনি ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন। আমার মত শত শত কামিনীকে—শত শত পুরুষকে তিনি উদ্ধার করিয়াছেন ও করিতেছেন। আমরা তাঁহাকে রাণী মা বলিয়া ডাকি—শুনিয়াছি, তাঁহার নাম বসন্তরাণী।

অ। বসন্তরাণী! বসন্তরাণী এখন কোথায়?

বি। আ'জ সন্ধ্যার সময় তর্কালঙ্কারঠাকুর এবং রাণী মা কোথায় গিয়াছেন।

অ। কোথায় গিয়াছেন, সন্ধান জানিয়া বলিতে পার?

বি। কাহার নিকটে সন্ধান জানিব?

অ। কেন, তর্কালঙ্কার মহাশয়ের গৃহিণীর নিকটে।

বি। না, তিনিও বোধ হয় তাহা জানেন না। তর্কালঙ্কারঠাকুর ও রাণী মা এখন আর একদণ্ডও বাড়ীতে থাকেন না। প্রাণপণে

সর্ব্বত্র ঘুরিয়া ঘুরিয়া পীড়িতের ও অত্যাচারিতের উদ্ধার সাধন করিয়া ফিরিতেছেন।

অ। কখন আসিলে তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ হইতে পারে?

বি। পূর্ব্বেই বলিয়াছিত তাঁহারা প্রায়ই বাড়ী থাকেন না। কখনও কোন নিরাশ্রয়কে লইয়া বাড়ী আসিলে, তাহার থাকিবার বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াই আবার চলিয়া যান।

অ। নিরাশ্রয় অথচ প্রপীড়িত ব্যক্তিগণ কি সকলেই এই বাড়ীতে স্থান পায়? তর্কালঙ্কারঠাকুরের বাড়ীত সেরূপ বৃহৎ ও সুরক্ষিত নয়।

বি। সে সকল কথা বলিতে নিষেধ আছে, তবে আপনি যখন জিজ্ঞাসা করিতেছেন, তখন না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না। যাঁহাদিগকে তাঁহারা উদ্ধার করিয়া আশ্রয় প্রদান করেন, তাহারা এখানে থাকে না,—স্থানে স্থানে বিশ্বাসী লোকের বাড়ী থাকে। আমিই মাত্র এবাড়ীতে আছি।

অ। যখন ঐ সকল কথা বলিতে নিষেধ, তখন আমাকে কেন বলিতেছ?

বিশাখা মৃত্তিকার দিকে মুখ করিয়া মৃদুস্বরে বলিল,—"আপনাকে গোপন করিতে পারিলাম না।"

ব্রহ্মচারীর সংযমপূর্ণ হৃদয় একবার কাঁপিয়া উঠিল + গলা ঝাড়িয়া বলিলেন,—"তুমি কি আমায় চেন?"

বি। হাঁ চিনি। একদিন—যে দিন আমি জমিদার বাড়ী বন্দিনী ছিলাম, সেই দিন সেই প্রকোষ্ঠে আপনার দর্শন পাইয়াছিলাম। সেই হইতে চিনি। আপনি ব্রহ্মচারী,—আপনি অজিতনাথ।

অ। এখনও যে মনে আছে, ইহাতে আনন্দিত হইলাম।

বি। আপনার কি মনে নাই?

অ। না থাকিলে দেখিয়াই চিনিলাম কি প্রকারে?

বি। তর্কালঙ্কার ঠাকুরের কাছে কি প্রয়োজন?

অ। প্রয়োজন অনেক। কিন্তু দেখা হইল না। এখন আমি যাই?

বি। কোথায় যাইবেন?

অ। যাইবার আমার কোন নির্দ্দিষ্ট স্থান নাই।

বি। আবার কবে দেখা পাইব?

অ। আবশ্যক আছে কি?

বি। না—না, এমন কোন আবশ্যক নাই।

অজিতনাথ ফিরিয়া যাইতেছিলেন। বিশাখা পুনরপি বলিল, —"যদি কা'ল আসেন, বোধ হয় তাঁহাদের সহিত দেখা হইতে পারে।"

অজিতনাথ বলিলেন,—'কা'ল এইরূপ সময় আবার আসিব।"

বিশাখা করুণ-কোমলস্বরে বলিল,—"আসিতে ভুলিবেন না।"

অজিতনাথ সে স্বরে মুগ্ধ হইলেন। প্রাণের তারে কোন অজানা রাগিণীর ঝঙ্কার উঠিয়া পড়িল। বড় অন্যমনস্ক ভাবে অজিতনাথ যেপথে আসিয়াছিলেন, সেই পথে ফিরিয়া গেলেন।

বিশাখা অনেকক্ষণ সেখানে দাঁড়াইয়াছিল, দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বাড়ীর মধ্যে চলিয়া গেল।

চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

অজিতনাথ পথে যাইতে যাইতে হৃদয়-মধ্যে অনুসন্ধান করিলেন, তাঁহার যেন কি চুরি গিয়াছে। প্রাণ যেন কি হারাইয়া বসিয়া ব্যাকুল-স্তম্ভিত হইয়া পড়িয়াছে। অজিতনাথ দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া উর্দ্ধনত যুক্তকরে, ইষ্টদেবতাকে প্রণাম করিলেন; তারপরে মৃদুস্বরে গান গাহিতে গাহিতে চলিয়া গেলেন।

আমরা সবিশেষ সম্বাদ রাখি, অজিতনাথ সে রাত্রে ভাল করিয়া নিদ্রা যাইতে পারেন নাই, এবং সে রাত্রে পূর্ব্বের শান্তি-সুখে সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত হইয়াছিলেন।

সকালে উঠিয়া অজিতনাথ চিত্তকে দৃঢ় করিবার জন্য পুরুষকার প্রয়োগের জন্য যথেষ্ট যত্ন করিলেন, কিন্তু সবিশেষ ফললাভ করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায় নাই। কেন না, সেদিন সন্ধ্যা হইতেই, "আসিতে ভুলিবেন না"—পঞ্চম-ঝঙ্কারে সেই কথা অজিতনাথের কাণের প্রান্তে পুনঃপুনঃ নিনাদিত হইতে লাগিল। অজিতনাথ তর্কালঙ্কারঠাকুরের বাড়ী গমন করিলেন।

তখন রাত্রি ছয়দণ্ড অতীত হইয়া গিয়াছিল। জ্যোৎস্নাপুলকিতা শুভ্রা রজনী,—দিকে দিকে উজ্জ্বলতা। সে উজ্জ্বল আলোকে অজিতনাথ দেখিলেন, দিব্যকান্তি তর্কালঙ্কারঠাকুর গোবিন্দজির মন্দিরের বারেণ্ডায় বসিয়া একটি লোকের সহিত কথা কহিতেছেন।

অজিতনাথ তথায় উপস্থিত হইবা মাত্র তর্কালঙ্কারঠাকুর অজিতনাথকে অভ্যর্থনা করিলেন, এবং বলিলেন,—"তোমারই আগমন-প্রতীক্ষায় আমি এখানে বসিয়া আছি।"

বিনীত স্বরে অজিতনাথ বলিলেন,—"আমি আসিব, আপনি কি জানিতেন ?"

ত। হাঁ, বিশাখা আমায় সে সংবাদ দিয়াছিল।

অ। আপনার সহিত আমার অনেক কথা আছে।

ত। এখানে কোন ভয় নাই,—সমস্ত কথাই এখানে বসিয়া বলিতে পার। এদিকে কেহ আসে না।

অ। সেরূপ সুরক্ষিত স্থান ইহা নহে। তবে আমার কথা তত গোপনীয় নহে,—আমি এই স্থানেই বলিতে পারি।

তখন তর্কালঙ্কার মৃদু হাসিয়া বলিলেন,—"তবে চল বাড়ীর মধ্যে যাই। আতপ-তণ্ডুলভোজী নিরীহ ব্রাহ্মণের বাড়ী বলিয়া এদিকে কেহ নজর রাখে না,—তাই ভরসা করি।

তর্কালঙ্কার ঠাকুর যাহার সহিত কথা কহিতেছিলেন, সে একটি বলিষ্ঠ পুরুষ। তর্কালঙ্কার তাহাকে বলিলেন,—"তোমাকে যাহা বলিলাম, তাহা যেন স্মরণ থাকে।"

সে প্রণাম করিয়া বলিল,—"আজ্ঞে স্মরণ থাকিবে বৈ কি।" তার পরে সে উঠিয়া চলিয়া গেল।

তর্কালঙ্কারঠাকুর অজিতনাথকে সঙ্গে লইয়া বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিতেই একখানি ক্ষুদ্র গৃহ ছিল,—তর্কালঙ্কারঠাকুর অজিতনাথকে সঙ্গে লইয়া তাহার দাওয়ায় উপবেশন করিলেন, এবং অজিতনাথকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তোমার কি কথা আছে, বল।"

অজিতনাথ বিনয়-নম্রস্বরে বলিলেন,—"আপনার এখানে বসন্তরাণী নামে একটি স্ত্রীলোক আছে ?"

ত। আছে। তাহাকে তোমার কি প্রয়োজন?

অ। না, এমন কোন প্রয়োজন নাই। আমার বাড়ীতে বসন্তরাণী নাম্নী একটি স্ত্রীলোক ছিল,—আসিয়া তাহাকে দেখিতে পাইতেছি না, এ কি সেই বসন্ত?

ত। হাঁ, সেই বসন্ত। প্রাণপণে দেশের কাজ করিতেছে। বিধবা বালা যথার্থ ব্রহ্মচারিণীর ধর্ম্ম প্রতিপালন করিতেছে।

অ। আমি একবার তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিব।

ত। আজ সে সম্ভব নাই।

অ। কেন?

ত। তিনি এখানে নাই।

অ। কোথায় গিয়াছে?

ত। কোথায় গিয়াছে, তাহা বলিব না। আমার এখানে বিশাখা নামে একটি মেয়ে ছিল, তাহাকে স্থানান্তরে রাখিতে গিয়াছে।

অ। বিশাখাও আপনার এখানে নাই?

ত। না। তোমার জন্য তাহাকে দূরতর স্থানে পাঠাইয়া দিয়াছি।

অ। আমার জন্য? কি বলিতেছেন ঠাকুর, আমি ভাল বুঝিতে পারিলাম না।

ত। শোন অজিতনাথ, আমি আগে হইতে এই ঘটনার আভাস প্রাপ্ত হইয়াছি, তারপরে অদ্য সকালে আসিয়া তোমার ও বিশাখার কথা সমস্ত শুনিয়াছি। আমার নিকট কথা গোপন করিও না। ফলকথা, তুমি সংযমী তাও জানি,—বিশাখা চরিত্রবতী, তাও জানি,—কিন্তু একটা কর্ম্মবীজ তোমাদের উভয়ের

মধ্যে অনুস্যূত আছে বলিয়া বোধ হইতেছে, তাই তাহাকে দূরে রাখিতে পাঠাইয়া দিয়াছি।

অ। তবে এখন বিদায় হইতে পারি ?

ত। সত্য কথা বলিবে কি ?

অ। কি কথা ঠাকুর ? অসত্য ভাষণে পাপ আছে, তাহা আমি জানি।

ত। কথা অন্য কিছুই নহে। তুমি ব্রহ্মচারী, তাই তোমাকে শুধাইতে সাধ হয়, তুমি রিপুজয় করিতে পারিবে কি না ?

অ। সে প্রশ্ন কেন ?

ত। প্রশ্নে প্রয়োজন আছে,—তুমি বিশাখার রূপে মজিয়াছ।

অ। এ সংবাদ আপনি কোথা হইতে সংগ্রহ করিলেন ?

ত। সংগ্রহ যেখান হইতেই করি, কিন্তু সংবাদ সত্য। কা'ল রাত্রে তোমাদের কথোপকথন ও অঙ্গ-ভঙ্গী যে লক্ষ্য করিয়াছিল, সেই আমাকে এ সংবাদ প্রদান করিয়াছে।

অ। আপনি কি তাহা বিশ্বাস করেন ?

ত। কেন বিশ্বাস করিব না ? রমণীর আকর্ষণে পুরুষ বশীভূত হয়। পুরুষের আকর্ষণে রমণী কামিনী হয়। তবে তুমি ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বনে এতদিন সে আকর্ষণের হস্ত হইতে আত্মরক্ষা করিয়া আসিয়াছ, যদি এ অহঙ্কার কর,—আপন মনে বুঝিয়া দেখ অজিতনাথ, তাহা তোমার ভুল। এমন এক মুহূর্ত্ত মানুষের আসে তখন সে সমস্ত ভুলিয়া যায়,—সমস্ত বাঁধ ধসিয়া যায়। তুমি ত ক্ষুদ্র অজিতনাথ ;—পুরাণে পড় নাই কি মহাতপস্বিগণ স্বর্গের কোন অপ্সরা বা কোন বনবিহারিণীতে আসক্ত হইয়া পড়িয়াছেন।

অ। কেন এমন হয় ঠাকুর? আপনি জ্ঞানী, আপনি উপদেষ্টা,—দয়া করিয়া তাহা আমাকে বলুন। কেন মানুষ শত স্থানে চিত্ত জয় করিয়া আসিয়া একখানি মুখের নিকটে হতাশ হইয়া ভাঙ্গিয়া পড়ে? কেন এমন হয়, কেন মানুষ মদনে মরণে জড়াইয়া পড়ে? ইহার যুক্তি কি, ইহার কারণ কি,—তাহা বলুন।

ত। এরূপ সহজ,—সরল বিষয় বুঝিতে যুক্তি-তর্কের কি প্রয়োজন অজিতনাথ? তুমিও শাস্ত্রদর্শী,—তুমি এ তত্ত্ব কি অবগত নহে? সাংখ্যশাস্ত্র পড়িয়াছ, ক্রম-বিকাশতত্ত্বও অনবগত নহ;—সে সকলে ইহার অনেক যুক্তি, অনেক প্রমাণ আছে, তবে একথার পুনরাবর্ত্তরণা কেন?

অ। আপনি দয়া করিয়া ভালরূপে কথাটা আমাকে বুঝাইয়া দিন।

ত। তুমি সমস্তই জান,—সমস্তই অবগত আছ। তথাপি যখন জিজ্ঞাসা করিতেছ, তখন সংক্ষেপে পুনরুল্লেখ স্বরূপে বলিতেছি,—আমরা এককালে যাহা ছিলাম, তাহার কোন না কোন অংশ আজিও তোমার আমার মধ্যে বর্ত্তমান আছে। মনে কর, কোনজন্মে আমরা কোন সমুদ্র-কূলে শঙ্খ হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়া থাকিলে, শঙ্খ-শম্বুকের কোন অংশ, কোন ভাব আজিও আমাদের মধ্যে বর্ত্তমান আছে। জগতে কোন পদার্থের ধ্বংস নাই, ক্ষয় নাই,—এমন কি সামান্য একটু চিন্তাও ক্ষয় প্রাপ্ত হয় না। এখন ভালবাসা সম্বন্ধেও ঐ কথা। যাহা সর্ব্বত্র,—ভালবাসার ভিতর সে কথা না থাকিবে কেন? ভালবাসাই বল, প্রেমই বল, আর কামই বল,—এ সম্বন্ধেও ঐ সত্য তুল্যরূপে বলবান্, যদি

অদৃষ্ট বলিয়া দেয়, এই দুইটি স্ত্রী-পুরুষের আত্মা, দুইটি অভিমুখ-গামী সাগর-স্রোতের ন্যায় উন্মত্ত বেগে মিলিয়া এক হইবে ;—তবে সহস্র প্রতিকূল সমাজ-শাসন, সহস্র বাধা-বিঘ্ন, সহস্র লাঞ্ছনা-গঞ্জনা ভাঙ্গিয়া-চুরিয়া তাহাদিগকে মিলিতে হইবেই হইবে। তাহার সিদ্ধি-সাফল্যের পথে অন্তরায় হইতে পারে, এবিশ্বে এমন শক্তি কোথায় ? শোন অজিতনাথ, কোন পূর্ব্বজন্মে তাহারা যখন একত্রে মিলিয়াছে, ছুটিয়াছে,—হইতে পারে, দুইটি শ্যাম কিসলয় হইয়া কোন নিবিড় অরণ্যে তাহারা দুইজনে দুলিয়াছিল ; হইতে পারে বিদ্যুৎশিখা হইয়া কোন যুগান্তের আকাশে তাহারা একত্রে ছুটিয়া থাকিবে ; হইতে পারে দুইটি নিভৃত কুসুম হইয়া তাহারা কোন বিজন প্রান্তরে সোহাগের সূর্য্য-রশ্মিতে দুলিত ;—যখন তাহারা একজন্মে মিশিয়াছে, মিশিয়া যখন পরস্পরের জীবনের অপরিত্যাজ্য নির্ভর আশ্রয়ত্বের কথা বুঝিতে পারিয়াছে ; যখন তাহাদের একজনের সকল প্রাণ, সর্ব্বাঙ্গের সুরভি-মদিরা, অপরের প্রাণেন্দ্রিয়ের ভিতর শত শত আলিঙ্গন-আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি করিয়াছে, তখন অনন্তবিশ্বে, অনন্ত ভবিষ্যে তাহাদের বিচ্ছেদ নাই। এই অদৃষ্টের প্রেম,—এই ভালবাসার বিধাতা-পুরুষ বড় ভয়ঙ্কর সত্তা,—স্থানবিশেষে ইহা ভগবানের চরণামৃত, স্থানবিশেষে ইহা নরকের অভিসম্পাত।

অ। এই দুই বিভাগ কোথায় কোথায় এবং কাহার ভাগ্যে কিরূপে সুধা অথবা গরল উত্থিত হয়, তাহা বলুন।

ত। যাহার প্রণয়ের শিখা প্রাণেষ্টির পূর্ণাহুতি লইয়া স্বর্গের দিকে উঠে, তাহারই গৃহধর্ম্মের উপর,—তাহারই জন্মজন্মান্তরের উপর,—তাহারই ভাগ্য দেবতার উপর দেবতার প্রীতি-আশীর্ব্বাদ

স্বরূপ আনন্দ পুষ্পবৃষ্টি পতিত হয়। আর যেস্থলে ইহা জ্বালা-মুখীর অগ্ন্যুৎপাতের ন্যায় পঙ্কিল প্রাণের আলেয়া লইয়া অস্থির অশুভ বহ্নি বমন করে, সেস্থানে ধর্ম্ম, সত্য, মর্য্যাদা সকলই পুড়িয়া নরক নির্ম্মিত হয়।

অ। বুঝিলাম, কিন্তু সে আকর্ষণের আগুন নিভাইবার উপায় কি?

ত। কেন, ব্রহ্মচর্য্য।

অ। আমিত ব্রহ্মচর্য্য ব্রত গ্রহণ করিয়াছি, তবে এ আগুনে ভয় কেন?

ত। বলিয়াছিত, পরাশর আদি মুনিগণও ঐ আগুনে গলিয়া গিয়াছেন। ব্রহ্মচর্য্য কেবল শুষ্ক-কঠোর নহে,—কেবল শুষ্ক হইলে, সময়ে জল পাইলে গলিয়া যাইবার সম্ভাবনা। তাই রসে ভিজাইয়া রাখিতে হয়। আত্মায়,—জীবনে, এমন কি সর্ব্বেন্দ্রিয়ে সে রস পূর্ণভাবে ধরিয়া রাখিতে হয়।

অ। যাহারা না পারে?

ত। তাহাদিগকে প্রণয়ের জীবন-সঙ্গিনী খুঁজিয়া লইয়া গার্হস্থ্যধর্ম্ম প্রতিপালন করিতে হয়।

এই সময় একজন লোক আসিয়া বহির্ব্বাটী হইতে তর্কালঙ্কার-ঠাকুরকে চীৎকার করিয়া ডাক দিল। তর্কালঙ্কারঠাকুর উঠিয়া গেলেন।

একচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

যে ডাকিয়াছিল, তর্কালঙ্কারঠাকুর তাহাকে সঙ্গে লইয়া ফিরিয়া আসিলেন এবং যেখানে অজিতনাথ বসিয়াছিলেন, উভয়ে তথায় আসিয়া উপবেশন করিলেন।

তারপরে অজিতনাথের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন,—"অজিতনাথ, প্রেমের কথা আর একদিন শোনাইব, এখন অন্য কোন অতি প্রয়োজনীয় কথা তোমাকে শুনাইতে চাহি,—শুনিবে কি?"

অ। কি শুনিব না শুনিব, না বলিলে উত্তর দিব কি প্রকারে?

ত। যে মানব জন্ম গ্রহণ করিয়া জননী ও জন্মভূমির সেবা না করে, তাহার জন্মই বৃথা;—কথা তুমি শুনিয়াছ কি?

অ। ঠাকুর আমি তাহা জানি,—জীবনে আমার সেই এক ব্রত। আমি মাতৃ-মূর্ত্তি সাক্ষাতে দর্শন করিয়াছি,—মাতা বঙ্গ-ভূমি শরীরী হইয়া আমাদের কল্যাণার্থ শক্তিসাধনায় ব্যাপৃতা আছেন, তাহাও দর্শন করিয়া আসিয়াছি।

ত। কোথায় এবং কিরূপে দর্শন করিলে?

অজিতনাথ মহারাষ্ট্রীয় শিবিরের স্বপ্নের কথা হইতে আর পর্ব্বতগহ্বরের মাতৃ-দর্শন পর্য্যন্ত সমস্ত কথা সবিস্তারে বলিলেন।

তর্কালঙ্কারঠাকুরের দীর্ঘায়ত নয়নদ্বয় জলে পূর্ণ হইল। গদ্গদকণ্ঠে কহিলেন,—"অজিতনাথ, তোমারই জন্মগ্রহণ সার্থক।

কিন্তু মার আদেশ প্রতিপালনে অবহেলা কেন? কেন জড়ের বন্ধনে,—মোহের ছলনে আত্মবিস্মৃত হইতেছ? আমি ঐ কথাই বলিতেছিলাম,—বলিতেছিলাম, দেশে সর্ব্বনাশ উপস্থিত। দস্যুতে দেশের শস্য,—দেশের লোকের মুখের গ্রাস,—দেশের ধনরত্ন লুণ্ঠন করিয়া লইতেছে; রাজা শোষক ও নাশক। এখন প্রেমের কাহিনী আবৃত্তি করিবার সময় নহে, তুমি মাতৃ-সেবা করিবে কি? জানিতাম না, তুমি মায়ের প্রিয়পুত্র। ভাই, জাগ,—কামিনীর কমনীয় বাহুবন্ধনের সুখ ভুলিয়া যাও। মাতৃ-সেবায় জীবন উৎসর্গ কর,—যথার্থ প্রেম, যথার্থ ধর্ম্ম সঞ্চয় করিয়া মানব জন্ম সার্থক কর।"

অজিতনাথ পুলকদেহে সাশ্রুনয়নে বলিলেন,—"আপনারা আমার সহায় হউন।"

যিনি আসিয়াছিলেন, তিনি একজন মাতৃ-সেবক। নাম দুর্গাদাস। দুর্গাদাস তর্কালঙ্কারঠাকুরের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন,—"ঠাকুর, আপনাদের কথা আমার নিকটে প্রহেলিকার মত জ্ঞান হইল?

ত। কেন?

দু। ব্রহ্মচারী ঠাকুর বলিলেন,—মাতৃশক্তি শরীরী হইয়া সন্তানের কল্যাণ-কামনায় শক্তিসাধনা করিতেছেন। কথাটা কি করিয়া বিশ্বাস করিতে পারি? বঙ্গভূমি জড়,—ইহা অবশ্যই আপনারা স্বীকার করিবেন। জড়ের শরীর গ্রহণ,—শক্তিসাধন কোন্ শাস্ত্রের কথা?

ত। বঙ্গভূমির বাহ্যদৃশ্য জড় হইতে পারে,—কিন্তু জড়ে শক্তি কোথায়? শক্তি যাহা, তাহাই আমাদের মা। মাতৃশক্তি

মহাশক্তিতে পরিণত সাধনাতেই হইয়া থাকে,—মা আমাদের মহাশক্তির শক্তি সংগ্রহ করিতেছেন। তোমরা মাকে ডাক,—মা দশভুজা হইয়া আমাদের দশদিক্ রক্ষা করিবেন?

হ। আপনি বলিলেন, স্বদেশ-সেবাতেই প্রেমলাভ হয়, স্বদেশ-সেবাতেই আনন্দলাভ হয়, ইহাও কি সম্ভব? স্বদেশ-সেবাতে না হয়, স্বদেশবাসীর কষ্টই অপনোদিত হয়।

ত। প্রেম কারে বলে, তা জান? কৃষ্ণেন্দ্রিয়-পরিতৃপ্তি প্রেম, আর আত্মেন্দ্রিয়-পরিতৃপ্তি কাম। কৃষ্ণ কোথায়?

ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া॥

"যেমন সূত্রধার দারুযন্ত্রে আরূঢ় কৃত্রিম ভূত সকলকে ভ্রমণ করাইয়া থাকে, তদ্রূপ ঈশ্বর ভূত সকলের হৃদয়ে অবস্থান করিয়া তাহাদিগকে ভ্রমণ করাইতেছেন।"

ঈশ্বর সর্ব্বভূতে। সর্ব্বভূতের ইন্দ্রিয় কৃষ্ণেন্দ্রিয়। অতএব সর্ব্বভূতের ইন্দ্রিয়-তৃপ্তিই প্রেম। তৃপ্তি কথাটায় এতর্ক ভুলিও না যে, চোরের চুরি করিলে ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি হয়, পারদারিকের পরদার-বিনোদে ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি হয়। তাহা তৃপ্তি নহে,—তাহা জ্বালা। এখন, স্বদেশসেবায় সে প্রেমের বিস্তৃতি ও উন্নতি হয়।

হ। বঙ্গদেশের বাহিরে যাহারা, তাহারাও জীব,—তাহাদের ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি কি প্রেম নহে?

ত। নহে কে বলিল? তবে এস্থলে দুইটি কথা আছে। একটা কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি,—ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি এক, উচ্ছৃঙ্খলা আর এক। মোহনলালের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি নহে,—জ্বালা। সে জ্বালা নিবৃত্তি

করাই পুণ্য। দ্বিতীয় কথা, আগে নিজের জননীর ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করিয়া পরে অপরের দিকে চাইতে হয়। যাহার গর্ভধারিণী বস্ত্রাভাবে নগ্না, অন্নাভাবে জীর্ণ-শীর্ণা,—সে পরের ভাবনা ভাবিবে কি প্রকারে?

দু। বুঝিলাম সব ঠাকুর; এখন উপায় নির্দ্ধারণ করুন। অদ্য সংবাদ পাইলাম, দিল্লী হইতে একজন সেনাপতি বহুসহস্র সৈন্য লইয়া ভাগীরথীর অপর পারে উপস্থিত হইয়াছে। চারিদিকে অনল জ্বলিয়া উঠিয়াছে,—রক্ষার উপায় কি?

ত। রক্ষা মাই করিবেন,—আমরা উপলক্ষ মাত্র। সারা বঙ্গভূমি প্রচারকগণ ঘুরিতেছে ত?

দু। হাঁ, তাহাতে ক্রটী হয় নাই।

ত। কাজ কিরূপ হইতেছে?

দু। কাজ ভালই হইতেছে,—সমগ্র বঙ্গভূমে যেন এক মহাশক্তির আবির্ভাব হইয়াছে। আগে যে জাতি নিদ্রার আলস্য লইয়া মুদিতচক্ষে কাল কাটাইত, এখন তাহারা যেন একটু জাগিয়া বসিয়াছে। কিন্তু—

ত। কিন্তু কি দুর্গাদাস?

দু। এই সমগ্র জাতিকে একসূত্রে বাঁধিতে হইলে এক অক্ষুন্ন পতাকা চাই। তাহা কোথায়?

ত। তুমি কি স্বরাজ প্রতিষ্ঠার কথা বলিতেছ?

দু। হাঁ।

ত। আমিও তাহা ভাবিয়াছি,—বোধহয়, মা আমাদের সে অভাব পূর্ণ করিয়াছেন।

দু। আগামী পরশ্ব রাজগ্রামে এক বৃহতী সভার অধিবেশন

হইবে, সকলে সেখানে এই বিষয় স্থির করিতে আপনাকে অনুরোধ করিয়াছেন।

ত। তাহাই হইবে।

দ্বিচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

রাজগ্রামের দক্ষিণপার্শ্ব বহিয়া গোমতী নদী কল কল স্বরে তাহার বাঞ্ছিতের উদ্দেশে চলিয়া যাইতেছিল। তীরে বহুদূর বিস্তৃত আম্রকানন। সেই ছায়াচ্ছন্ন আম্রকাননের মধ্যে শারদীয় দিবা দ্বিপ্রহরে বহুসহস্রলোক সমাগত হইয়াছে। সাগরের তরঙ্গের ন্যায় কেবল মানবের প্রবাহ,—কিন্তু স্থির। সহস্র সহস্র লোক একত্রে উপবিষ্ট—কিন্তু যেন নিশ্বাসনিরুদ্ধ। কোন শব্দ নাই, কোন সাড়া নাই।

সেই জনপ্রবাহের মধ্যস্থলে এক উন্নত মঞ্চ। মঞ্চোপরি তর্কালঙ্কারঠাকুর উঠিয়া দাঁড়াইলেন। জনসমূহের নয়ন-মন সেই দিকে একত্র হইল; জলদ-গম্ভীর স্বরে তর্কালঙ্কার ঠাকুর বলিলেন,—

"বন্ধুগণ, ভ্রাতৃগণ,—আজি আমরা একত্রে যে জন্য সমবেত হইয়াছি, তাহা সকলেই জানেন। আমাদের দেশে অরাজকতা উপস্থিত হইয়াছে। সবলে দুর্ব্বলের উপর অত্যাচার করিতেছে, ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা বিদূরিত হইয়াছে। রমণীগণ লাঞ্ছিত ও অপমানিত হইতেছেন। কষ্টসঞ্চিত মুখের গ্রাস অপরে কাড়িয়া লইতেছে,—মানুষ পশুর ন্যায় দলিত হইতেছে। কেন হইতেছে,—বন্ধুগণ,

ভাবিয়া দেখিয়াছেন কি? আমাদেরই অবহেলায় আমাদের এত দুর্দ্দশা! আমাদেরই সহায়তায় অত্যাচারী উন্নত। যে অত্যাচারী, সে রাজা নয়। অত্যাচারীর উপরে রাজভক্তি বা রাজভয় কেন হইবে? আমাদিগকে রাজার বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে হইবে না,—অত্যাচারের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে হইবে। ভগবান্ অত্যাচারীর অত্যাচার বিনাশ করেন,—আমরা উপলক্ষ মাত্র হইব। যাহার যে শক্তি,—যে সাধনা আছে, দেশের জন্য তাহা নিয়োগ করিতে হইবে। দিল্লী হইতে বহুসহস্র সৈন্য লইয়া সেনাপতি আসিতেছেন, আমাদিগকে শাসন করিতে—বঙ্গের প্রতি পল্লীপ্রান্তে মহারাষ্ট্রীয় ভল্ল হস্তে করিয়া আমাদিগকে নিহত ও আমাদিগের ধনরত্ন লুণ্ঠন করিতে উপস্থিত। দেশের জমিদারগণ নিয়ত রক্ত শোষণ করিতে, অত্যাচারের আগুনে পোড়াইতে প্রস্তুত হইয়াছেন;—তবে আমরা কেন নিরীহ অবস্থায় কাল কাটাইব? পশুকেও অযথা অত্যাচার করিলে সে ক্ষেপিয়া উঠে—পাষাণস্তূপও অত্যাচারে অত্যাচারে ভাঙ্গিয়া চুরমার হয়। আমাদিগের কেহ না থাকিলেও মা আছেন। মা আমাদের মহাশক্তি—সাধনায় মাতৃশক্তি লাভ হয়। আমরা আজি সেই সাধন-পথে অগ্রসর ও সমবেত হইয়াছি।

এখন শরৎকাল,—ঐ দেখ, মাতৃসেবার জন্য আকাশ নির্ম্মল হইয়াছে,—মেঘ ভিস্তী হইয়া বঙ্গভূমি ধৌত করিয়া দিয়া গিয়াছে। মায়ের চরণসরোজ ধৌত করিবে বলিয়া জলাশয় সকল নির্ম্মল সলিলে নলিনী ফুটাইয়া বসিয়া আছে। সেফালিকা তগর স্থলপদ্ম প্রভৃতি সুগন্ধি পুষ্প সকল সে পদের সেবার জন্য ফুটিয়া বসিয়াছে,—মাঠে মাঠে কাশকুসুম দুলিতেছে,—বাঙ্গালীর

মাতৃ-পূজার সময় আসিয়াছে। ঐ শোন, দূর গৃহস্থের চণ্ডীমণ্ডপ হইতে পুরোহিতের করুণ-গম্ভীর কণ্ঠ হইতে দেবীর উদ্বোধন মন্ত্র ধ্বনিত হইতেছে। বন্ধুগণ! তোমরাও সে মন্ত্রে দেবীর উদ্বোধন কর। বল,—

রাবণস্য বধার্থায় রামস্যানুগ্রহায় চ।
অকালে ব্রহ্মণা বোধো দেব্যাস্ত্বয়ি কৃতঃ পুরা।
অহমপ্যাশ্বিনে তদ্বদ্বোধয়ামি সুরেশ্বরীম্।
যথৈব রামেণ হতো দশাস্যস্তথৈব শত্রূন্
বিনিপাতয়ামি॥

"রজস্তমোরূপী রাবণ-কুম্ভকর্ণ এক দিন দেব-সমাজে প্রবল অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছিল,—প্রজাকুল তাহাদের অত্যাচার-অনাচারে আকুল হইয়াছিল,—তারপরে মহাশক্তির উদ্বোধন ও সাধনা করিয়া সে অত্যাচার ধ্বংস করা হইয়াছিল।"

"বন্ধুগণ,—আমরা সকলে একমনে একপ্রাণে সেই শক্তির উদ্বোধন ও সাধনা করিব—দেশের অত্যাচার বিলুপ্ত হইবে।"

আর একজন উঠিয়া দাঁড়াইয়া পুলক-কম্পিত কণ্ঠে বলিলেন,—"দেব, সব শুনিলাম, সব বুঝিলাম,—কিন্তু কি উপায়ে অত্যাচারের প্রবল গতি নিরোধ করা যাইতে পারে? অত্যাচারীর শক্তি প্রবল,—আর আমরা সকলে যুদ্ধবিদ্যাদি-অনভিজ্ঞ। তাহাদের সহিত সম্মুখ সংগ্রামে আমাদের পতন নিশ্চয়।"

অধিকতর উচ্চস্বরে তর্কালঙ্কারঠাকুর বলিলেন,—"না না, সে কথা ভুল। আমরা দুর্ব্বল—আমরা হীন একথা কেহ ভাবিও

না। মানুষ দীর্ঘ সময় ধরিয়া যাহা ভাবনা করে, তাহাই হইয়া যায়। কেবল মানুষ নহে—সমগ্র জীবজগতে এই একই নিয়ম। তৈলপায়িকা কাচপোকা ভাবিতে ভাবিতে কাচপোকা হইয়া যায়। জগৎ মিথ্যা, ব্রহ্ম সত্য—বৈদান্তিক এই কথা ভাবিতে ভাবিতে ব্রহ্মত্ব লাভ করে। আমরা দুর্ব্বল কিসে,—আমরা হীন কিসে? মাতৃ-শক্তিতে মানুষ বলবান্ হয়। মাতৃপূজাবিমুখ হইয়াই আমরা হীন—আমরা দুর্ব্বল হইয়া গিয়াছি। যদি আমরা মাকে চিনি—মাকে ডাকি, মা তাঁহার মহাশক্তি আমাদিগকে প্রদান করিবেন। আমরা অত্যাচারের প্রবল আগুন নিভাইতে সক্ষম হইব। যাহাদের মা দশহস্তে দানবদলন করেন—যাদের মা লোল-রসনা বিস্তারে দৈত্য রক্তবীজের রক্তধারা পান করেন,—তাদের শক্তি-অভাব কেন হইবে? তবে এক জ্ঞান,—মায়ের নিকট সব সন্তান সমান,—"আমি" বলিয়া গণ্ডী দিলে কোন কাজ হয় না। মাকে ডাক—মার সব সন্তান এক হও—একমহাস্বার্থে কোমর বাঁধ—তুচ্ছ অত্যাচারি-শক্তি—কোন্ সমুদ্রপারে পলাইয়া যাইবে।"

যিনি পূর্ব্বে কথা কহিয়াছিলেন, তিনি বলিলেন,—"ঠাকুর, আমার সন্দেহ হইতেছে এই জন্য যে, বহুসহস্র বলবান্ সৈন্য দিল্লী হইতে আসিতেছে—তার উপরে নবাব-সৈন্য আছে, ফৌজদারের ফৌজ আছে, জমিদারের সিপাহী আছে। আমরা কি পারিব?"

ত। সংখ্যায় আমরা কি কম? আমাদের ঘরের দুয়ারে আসিবে—আমরা তাদের দুয়ারে যাইব না।

প্র। তাহারা শিক্ষিত।

ত। মানুষ-মারাটা অধিক বিদ্যার কাজ নয়। আমাদের অনেক বন্ধু সে বিদ্যা শিক্ষা করিতেছে।

প্র। তাহারা বলবান্।

ত। আর আমরাই কি মাখনের মানুষ।

প্র। তাহারা অনেক আগ্নেয় অস্ত্রের অধিকারী।

ত। লাঠির আগে ভূত পলায়।

প্র। আর একটি কথা বলিতে সঙ্কুচিত হইতেছি।

ত। সঙ্কোচে প্রয়োজন নাই—মুক্ত প্রাণে সকল কথারই এ স্থানে সমালোচনা হওয়া কর্ত্তব্য।

প্র। কৃষ্ণগোবিন্দবাবু আপনার যজমান,—আপনি তাঁহার বৈদিক গুরু। তাঁহার অন্নে প্রতিপালিত,—আপনি তাঁহার বিরুদ্ধে কার্য্য করিবেন কি প্রকারে? বর্ত্তমানে আমাদের স্বদেশী বন্ধু হইয়া তিনি স্বদেশদ্রোহী হইয়াছেন।

তর্কালঙ্কারঠাকুর হো হো করিয়া হসিয়া উঠিলেন। বলিলেন,—"স্বদেশী বিদেশী বলিয়া কোন বিশেষ কথা নাই। যেখানে অত্যাচার, সেই খানেই দানবীশক্তি, দানবীশক্তি বিনাশই দেবশক্তির কাজ। যে দানব হইবে, তাহাকে নিরস্ত করাই প্রয়োজন। কৃষ্ণগোবিন্দ আমার যজমান,—কৃষ্ণগোবিন্দ আমার প্রতিপালক,—তাহা সত্য। কৃষ্ণগোবিন্দ যখন মনুষ্যত্ব পরিত্যাগ করিয়া দানবত্ব গ্রহণ করিল, তখন আমি তাহাকে বিধি-মতে বুঝাইলাম, কিন্তু বুঝিল না—হৃতশক্তি ফিরাইয়া আনিতে সমর্থ হইল না। মানুষ মরণের পথে উন্নত হয়—কৃষ্ণগোবিন্দের মরাই প্রয়োজন। কৃষ্ণগোবিন্দের উন্নতি এখন মরণে—তাই মরণের মন্ত্র প্রয়োজন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ভারতের রজস্তমোগুণাবলম্বী ব্যক্তিগণকে

কুরুক্ষেত্র মহাসমরে মরণ মন্ত্রই প্রদান করিয়াছিলেন। নিজ বংশ ধ্বংসের পথে প্রেরণ করিয়াছিলেন।"

প্র। বুঝিলাম,—এখন আর একটি কথা।

ত। কি বলুন?

প্র। আমাদের একজন প্রধান নেতার প্রয়োজন। নেতা না থাকিলে শক্তিচালনা অসম্ভব।

ত। সে কথা অতি সত্য। কিন্তু নেতৃত্বশক্তি সংযমের উপর নির্ভর করে।

প্র। আমরা ইচ্ছা করিতেছি,—আপনি আমাদের রাজা হউন। আমরা স্বরাজ-প্রতিষ্ঠা করিব।

ত। অসম্ভব।

প্র। কেন?

ত। আমি সংসারী,—আমি স্বার্থপর। আমি দু'কথা বলিয়া বেড়াইতে পারি। আমি ভাই ভাই এক করিতে অনু-রোধ-উপরোধ করিতে পারি।

প্র। তবে প্রধান পাইব কোথায়?

ত। ব্যক্তিগত প্রাধান্যে প্রয়োজন নাই। দেশের উন্নতি ব্রহ্মচর্য্যপ্রতিষ্ঠায় হয়। স্বাধীন ভারতে তাহাই ছিল,—ব্রাহ্মণে ব্রহ্মচর্য্য ছিল,—ব্রাহ্মণই যথার্থ নেতা ছিলেন। ক্ষত্রিয়গণ সেই শক্তিবলে রাজ্য রক্ষা ও পালন করিতেন। ব্রহ্মচর্য্যই আত্ম-প্রসাদ প্রকাশ করে। অজিতনাথ ব্রহ্মচারী—অজিতনাথ আমা-দের নেতা বা প্রধান হউন। অজিতনাথে শক্তি আছে, যদি দৈবকর্তৃক সে শক্তির বিনাশ না হয়, অজিতনাথ স্বকর্ত্তব্য সাধন করিতে পারিবে।

তখন দিগন্ত কম্পিত করিয়া সহস্র সহস্র কণ্ঠস্বর এক হইয়া ধ্বনিত হইল,—"জয় বঙ্গমাতার জয়! জয় মহারাজ অজিতনাথের জয়! জয় ব্রহ্মচর্য্যাধিষ্ঠাত্রী মহামায়ার জয়!"

অজিতনাথের গলে শত শত সুগন্ধ প্রসূনমাল্য অর্পিত হইল। অজিতনাথ অশ্রুপুলককম্পিত দেহে গদ্গদ স্বরে বলিলেন,—"মা, মা! যে মূর্ত্তি দেখাইয়া দেশের কাজ করিতে আদেশ করিয়াছিলে,—সেই মূর্ত্তিতে দেখা দাও। মা, তোমারই ইচ্ছায় সন্তানগণ আমাকে এই প্রধান পদে বরণ করিল,—মা, তুমি সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়কর্ত্রী। অধম সন্তানের হৃদয়ে বল দাও—বাহুতে শক্তি দাও জীবনেসঞ্জীবনী ভাব দাও। আমি অধম—তুমি এস মা; সেই মাতৃ-মূর্ত্তিতে দেখা দাও।

সহসা বনান্তরাল হইতে শিঙ্গারব হইল। সমাগত ব্যক্তিগণ উঠিয়া অতি কৌশলে দিকে দিকে চলিয়া গেল। এত লোকের গমনে কোন বিশৃঙ্খলা বা গোলযোগ হইল না।

ত্রিচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

কৃষ্ণগোবিন্দবাবু সন্ধ্যার পরে কাছারিগৃহে বসিয়াছিলেন, সেই সময় একজন পদাতিক আসিয়া অভিবাদন করিল।

ফৌজদারের পদাতিক জানিয়া কৃষ্ণগোবিন্দবাবুর শরীর শিহরিয়া উঠিল। তিনি ভাবিলেন, অবশিষ্ট টাকার তাগাদা করিতে আসিয়াছে। পদাতিক বাবুর হস্তে একখানি পত্র প্রদান করিল। পত্রখানি সাবধানে আঁটা ছিল।

পত্রাবরণ উন্মুক্ত করিয়া মনঃসংযোগের সহিত পাঠ করত কৃষ্ণগোবিন্দবাবু চিন্তাযুক্ত হইলেন। অনেকক্ষণ আপনমনে কি চিন্তা করিলেন। পদাতিক দাঁড়াইয়া থাকিয়া থাকিয়া অবশেষে বলিল,—"হুজুর চিঠির জবাব লইয়া যাইবার হুকুম আছে।"

দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কৃষ্ণগোবিন্দবাবু বলিলেন,— "কা'ল সকালে উত্তর দিব।"

প। অদ্যই ফিরিয়া যাইবার জন্য হুকুম আছে।

কৃ। আমি সমস্ত বিষয় ঠিক না করিয়া উত্তর দিতে পারিব না। কা'ল সকালে তুমি পত্রোত্তর লইয়া যাইও।

পদাতিক বাহিরে চলিয়া গেল। কৃষ্ণগোবিন্দবাবু একাকী বসিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন। চিন্তা যন্ত্রণাদায়ক—যন্ত্রণার পূর্ণ ছবি, তাঁহার মুখে ফুটিয়া বাহির হইতেছিল। পুনঃপুনঃ দীর্ঘশ্বাস তাঁহার হৃদয়ের কষ্ট জ্ঞাপন করিতে লাগিল। অনেকক্ষণ পরে একজন ভৃত্যকে ডাকিয়া বলিয়া দিলেন—"সর্ব্বেশ্বর সিংহকে ডাকিয়া দে।"

সর্ব্বেশ্বর সিংহ তাঁহার মুচ্ছুদ্দী। কিয়ৎক্ষণ পরে সর্ব্বেশ্বর সিংহ উপস্থিত হইলে, তিনি পত্রের বিষয় আদ্যোপান্ত তাঁহার নিকটে বলিলেন, এবং কি উপায়ে এই পৈশাচিক কাণ্ডের অভিনয়ে হস্তক্ষেপণ করা যায়, তাহার পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলেন। সর্ব্বেশ্বর স্বার্থসিদ্ধির জন্য সমস্ত কাজই করিতে পারে। যখন কৃষ্ণগোবিন্দের সংসারে দেবতার আশ্রয় ছিল, তখন সর্ব্বেশ্বর সিপাহীর সর্দ্দারী করিত। তারপরে দেবতার আসনে যখন দানবের প্রতিষ্ঠা হইল,—পূর্ব্বকার মুচ্ছুদ্দী কাজ ছাড়িয়া

চলিয়া গেল, তখনই সর্ব্বেশ্বরের পদের উন্নতি হইল,—সর্ব্বেশ্বর মুচ্ছুদ্দী হইলেন।

সর্ব্বেশ্বর সমস্ত কথা শুনিয়া বলিল,—"ভয় কি প্রভু। রাজশক্তি আমাদের পক্ষে। দেশের প্রজার বুকের রক্ত শোষণ না করিলে কবে কোন্ রাজা বা জমিদারের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে? আর ধরিতে গেলে, আমাদেরই অত্যাচারে প্রজাগণ বিদ্রোহী হইয়াছে,—তাহাদিগকে দমন না করিলে আমাদেরই অপমানের বিষয়। অতএব একার্য্যে ইতস্ততঃ করিলে চলিবে কেন?"

কৃষ্ণগোবিন্দবাবু সে কথার কোন উত্তর করিলেন না। বোধহয়, তিনি সে কথায় আত্মপ্রসাদ লাভ করিতে সক্ষম হইলেন না। তিনি উঠিয়া বাটীর মধ্যে চলিয়া গেলেন।

ঝটিকাবেগকম্পিত পক্ষিণীর ন্যায় কর্ত্রীঠাকুরাণী সর্ব্বদাই কম্পিতা থাকিতেন। তাঁহার সংসারে অশান্তির আগুন জ্বলিয়াছে —সর্ব্বদাই ভাবনা—কখন কি হয়। তর্কালঙ্কার ঠাকুরের সেই দৈববাণী সর্ব্বদাই তাঁহার প্রাণের মধ্যে জাগিয়া জাগিয়া আকুল করিত। কর্ত্রীঠাকুরাণী শারদীয়-জ্যোৎস্নাপ্লাবিত রকে বসিয়া ইষ্টনাম জপ করিতেছিলেন,—কর্ত্তা কৃষ্ণগোবিন্দবাবু তথায় গিয়া দর্শন দান করিলেন।

জপের মালা নামাইয়া রাখিয়া কর্ত্রীঠাকুরাণী স্বামিচরণে প্রণাম করিলেন। স্বামীর মুখ ম্লান-চিন্তাক্লিষ্ট দেখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া করুণ-কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তোমার মুখ এত ম্লান কেন? আজি আবার কোন নূতন ঘটনা ঘটিয়াছে নাকি?"

দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কৃষ্ণগোবিন্দবাবু বলিলেন,—"গৃহিণী, স্বহস্তে হৃদয়ের মধ্যে আগুন জ্বালিয়া লইয়াছি। এখন

পলে পলে দণ্ডে দণ্ডে পুড়িতেছি,—নূতন ঘটনা সর্ব্বদাই, দুশ্চিন্তা লাগিয়াই আছে, কোন্‌টা কখন বলিব? বলিয়া আর কূল নাই। তুমি স্ত্রীলোক—তত কথা শুনিয়া তুমি কি করিবে?"

গৃহিণী ব্যস্তভাবে চঞ্চল স্বরে বলিলেন,—"কেন নাথ! আজি ওকথা কেন? তুমিইত আমায় শিখাইয়াছ—স্ত্রী স্বামীর ছায়ার ন্যায় অনুগতা, হিতকর্ম্মে সখীর ন্যায়, আদিষ্ট কর্ম্মে দাসীর ন্যায়। আমি তোমার ধর্ম্মপত্নী—তোমার সকল কথা আমায় কেন বলিবে না?"

কৃ। গৃহিণী,—তেমন দিন আগে ছিল,—আগে প্রাণে বল, সংসারে শান্তি, চারিদিকে সুখের ছবি ছিল। তখন কদাচিৎ কোন একটা বিপদ আসিত—তোমার সহিত পরামর্শ করিতাম। এখন চারিদিকে অশান্তি—প্রাণ বলহীন, সর্ব্বত্র দুঃখের ছবি। কয়টা কথা—কয়টা সংবাদ তোমাকে জানাইব?

গৃ। এমন হইবে, সে কথা তর্কালঙ্কার ঠাকুর আগেই বলিয়াছিলেন।

কৃ। দুরদৃষ্ট সে কথা শুনিতে দেয় নাই। তখন বুঝি নাই, রাজার দাসত্বে সুখ নাই—কেবলই দুঃখ। রাজার দাসত্বে মনুষ্যত্ব হারাইতে হয়—কেবল আদেশের উপরে আদেশ পালন করিতে হয়। গোলাম হইতে হইতে গোলামের গোলাম সাজিতে হয়।

গৃ। আজিকার ব্যাপারটা আমি শুনিতে চাই।

কৃ। ব্যাপার ভয়ানক। ফৌজদার সাহেব পত্র লিখিয়াছেন, দিল্লী হইতে চল্লিশ হাজারের উপর সৈন্য লইয়া একজন সেনাপতি আসিতেছেন,—

গৃ। কেন?

ক্ল। বঙ্গবাসী প্রজাগণকে দলন করিতে।

গৃ। কেন তাহাদের অপরাধ?

ক্ল। তাহাদের উপর যে অনল-অত্যাচার হইতেছে, তাহারা সে অত্যাচার সহ্য করিতে না পারিয়া বিদ্রোহী হইয়াছে।

গৃ। তোমাকে তাহার কি করিতে হইবে?

ক্ল। বলি শোন,—বঙ্গের নবাবের সৈন্য লইয়া একজন সুদক্ষ সেনাপতি অপর দিক্ হইতে আসিতেছেন। ফৌজদার সাহেবকে ফৌজ লইয়া এবং আমাকে সিপাহী লইয়া সাজিতে হইবে। অর্থাৎ বাদশাহের সৈন্য দক্ষিণ হইতে এবং নবাবসৈন্য উত্তর হইতে বঙ্গভূমি আক্রমণ করিবে। আর ফৌজদার ফৌজ লইয়া এবং আমি সিপাহী লইয়া দানবের ন্যায় মধ্য হইতে প্রজার ধনপ্রাণ লুণ্ঠন করিব,—এইরূপ আদেশ আসিয়াছে।

গৃহিণী কোন কথা কহিতেছিলেন না। বাতাহত বেতসীর ন্যায় দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া কাঁপিতেছিলেন। কর্ত্তা বলিলেন,—"এখনও বলা শেষ হয় নাই। যখন দেবতা-সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া দানবের সঙ্গে মিশিয়াছি, তখন দানবের কাজ করিব, তাহাতে আর আপত্তি কি? তবে যাহা ক্ষমতায় কুলাইবে না—সংগ্রহ হইবার উপায় নাই, তাহাই করিতে আদিষ্ট হইয়াছি।"

মৃদুকম্পিত কণ্ঠে গৃহিণী বলিলেন,—"কি?"

ক্ল। অন্যূন লক্ষ সৈন্যের দুই মাসের উপযুক্ত খাদ্য সংগ্রহ করিয়া রাখিতে আদেশ পাইয়াছি। আদেশপত্রে লেখা আছে,—প্রজাগণের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া শস্য সংগ্রহ করিবে। কিন্তু হায়!

প্রজার গৃহে কি একমুষ্টি অন্নের সংস্থান আছে? পূর্ব্বে সে সমস্তই লুণ্ঠন করিয়াছি।

গৃ। যদি সংগ্রহ না হয়?

ক্ব। সৈন্যগণের রসদাভাব হইলে, অমাকে সংহার করিবে।

গৃ। তুমি পত্রের উত্তরে লিখিয়া দাও, প্রজার গৃহে শস্যাভাব; আমার দ্বারা সংগ্রহ হইতে পারিবে না।

ক্ব। পত্রে লিখিয়াছে, কোন ওজর আপত্তি শোনা যাইবে না। রসদ সংগ্রহ করিতেই হইবে। কেবল এই পত্র তুমি পাইয়াছ, তাহারই সংবাদ চাই।

গৃ। আমি এক কথা বলি।

ক্ব। কি বল?

গৃ। যাহাদের জমিদারী তাহাদের ফিরাইয়া দিয়া চল আমরা দেশের প্রজার শরণাগত হই। পরের দাস হইয়া ঐশ্বর্য্যে লাভ কি প্রভু? ঐশ্বর্য্যের ত এই মূল্য—ন্যায় অন্যায়, ধর্ম্ম অধর্ম্ম যাহা অনুমতি করিবে, তাহাই করিতে হইবে। ও ঐশ্বর্য্য গোলামীর শিকল।

ক্ব। উপায় নাই।

গৃ। কেন?

ক্ব। প্রজাগণ বিদ্রোহী হইয়া দূরে বনান্তরালে আশ্রয় লইয়াছে। দিল্লীর সৈন্য ও নবাবের সৈন্য তাহাদিগকে ঘিরিয়া লইয়াছে। ফৌজদারী সৈন্য আগামী কল্যই বাহির হইবে।

ঠিক এই সময় তথায় মহামায়া ও নীরদা আসিয়া উপস্থিত হইল। মহামায়া আকুল কণ্ঠে কহিল,—"বাবা, তোমার কথা সব শুনিয়াছি! মানুষ চিরকাল বাঁচিয়া থাকিবে না। অধর্ম্ম

লইয়া মরণপথে যাইবার প্রয়োজন কি? যে দেশের শত্রু, সে নরকগামী—আমরা সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া লোকের শরণাগত হইগে। অজিতনাথকে দেশের লোক রাজা বলিয়া স্বীকার করিয়াছে। অজিতনাথের শরণাগত হইলে আমরা ত্রাণ পাইব।"

নীরদা হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। সে হাসিতে দানবীশক্তি ছড়াইয়া পড়িল। ব্যঙ্গের হাসি হাসিয়া বলিল,—"মানুষ যদি চিরকাল না বাঁচে, তবে এক পথের ভিখারীর চরণ-লেহনে প্রয়োজন কি?"

কৃষ্ণগোবিন্দ সে শক্তিতে পরাহত হইলেন। বলিলেন—"গুরুকন্যা ঠিক বলিয়াছেন। জীবন যদি অস্থায়ী, তবে এত চঞ্চল হইব কেন? কেন এক দাসত্ব করিয়া অপরের দাস হইব?"

চতুশ্চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

—০—

সেই দিন হইতে সকলে স্বরাজের প্রতিষ্ঠা করিল। ব্রহ্মচর্য্যের উপরে শক্তি প্রতিষ্ঠা হয়,—অজিতনাথ ব্রহ্মচারী; ব্রহ্মচারী অজিতনাথ সেই শক্তির কেন্দ্রস্থলে দণ্ডায়মান হইলেন,—সকলে তাঁহার গলে বরমাল্য প্রদান করিল।

এদিকে বাঙ্গালী বিদ্রোহী বলিয়া ভারতের রাজ্যেশ্বর বাদশাহের প্রতিনিধি ঘোষণা করিয়াছিলেন। নবাব বিদ্রোহি-গণের মুণ্ডচ্ছেদ করিবার জন্য তাঁহার অত্যাচারের কামান-বহ্নি জ্বালিয়াছিলেন, চারিদিকের ফৌজদার সাহেবেরা আপন আপন

ফৌজ লইয়া পথে ঘাটে বাঙ্গালীর বালক, বৃদ্ধ, অন্ধ, খঞ্জ, দীন-দুঃখী ও অসহায়া অবলাগণকে ধরিয়া ধরিয়া তাহাদিগের বিদীর্ণ বক্ষে অত্যাচারের পাষাণ চাপা দিতে লাগিলেন। হিন্দুর দেবদেবী অপহৃত, অপবিত্রীকৃত, লুণ্ঠিত ও বিচূর্ণীকৃত হইতে লাগিল। দেশে আরও হাহাকার আর আকুল-ক্রন্দন বাড়িয়া পড়িল। রাজাধিরাজ বুঝিলেন না, কিরূপ মর্ম্মবেদনায়—কিরূপ অত্যাচার-অবিচারের আগুনে বঙ্গপ্রজা পায়ের উপর ভর করিতেছে। নবাব বুঝিলেন না, তাহারা তাঁহার দুয়ারে আসিয়া কত কাঁদিয়া ফিরিয়া গিয়াছে, ফৌজদারগণ মনে করিলেন না, তাহাদের ধন-প্রাণ রক্ষার জন্য তাঁহাদের বীরভুজবলের আশ্রয় চাহিয়া চাহিয়া তাহারা কিরূপে অবমানিত ও বিতাড়িত হইয়া গিয়াছে।

যখন তাহারা আশ্রয়শূন্য, আশা-ভরসাশূন্য ও নির্ভরশূন্য হইয়াছে, তখনই তাহারা আপন পায়ে ভর দিয়া শেষ দেখা দেখিতেছে। যদি এখনও একবার বাদশাহ নামদার কিম্বা তাঁহার বঙ্গীয় প্রতিনিধি নবাব বাহাদুর একটি মুখের কথা বলিয়া ডাকিয়া আশ্রয় দান করিতেন, তবে নিশ্চয়ই তাহারা ভক্তিময় প্রাণে আনন্দিত মনে উড্ডীয়মান রাজপতাকাতলে শিরোনমন করিয়া রাজপূজা করিতে পারিত। কিন্তু তাহা হইল না। অস্ত্রবল-দর্পিত রাজ-সৈন্যগণ বঙ্গীয় প্রজার সর্ব্বনাশ সাধনোদ্দেশে রণদুন্দুভির ভীষণ ভৈরব-রবে দিগন্ত কম্পিত করিলেন।

বাঙ্গালিগণও নিশ্চিন্ত ছিল না। জঙ্গলে জঙ্গলে তাহাদিগের যে সকল কামান-বন্দুক বারুদ ও অস্ত্র-শস্ত্র প্রস্তুত হইতেছিল, তাহা লইয়া তাহারা মুসলমান-সৈন্যের সম্মুখীন হইল। বাঙ্গালীও

বাঙ্গালীর বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিল। কৃষ্ণগোবিন্দবাবুর সিপাহী সকল বাঙ্গালীর বিরুদ্ধে অস্ত্রোত্তোলন করিল।

বনে জঙ্গলে নদীসঙ্কুল স্থানে খণ্ডযুদ্ধ চলিতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে বাঙ্গালিগণ একস্থানে যুটিয়া একত্রে যুদ্ধ করিত না,—ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ভাবে—এদিকে ওদিকে থাকিয়া—বনমুখে, নদীসঙ্কুল-স্থানে, গিরিসঙ্কটে শত্রুগণের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল। তাহাদের দেশ, তাহারা সর্ব্বত্র পরিচিত—কাজেই এই সকল স্থানে রাজকীয় সৈন্ত পরাজিত হইতে লাগিল। কিন্তু ইহার পরে রাজকীয় সেনাপতিগণ পরামর্শ করিয়া ক্রমে ক্রমে চারিদিক্ হইতে ছাইয়া আসিতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে বাঙ্গালিগণ ব্যাধজালজড়িত হরিণযুথের স্তায় আবদ্ধ হইয়া পড়িতে লাগিল।

একদিন দিবা দ্বি-প্রহরের সময় চারিদিক্ হইতে রাজকীয় সৈন্তগণ বাঙ্গালীর বিক্ষিপ্তদল একত্র করিয়া লইয়া ভীম বিক্রমে যুদ্ধ করিতে লাগিল। রাজকীয় সৈন্তগণ সুশিক্ষিত তাহাদিগের অস্ত্র-শস্ত্র উন্নত প্রণালীতে প্রস্তুত এবং তাহারা সংখ্যায় অত্যন্ত অধিক ; কাজেই বাঙ্গালীরা আর সে বেগ সহ্য করিতে পারে না। কিন্তু তাহারা মরণ-ভয়ে ভীত নহে। অত্যাচারের ভীষণ আগুনে তাহাদের আশ্রয় স্থান দগ্ধ হইয়া গিয়াছে, পাপিষ্ঠগণের নরক-নজরে যাহাদের রমণীর সতীত্বরত্ন লুণ্ঠিত হইয়াছে, গৃহের পালিত পশু অপহৃত হইয়াছে—মুখের গ্রাস অপরে লইয়াছে, তাহাদের জীবনে প্রয়োজন কি? তাই তাহারা শরীরে রক্তবিন্দুর সংস্থান পর্য্যন্ত যুদ্ধ করিতে লাগিল,—তারপরে হয় অসংখ্যগুলি বক্ষে ধারণ করিয়া, নয় তীক্ষ্ণধার অস্ত্র কণ্ঠলগ্ন করিয়া ভূতলে পড়িয়া চক্ষু মুদ্রিত করিয়া সকল জ্বালার অবসান করিতে লাগিল।

অজিতনাথ দলের নেতা—তিনি দেখিলেন, আর রক্ষা নাই। বাঙ্গালী নাম বুঝি জগৎ হইতে অন্তর্হিত হয়। তখন তিনি একবার আকাশের দিকে চাহিলেন। তাঁহার দুই চক্ষু পোরা জল,—কাতর করুণ কণ্ঠে ডাকিলেন,—"কোথায়, মা! আমি যে নিজ চক্ষুতে দেখিয়া আসিয়াছি, তুমি সন্তানের শক্তিদান জন্য মহাশক্তির সাধনা করিতেছিলে। মা,—আজ তোমার সন্তানগণ যে বিলুপ্ত হয়। হিংসা করিয়া, দ্বেষ করিয়া, কামনা করিয়া ইহারা যুদ্ধ করিতে আসে নাই। আত্মরক্ষাই ইচ্ছা,—দুর্ব্বলের বল, শক্তিহীনের শক্তি মা, রক্ষা কর।"

অজিতনাথ দেখিলেন, মেঘজাল ভেদ করিয়া সিংহবাহনে মাতৃ-মূর্ত্তি মর্ত্ত্যধামাভিমুখে আগমন করিতেছেন। দশভুজে দশবিধ অস্ত্র। মহাশক্তির লাবণ্যজ্যোতিতে দিগন্ত উদ্ভাসিত হইয়াছে। অস্ত্রকিরণে দশদিক্ ঝলসিয়া উঠিতেছে।

ভক্তিকারুণ্য কণ্ঠে অজিতনাথ ডাকিয়া বলিলেন,—"ভ্রাতৃগণ, বন্ধুগণ, আর ভয় নাই। আমাদের মা,—জগতের মহাশক্তি ঐ দেখ দুর্ব্বল সন্তানগণকে রক্ষা করিবার জন্য আবির্ভূতা হইতেছেন। ঐ শোন, দিগন্ত কাঁপাইয়া "মাভৈ মাভৈ" ভৈরব-ধ্বনি উত্থিত হইতেছে।"

অপর যাহারা চাহিল, তাহারা সে মূর্ত্তি দেখিতে পাইল না। কিন্তু দেখিতে পাইল অগ্রবর্ত্তী বাঙ্গালী যোদ্ধারা রাজসৈনিকগণকে কচুকাটার মত করিয়া কাটিয়া যাইতেছে,—সকলেই বুঝিতে পারিল দুর্ব্বল বাঙ্গালীর বাহুর বলে একার্য্য হইতেছে না। দৈবীবল আসিয়া সে বাহুতে আশ্রয় করিয়াছে,—তাই তাহারা মহাশক্তিধর হইয়া পড়িয়াছে। তাহার ফলে, সে দিনকার

সেই ভীষণ যুদ্ধে রাজকীয় সৈন্যগণ সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত ও পরাজিত হইয়া গেল।

যখন সন্ধ্যার আঁধারে দিগন্ত আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল, তখন বাঙ্গালীরা জয়লাভ করিয়া সিংহনাদ ছাড়িল,—আর রাজকীয়, শিক্ষিত সৈন্যগণ কাল-রণভূমিতে পড়িয়া শেষ নিদ্রায় অভিভূত হইল, কতক আহত হইয়া বাহকগণ কর্ত্তৃক নীত হইল, কতক দিক্ হইতে দিগন্তে পলাইয়া প্রাণ বাঁচাইল।

পঞ্চচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

সেই যুদ্ধের সংবাদ পাইয়া সকলে বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইলেন। ফৌজদার সাহেব হইতে ভারতাধীশ্বর বাদসাহ নামদার পর্য্যন্ত চমকিয়া উঠিলেন। যে বাঙ্গালীদিগকে পায়ের তলার বালি বলিয়া ভাবিয়াছিলেন, তাহারা এই কার্য্য করিল,—কাজেই তাহাতে তাঁহারা অতিমাত্র বিস্মিত হইয়া পড়িলেন। কিন্তু তাঁহারা ভাবেন নাই, শান্ত বালুকাকণারাশি যখন মার্ত্তণ্ডের অসহ্য তাপে উত্তপ্ত হইয়া পড়ে, তখন তাহারা ভীমাকার ধারণ করিয়া বাতাসে উড়িয়া বিশ্ববিনাশে সমর্থ হয়।

বাদসাহ নামদার বঙ্গবাসীর নাম বিলুপ্ত করিবার জন্য আদেশ প্রদান করিলেন। নবাব সাহেব সমগ্র সৈন্য, সমগ্র ফৌজ সাজাইলেন। কিন্তু বাঙ্গালীরা তাহাতে ভীত হইল না। এই সময় কে জানে—কোন্ শক্তির বলে আকৃষ্ট হইয়া এক পার্ব্বত্য বন্য জাতি তাহাদিগের আশ্রয় স্থান হইয়া দাঁড়াইল,—এবং বঙ্গবাসীর

সঙ্গে আসিয়া যোগদান করিল। তাহারা তীর-ধনু লইয়া যুদ্ধ করিয়া থাকে। একবৎসর ব্যাপিয়া উভয় দলে বহু যুদ্ধ হইল,—কিন্তু বঙ্গবাসীগণকে আর বশে আনা গেল না। তখন রাজকীয় সৈন্যগণকে লইয়া হতাশের দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া সেনাপতিগণ চলিয়া গেল। সে দেশ স্বাধীন হইল।

বাঙ্গালী স্বরাজ সংস্থাপন করিল। ব্রহ্মচর্য্য প্রতিষ্ঠার উপরে ইহার সিংহাসন প্রোথিত হইল। স্বার্থহীন পবিত্রব্রতধারী অজীতনাথ নেতৃত্বপদ গ্রহণ করিলেন। তর্কালঙ্কার ঠাকুর সে স্বরাজের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়া,—সে নৌকায় তিনিই কর্ণধার সাজিলেন। দেশের অধিকাংশ বুদ্ধিমান্, কর্ম্মকুশল ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ লোক সকলে মিলিয়া এক সমিতি সংস্থাপন করিলেন,—দেশের কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য রাজনৈতিক কার্য্য এ সকলেরই আন্দোলন—আলোচনা ও কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য অবধারণ সেই সভা হইতে সম্পন্ন হইতে লাগিল। দেশে আবার সম্পূর্ণ শান্তি ফিরিয়া আসিল। গ্রামে গ্রামে আবার সন্ধ্যার দীপ জ্বলিল,—পরিত্যক্ত গৃহে গৃহে আবার গৃহস্থের মঙ্গল শঙ্খ বাজিতে লাগিল। কৃষকগণ আবার কৃষিকার্য্য করিতে লাগিল। বণিক্ ব্যবসায়ি ও ব্রাহ্মণগণও বিদ্যা-চর্চ্চায় মনঃসংযোগ করিলেন। দেশ হইতে মুসলমান ফৌজদার উঠিয়া গেল। জমিদারগণ স্বরাজ-সমীপে কর পাঠাইতে লাগিল। কৃষ্ণগোবিন্দ বাবু স্বদেশদ্রোহী বলিয়া জমিদারী হইতে বিচ্যুত ও বন্দী হইলেন। এইরূপে আরও একবৎসর কাটিয়া গেল।

দিল্লী হইতে বাদসাহ নামদার এক দূত প্রেরণ করিলেন। দূতের নিকট যে পত্র পাঠাইয়াছিলেন, তাহার মর্ম্ম এইরূপ :—

"তোমরা বিদ্রোহী হইয়াছ, আমার শাসন অমান্য করিয়াছ।

অবশ্য তোমরা বাহুবলেই এরূপ করিয়াছ; কিন্তু মনে করিও না যে, তোমাদের দিন এমনই যাইবে। আমি সামান্য আয়োজনে—কয়েকজন মাত্র সৈন্য ও অদূরদর্শী কয়েকটি সামরিক কর্ম্মচারী তোমাদের দমনার্থ পাঠাইয়াছিলাম,—তাই জয় করিয়া তোমরা ভাবিতেছ, আমাকেও জয় করিয়াছ—তোমাদের সে ধারণা যে ভ্রমাত্মক, ইহা অল্পদিনেই বুঝিতে পারিবে। দিল্লীর বাদসাহের সামরিক দুর্গে যে কত সৈন্য ও কত অস্ত্র-শস্ত্র আছে, আগামী বর্ষান্তে তাহার পরিচয় প্রাপ্ত হইবে। মনে করিও না যে, তোমরা স্বাধীন হইয়াছ।

তবে বিদ্রোহী হইলেও তোমরা বীর পুরুষ। বীর পুরুষই বীরের সম্মান জানে। তোমরা যাহা করিয়াছ, তাহাই যথেষ্ট ও গৌরবের। আমি ইচ্ছা করি না যে, আমার কতকগুলি বীর প্রজা অকালে কালকবলিত হয়। যদি তোমরা আমার অধীন হইয়া কর প্রদান কর,—তবে বাঙ্গালার যে অংশ বর্ত্তমানে তোমরা স্বাধীন বলিয়া ঘোষণা করিয়াছ, তাহা তোমরা নির্ব্বিবাদে শাসন ও পালন করিতে পার।

আমাকে বার্ষিক কিছু কিছু কর প্রদান করিলেই আমি তোমাদের আর কোন প্রকার দাবীর তলে রাখিব না। তাহা হইলে আমি অধিকার বিচ্যুত হইব না এবং বঙ্গদেশের যে অংশ তোমরা স্বাধীন বলিয়া ঘোষণা করিয়াছ, তাহাও আমারই অধীন হইল। এই লোকের নিকট তোমাদিগের অভিমত জানিতে চাহি।"

সে পত্র আসিয়া সাধারণ সমিতির হস্তে পতিত হইল। কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য অবধারণার্থ জনসাধারণ এক সমিতির আহ্বান

করিলেন। সে সভায় তর্কালঙ্কার ঠাকুর এবং অজিতনাথ উভয়েই উপস্থিত হইলেন।

বাদসাহের পত্র সভায় যথারীতি পঠিত হইলে, কেহ দন্তে দন্ত নিষ্পেষণ করিলেন, কেহ স্পষ্টতঃ বলিলেন—"আর অত্যাচারী রাজার সংশ্রবে যাওয়া হইবে না।" কেহ বলিলেন,—"এখন না পারিয়া কাটামুণ্ডের দাঁত খিচুনী হইতেছে।" অপরে বা বলিলেন—"উহাকেই বলে ভয় দেখাইয়া কাঁধে চড়া।"

গম্ভীর স্বরে তর্কালঙ্কার ঠাকুর বলিলেন,—"সব বুঝিতেছি, সব জানিতেছি, কিন্তু মোগলের প্রতাপ অসীম।"

কথা সমাপ্ত না হইতেই অনেকে বিরক্তিস্বরে তাহার প্রতিবাদ করিল। বলিল,—"বঙ্গের যতখানি আমরা স্বাধীন করিয়া লইয়াছি, ইহার মধ্যে আর মোগলের প্রবেশ করিতে হইবে না। আমরা কোন মতেই আর বিদেশীর কাছে ঘাড় নত করিব না।"

ত। স্বীকার করিলাম, বঙ্গের অনেকখানি অংশ আমরা কিছু দিনের জন্য স্বাধীন বলিয়া ঘোষণা করিয়াছি, কিন্তু অপরাংশ এখনও মোগলের রাজত্বে রহিয়াছে,—তাহাদের উপায়?

তদুত্তরে অজিতনাথ বলিলেন—"তাহাদিগকে স্বাধীনতা মন্ত্র শিক্ষা দিয়া, অস্ত্র-বলাদি প্রদান করিয়া স্বাধীন করিয়া লইব।"

ত। তোমরা ভুল বুঝিতেছ। বঙ্গের ভাগ্যে সে দিন সুদূর পরাহত কি আদৌ ঘটিবে না, কে বলিতে পারে।

অ। আপনি কোন্ দিনের কথা বলিতেছেন?

ত। বঙ্গ স্বাধীন হওয়ার দিন।

অ। জগতের সমস্ত দেশ স্বাধীন—আর বাঙ্গালাই কি চির পরাধীন থাকিবে?

অ। বঙ্গের ভাগ্য নানাকারণে মন্দ।

ত। সে কারণ কি কি?

ত। প্রথমতঃ বঙ্গে বহু জাতির ও বহুধর্ম্মী লোকের বাস। এক মহাস্বার্থে বিজড়িত না হইলে দেশোদ্ধার হয় না। সমগ্র জাতির ও সমগ্র ধর্ম্মীর একস্বার্থে প্রণোদিত হইয়া কার্য্য করা সবিশেষ সুশিক্ষা ও সংযমের প্রয়োজন। বাঙ্গালীর সে শিক্ষা কোথায়? বাঙ্গালার অধিকাংশ লোকই নিরক্ষর।

অ। অপর কারণ কি?

ত। বঙ্গদেশ নানাকারণে অতিশয় দরিদ্র,—দরিদ্রের উচ্চাশা চিরদিনই অপূর্ণ থাকে।

অ। আর?

ত। বঙ্গদেশের দুর্ভাগ্যে এখানকার জলবায়ু যেন ক্ষুদ্র স্বার্থে চিরবিমণ্ডিত। এখানে এক মহান্ স্বার্থ বা জাতীয় স্বার্থ বুঝিতে কেহ নাই—যদি কখন দেশের সমগ্র লোক সেকথা বুঝিতে পারে, তবে সেদিন আসিবে।

অ। তবে এখন কি করিতে চাহেন?

ত। আমি বিবেচনা করি, মোগলসম্রাটের সহিত সন্ধি করা ভাল।

অ। কিরূপ সন্ধি হইবে?

ত। সম্রাট্ সম্রাটই থাকিবেন,—তাঁহাকে বার্ষিক কর প্রদান করা হইবে। আর আমরা যে জাতীয় শক্তির বলে স্বরাজ-প্রতিষ্ঠা করিয়াছি, সেই স্বরাজ দ্বারা দেশের শাসন ও পালন কার্য্য নির্ব্বাহ করিব।

অ। তাহা না করিলে আমাদের কি ক্ষতি হইতে পারে?

ত। ক্ষতি অনেক হইতে পারে। প্রথমতঃ আমরা এমন শক্তি সংগ্রহ করিতে পারি নাই, যদ্দ্বারা বাদসাহের সমগ্র শক্তি বিপর্য্যস্ত করিতে পারি। বাদসাহ যদি পূর্ণবলে আক্রমণ করেন, তবে আমাদিগকে নিশ্চয়ই বিপন্ন হইতে হইবে।

অ। যে মহাশক্তি আমাদিগকে রাজকীয় মহাসমর হইতে রক্ষা করিয়াছেন, সেই শক্তি আবার আমাদিগকে রক্ষা করিবেন।

ত। সে মহাশক্তির আবির্ভাব ও তিরোভাব আছে। সম্পূর্ণ ব্রহ্মচর্য্য প্রতিষ্ঠা না হইলে সে শক্তি পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত হয় না।

অ। সেজন্য আমি বঙ্গের পল্লীতে পল্লীতে ভ্রমণ করিব।

ত। তাহার জন্য সময়ের প্রতীক্ষা করিতে হইবে। ব্রহ্মচর্য্যে শক্তি লাভ হয়—আবার ব্রহ্মচর্য্যও সাধন সাপেক্ষ। সাধন-সাফল্য ও আবার কাল সাপেক্ষ। তারপরে আরও কথা আছে।

অ। সে কথা কি?

ত। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমাদের দেশ বড় দরিদ্র—আমরা কৃষিজাত দ্রব্য লইয়াই জীবন ধারণ করি। যাহারা আমাদের দেশের রক্ষা ও দেশের জন্য যুদ্ধ করিবে, তাহারা কৃষক;—যদি তাহারা ঐ ব্যাপারেই লিপ্ত থাকে, দেশে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইবে। আরও কথা আছে।

অ। সে কথাও বলুন।

ত। বাঙ্গালায় "সোণাফলে" একথা সর্ব্বদেশের সকল লোকেই জানে,—বাঙ্গালার নামে সকল দেশের লোকেরই রসনা-রস ঝর ঝর ঝরিতে থাকে। আমরা স্বাধীন—যদিই মোগল বাদসাহ আমাদের নিকট পরাজিত ও বিতাড়িত হয়েন—তবু আমরা নিরাপদ্ নহি—বিশ্বের শক্তি ঝুকিয়া এরাজ্য দখল করিয়া লইবে।

আর কেবল মাত্র কিছু কর দিয়া যদি আমরা দেশের অন্যান্য সমস্ত ব্যবস্থা করিতে পারি, এখন আমাদের তাহাই শ্রেয়ঃ।

কিন্তু তর্কালঙ্কারের সে কথা অধিকাংশ লোকই গ্রহণ করিল না। তাহারা বলিল,—"যাহা হইবার তাহা হইবে। আমরা যে স্বাধীনতা লাভ করিয়াছি, তাহা আর বিনষ্ট করিতে পারিব না। স্বাধীনতার জন্য মরিতে হয়, মরিব।"

তর্কালঙ্কার ঠাকুর বলিলেন,—"ইহা ঠিক স্বাধীনতা নহে, উচ্ছৃঙ্খলতা। উচ্ছৃঙ্খলতার অনেক বিপদ্।

কিন্তু বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের কথায় কেহ কর্ণপাত করিল না।

ষট্‌চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

দিল্লীতে দূত ফিরিয়া গিয়া যে পত্র দিল, তাহাতে বাদশাহ জানিতে পারিলেন,—বিদ্রোহিগণ বশ্যতা স্বীকার করিবে না। তখন তিনি বিপুল সৈন্য লইয়া একজন বিখ্যাত সেনাপতিকে বঙ্গদেশাভিমুখে প্রেরণ করিলেন।

বঙ্গবাসিগণ সে সংবাদ অবগত হইয়া আবার যুদ্ধের আয়োজন করিতে লাগিল। তাহারা অজিতনাথের ব্রহ্মচর্য্য ও মাতৃ-কৃপার উপরে নির্ভর করিয়া মোগলশক্তির বিরুদ্ধে অস্ত্র পরিচালন জন্য প্রস্তুত হইতে আরম্ভ করিল। অজিতনাথও প্রাণপণে দেশ রক্ষার আয়োজনে যোগদান করিতে লাগিলেন। তর্কালঙ্কার বিপদ গণিলেন,—কিন্তু বিপদে ধৈর্য্য ধারণপূর্ব্বক যাহাতে মোগল-শক্তি বিধ্বস্ত হয়, তাহার আয়োজন ও মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন।

কৃষ্ণগোবিন্দবাবু তাঁহার নিজ বাড়ীতেই বন্দীরূপে সপরিবারে বসতি করিতেছিলেন। আহারে-বিহারে ধর্ম্মে-কর্ম্মে তাঁহাদের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ছিল,—কেবল গ্রামের বাহিরে যাইতে বা বাহিরের কোন লোকের সহিত মিলিতে মিশিতে তাঁহার স্বাধীনতা বিলুপ্ত হইয়াছিল। আরও হইয়াছিল, তাঁহার বিস্তৃত জমিদারী স্বরাজের অধীন। করাদায় প্রভৃতি জাতীয় সভা হইতে হইত, তিনি মাসিক বৃত্তি প্রাপ্ত হইতেন,—অপরাংশ জাতীয় ধনভাণ্ডারে গৃহীত ও রক্ষিত হইত।

কৃষ্ণগোবিন্দবাবুর হৃদয়ে স্বদেশদ্রোহীর—অত্যাচারীর মহাপাতক প্রবেশ করিয়াছে, তিনি এখন আর প্রশান্তচেতা, ধর্ম্ম ও নৈতিকতাপূর্ণহৃদয় কৃষ্ণগোবিন্দ নাই। এখন অশান্তি-অনল-দগ্ধ উন্মাদ বলিলেও বলা যাইতে পারে।

বিশেষ কার্য্য জন্য অজিতনাথ একদিন কৃষ্ণগোবিন্দবাবুর বাড়ীতে গিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। দেখিলেন, দেবালয় পাপ-কলুষিত হইয়া শ্মশানে পরিণত হইয়াছে,—কৃষ্ণগোবিন্দ সেই শ্মশানের পিশাচ রূপে বিচরণ করিতেছে। শান্তি, পবিত্রতা, করুণা, স্নেহ, ধর্ম্মশীলতা প্রভৃতি সদ্গুণ নিচয় সে হৃদয়ে আর নাই। বুঝি ধর্ম্মাধর্ম্ম কোন বৃত্তিরই স্ফুরণ আর হয় না। কেবল অনুতাপ আর অশান্তির অনলে সে হৃদয় দিবানিশি দহ্যমান।

কৃষ্ণগোবিন্দবাবুর নিকটে যে কার্য্যের জন্য আসিয়াছিলেন, সে কার্য্য সমাধা করিয়া অজিতনাথ ফিরিতেছিলেন, এমন সময় এক দাসী আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল,এবং বলিল,—"কর্ত্তামা ঠাকুরুণ একবার আপনার সাক্ষাৎ প্রার্থনা করেন।"

অজিতনাথ দাসীর সহিত অন্দরে গমন করিলেন।

কর্ত্রীঠাকুরাণী দ্বিতীয় প্রকোষ্ঠের পূর্ব্বদিকের রকের উপরে বসিয়াছিলেন। শ্বেত মর্ম্মর প্রস্তরে সে রক বাঁধা,—অজিতনাথ রকের নিকটে প্রাঙ্গণে গিয়া দাঁড়াইলেন।

কর্ত্রীঠাকুরাণী বলিলেন,—"আপনি আমায় বোধহয় চিনিতে পারেন ?"

অজিতনাথ বিনয়-নম্রস্বরে বলিলেন,—"আপনি এতদ্দেশের মাতৃস্বরূপা। দয়া-ধর্ম্ম আপনার ভূষণ,—যে আপনাকে নাও দেখিয়াছে, সেও আপনার নাম শুনিয়াছে। আমি আপনাকে চিনি।"

ক। আপনি ধর্ম্মবলে এখন এদেশের রাজা—আপনার নিকটে আমার কিছু বলিবার আছে।

অ। না না, আমি এদেশের রাজা নহি, সেবক মাত্র। ব্রহ্মচর্য্যের উপরে স্বরাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

ক। তোমার নিকটে আমার কিছু প্রার্থনা আছে।

অ। কি প্রার্থনা মা ?

ক। আমার ধর্ম্মের সংসারে অধর্ম্ম প্রকাশ পাইয়াছে,—তাই আমাদের আজি এত দুর্দ্দশা। কিসে আবার আমরা যেরূপ ছিলাম, তেমন হইতে পারি ?

অ। এতদবস্থায় আপনার কি বড়ই কষ্ট হইতেছে ? স্বাধীনতার জন্য আপনি কি উদ্বিগ্ন হইয়াছেন ?

ক। না মা অজিতনাথ, আমাদের কর্ত্তার এখন যেরূপ হৃদয়-চাঞ্চল্য তাহাতে এখন অধীনতারই প্রয়োজন। মানুষের হৃদয়ে ধর্ম্মভাব না থাকিলে তাহার স্বাধীনতা দেশের সর্ব্বনাশকারী। তাই ভগবান্ পাপের সংসারে—পাপের দেশে স্বাধীনতার

পরিবর্ত্তে অধীনতা দিয়া থাকেন। আমি রমণী হইলেও তাহা জানি। যাহাতে আমার সংসারে পুণ্য আইসে, তাহাই করুন। সংসারের যিনি অধীশ্বর, তিনি পুণ্যশীল হইলেই সংসার পুণ্য-প্রভায় আলোকিত হয়।

এই সময় তথায় মহামায়া আসিয়া উপস্থিত হইল। রবি-কর-ক্লিষ্টা কুমুদিনীর স্থায়, সে ক্ষুদ্র কুসুমে ম্লান কান্তি সমাচ্ছন্ন। মহামায়া আসিয়া অজিতনাথের পায়ের কাছে এক প্রণাম করিল। তারপরে বলিল,—"ঠাকুর যদি আসিয়াছ, তবে দয়া কর; পাপীকে ত্রাণ করিবার জন্যই তোমাদের জন্ম। আমি তর্কালঙ্কার ঠাকুরের মুখে শুনিয়াছিলাম, এক আত্মার উন্নতি জন্য অপর আত্মার প্রয়োজন। মোহের ছলনে—পাপের পীড়নে আমাদের সংসারে অশান্তির দাবানল জ্বলিয়াছে।"

কর্ত্রীঠাকুরাণীর চক্ষুকোণে জল আসিল। তিনি বলিলেন,—"বাবা, আমার জামাতার দুর্দ্দশা একবার স্বচক্ষে দেখিয়া যাও। মদ খাইয়া খাইয়া তাঁহার যকৃতে বেদনা ধরিয়াছে, যখন বেদনায় কাতর হন, তখন তাঁহার অবস্থা দেখিলে পাষাণও গলিয়া যায়। কিন্তু মদের আসক্তি যায় নাই—একটু সুস্থ হইলেই আগে সে বিষ পান করেন। কোন জ্ঞান নাই, বিবেক বুদ্ধি নাই। বোধ হয় তিনি আর অধিক দিন বাঁচিবেন না। ইহ জীবনে এই ঘটিল, পর জীবনের জন্য মহামায়া বড় ব্যস্ত হইয়াছে। মহামায়া বলে, রমণী স্বামীর চির সহচারিণী। সেখানে গিয়া স্বামীর কষ্ট কি প্রকারে দেখিতে পারিবে?"

অজিতনাথেরও চক্ষে জল আসিল। তিনি বলিলেন,—"মা, স্বামীকে নরকের পথ হইতে ফিরাইয়া আনিবার জন্যই মহাশক্তি

রমণীর সৃষ্টি। কেবল মহামায়ার পুণ্যেই তোমার জামাতার নরক বারণ হইবে।”

মহামায়া বলিল,—“কর্ম্মফল কোথায় যাবে ঠাকুর?”

অজিতনাথ নিস্তব্ধে রহিলেন। ঠিক এই সময়ে তথায় নীরদা আসিয়া উপস্থিত হইল।

নীরদার কেশরাশি লুলিত, চক্ষুকোণে প্রতিহিংসার অনল বিস্ফুরিত। অধরে ব্যঙ্গের বিষময় হাসি। নীরদা আসিয়া অজিতনাথের সম্মুখে দাঁড়াইল। সে মূর্ত্তি দেখিয়া অজিতনাথ চমকিয়া উঠিলেন।

নীরদা ব্যঙ্গের হাসি হাসিয়া বলিল,—“কি ঠাকুর, তুমি নাকি দেশের রাজা হইয়াছ?”

অজিতনাথ বলিলেন,—“আমি আবার কিসের রাজা? সেবক সম্প্রদায়ের একজন হীনশক্তি সভ্যমাত্র।”

নী। তোমার পরিণাম জানিয়াছি।

অ। কাহার নিকটে কি জানিয়াছ নীরদা?

নী। কোন দেবতার নিকটে।

অজিতনাথ হাসিলেন। বলিলেন,—“দেবতার সঙ্গে তোমার সাক্ষাৎ হয় না কি?”

নীরদা ফোপাইয়া উঠিল। কি বলিতে যাইতেছিল, কর্ত্রী বাধা দিয়া বলিলেন,—“দিদিঠাকুরাণী আপনি চুপ করুন। আমাদের কিছু কথা আছে।”

“তবে তাহাই হউক।”—এই কথা বলিয়া নীরদা চলিয়া যাইতেছিল। কিন্তু আবার কি ভাবিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইয়া কথোপকথন শুনিতে লাগিল।

অজিতনাথ কর্ত্রীঠাকুরাণীকে বলিলেন,—"আমি আর এক দিন আসিব। আর একদিন আসিয়া আপনার জামাতাকে দেখিব, এবং যাহাতে তিনি পুণ্য পথে গমন করেন, তাহার চেষ্টা করিব। আর কর্ত্তার জন্য আমরা সকলেই চেষ্টা করিতেছি, যাহাতে তিনি স্বদেশসেবায় ব্রতী হইয়া কৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করেন। তিনি উজ্জ্বল প্রতিভা বিশিষ্ট। সে প্রতিভা দেশের কাজে লাগিলে অনেক মঙ্গল হইবে।"

অজিতনাথ বিদায় হইলেন।

মহামায়া বলিল,—"মা, পুণ্যের কেমন প্রতাপ! পুণ্যের কেমন স্নিগ্ধ শান্তি!—একজন পুণ্যবানের পদস্পর্শে বাড়ীখানি যেন একটু শান্তির হিল্লোলে পবিত্রীকৃত হইয়াছে।"

কর্ত্রী বলিলেন,—"যদি দয়া করিয়া আবার আসেন। সৎসঙ্গে অসাধুও সাধু হয়।"

নীরদা প্রতিহিংসার হাসি হাসিল। সে মনে মনে বলিল,—"অজিতনাথ প্রাণ দিয়া তোমায় ভালবাসিয়াছিলাম। তোমার চরণে লুটাইয়া পড়িয়াছিলাম, তুমি চরণে দলিত করিয়াছ—আমাকে অবমাননা করিয়া পায়ে জড়ান কাঁটার মত দূরে ফেলিয়াছ; ভাল, আমি দেখিব—তুমি কেমন মানুষ। এর প্রতিহিংসা লইব—তবে ছাড়িব।

এখন একবার সেই পুরুষটির দেখা পাই না। যিনি এক দিন বাগানে একখানি রক্তাক্ত ছোরা আমার হাতে দিয়া অজিত-নাথকে সংহার করিতে বলিয়াছিলেন,—"সে ছোরা এখন পাই না? তিনি কে? তিনি কি প্রেত-যোনি। না, সেটা ভবিষ্যতের একটা ছায়াচিহ্ন!"

নীরদা সেখানে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া অনেকক্ষণ কি ভাবিল। তারপরে যে গৃহে মহামায়ার স্বামী ছিল, সেই গৃহে চলিয়া গেল।

সপ্তচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

এক সজ্জিত প্রকোষ্ঠ মধ্যে বসিয়া মহামায়ার স্বামী মোহনলাল সুরাপান করিতেছিলেন। তখনও পান-মাত্রা সীমাহারা হয় নাই.—তখনও স্বাভাবিক জ্ঞান সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয় নাই,—তখনও শয্যার উপরে চলিতে পড়িতে হয় নাই।

নীরদা সেই শয্যার অদূরে দাঁড়াইয়া বলিল—"মোহনলাল, আমি তোমাকে একটী নূতন খবর দিতে আসিয়াছি।"

মোহনলাল সুরাপাত্র দক্ষিণ হস্তে ধরিয়া মদ-বিহ্বল আঁখিদ্বয় নীরদার মুখের উপর সংস্থাপন করিয়া জড়িতস্বরে বলিল,—"কি খবর যাদুমণি?"

নীরদা বলিল,—"যাদুমণি বলিয়া আমায় ব্যঙ্গ করিলে?"

মো। দোহাই বাবা দিদিমণি,—দিদিমণি বলিতে যাদুমণি বেরিয়ে পড়েছে। রাগ করোনা বাবা দিদিমণি—শাস্ত্রেইত আছে,—"মাতালস্য নানা ক্রিয়া, কখন ভাল, কখন না না না না।" দিদিমণি, তুমি না কি ভাল গাইতে পার?

নী। আমি তোমার শ্বশুরের গুরুকন্যা, স্মরণ আছে কি?

মো। তা স্মরণ না থাক্‌লে কি এতদিন গান না শুনে ছাড়তুম,—বাবা এদেশে এমন মেয়ে মানুষ নেই, যার গান মোহনলাল শর্ম্মা না শুনেছেন।

নী। কিন্তু এতদিনে তার ফল ধ'রেছে।

মো। কি ফল বাবা? দাঁড়াও দিদিমণি, হাতের মালটুকু কণ্ঠায় ঢেলে দিই।

মোহনলাল হস্তস্থিত সুরাটুকু উদরস্থ করিয়া, সুরাপাত্রটি সম্মুখস্থ বোতলের পার্শ্বে রক্ষা করিয়া বলিলেন—"কি কথা দিদিমণি? এ আসরে বাবা কমলালেবু মন্দ নয়।"

নী। বাজে কথায় সময় নষ্ট করিও না। যদি শুনিতে ইচ্ছা হয় শুনিয়া নাও। তোমার মহামায়া অন্যে প্রাণ ঢালিয়াছে।

মো। বল কি দিদিমণি?

নী। নীরদা মিথ্যা বলেনা।

মো। মহামায়া কাহাকে ভাল বাসিয়াছে?

নী। ব্রহ্মচারী অজিতনাথকে।

মো। অজিতনাথ,—শালা সকল সুখের বিনাশক। তাহার সাক্ষাৎ কোথায় পায়?

নী। কেন তাহাকে সংবাদ দিয়া এই বাড়ীতে আনা হয়,—আজও সে আসিয়াছিল,—তোমার গৃহিণী এখন তাঁহার অঙ্ক-শোভা বর্দ্ধন করিতেছেন,—বোধ হয়, এখনও ব্রহ্মচারী এ বাড়ীতে আছেন।

মোহনলালের চক্ষু বিস্ফারিত হইল। বলিলেন'—"তারপর?"

নীরদা—সর্ব্বনাশী নীরদা ভ্রুকুটী করিয়া, ব্যঙ্গের হাসি হাসিয়া বলিল,—"তারপর আবার কি, তা জানি না। তুমি এখন নিশ্চিন্ত মনে মদ খাও, আমি চলিলাম। যদি সংবাদ দিয়া দোষ করিয়া থাকি, ক্ষমা করিও। তবে এক অনুরোধ

আমি তোমার হিতার্থী হইয়াই এসকল বলিয়াছি—আমার নাম করিও না। নাম করিলে এ বাড়ী হইতে আমার অন্ন উঠিবে।"

নীরদা চলিয়া যাইতেছিল। ক্ষুধার্ত্ত ব্যাঘ্রের ন্যায় লম্ফ দিয়া উঠিয়া মোহনলাল বলিলেন—"মহামায়া যে অজিতনাথে অনুরক্ত, তাহার প্রমাণ ?"

ফিরিয়া দাঁড়াইয়া নীরদা বলিল,—"অনুসন্ধান করিলে প্রমাণ পাইবে।"

মোহনলাল পরুষস্বরে বলিল,—"যদি না পাই ?"

নী। আমি যুগলমূর্ত্তি দেখাইয়া দিব।

মো। কবে ?

নী। যে দিন ব্রহ্মচারীর পুনরাগমন হবে ? কিন্তু তুমি একটু সাবধান থাকিও—তুমি জানিতে পারিয়াছ, ইহার মধ্যে মহামায়া যেন বুঝিতে না পারে।

মোহনলাল বসিয়া পড়িল। নীরদা চলিয়া গেল। যাইতে যাইতে মনে মনে বলিল—"মহামায়া, সে দিন পুকুর পাড়ে যখন অজিতনাথ অপমানে বিষ-ছুরিতে আমার হৃদয় বিদীর্ণ করিয়া চলিয়া গেল—সেই দিন সেকথা কেবল তুমি শুনিয়াছিলে। তুমি সেকথা তোমার মাকে বলিয়াছ—দুই মায়ে ঝিয়ে আমাকে যৎপরোনাস্তি ব্যঙ্গ করিয়াছ, তারপরে মার কাছে বলিয়া দিয়া তিরস্কার খাওয়াইয়াছ—এই বার—এইবার তাহার প্রতিশোধ লইব। আর, অজিতনাথ ? অজিতনাথ আমাকে যেরূপে পদদলিত করিয়াছে—আমি তাহার প্রতিশোধ লইব—সেইরূপে তাহাকে পদদলিত করিব।"

নীরদা চলিয়া যাইবার অতি অল্পক্ষণ পরেই সে গৃহে মহামায়া আগমন করিল। মহামায়া বড় ম্লান—তাহার মুখে চোখে বিষাদের কালিমা মাখা।

মোহনলাল তখন আর একপাত্র সুরা উদরস্থ করিল মহামায়া বলিল—"এখনও কি ও ছাই খাওয়া শেষ হয় নাই?"

মোহনলাল কোন কথা কহিল না। মাহামায়া পুনরপি বলিল,—"খাবার খাবে কখন? ও খেলেত পেট ভরে না!"

মোহনলাল গম্ভীর স্বরে বলিলেন,—"আমার যখন ইচ্ছা তখন খাব।"

মহামায়া দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিল—"তা খাবে, খেও, কিন্তু দিন দিন তোমার শরীর কি হইতেছে, তা ভাবনা। রোজ রোজ বলি, ও ছাই আর খেও না। কিছুতেই আমার কথা শুনিবে না। ওরই জন্যে কাল ব্যাধি জন্মিয়া গিয়াছে—মরণও চুলে ধরিয়া বসিয়াছে, এখনও কি হুঁস্ হবে না?"

মোহনলাল মস্তক সঞ্চালন করিয়া বলিল,—"হবে হবে, আর বড় বেশী দিন নয়।"

মহামায়া দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বড় কষ্টে বলিল—"আমিও বুঝ্‌তে পেরেছি, আর বড় বেশী দিন নয়।"

মোহনলাল মদমত্ত জড়িত স্বরে জিজ্ঞাসা করিল—"আজ নাকি তোমাদের বাড়ী ব্রহ্মচারী অজিতনাথ এসেছিল?"

মহামায়া বলিল—"হাঁ, আসিয়াছিলেন।"

মো। আছেন না গিয়াছেন।

ম। একটু আগে গিয়াছেন।

মো। কি জন্য আগমন হইয়াছিল?

ম। ঠিক জানি না—বোধহয় বাবার কাছে কোন প্রয়োজন ছিল।

মো। মিছে কথা,—সেখানে বুজ্‌রুকি খাটে না।

ম। তবে মিছে কথা। কিন্তু তিনি পুণ্যের অবতার।

মো। চুপ কর—কে গান গাহিতেছে, শুনি।

মহামায়াও চুপ করিল। স্বর গম্ভীর—মর্ম্মস্পর্শী। যেন অতি নিকটে সে গান গীত হইতেছিল। মহামায়া অনেক চেষ্টা করিয়াও গলার স্বরে গায়কের পরিচয় জানিতে পারিল না। তবে কণ্ঠ স্ত্রীলোকের,—তাহা বোঝা গেল। গাহিতেছিল ;—

দিগন্ত মগ্ন করাল মেঘে প্রবল ঝঞ্ঝা বয়,
বিকট তাণ্ডবে তাথেই তাথেই দামিনী দমকি যায়।
ঘুমালু তারকা নিশীথ গগনে,
আচ্ছন্ন চন্দ্রমা রক্ত-আবরণে,
বিশ্ব জুড়িয়া ভীষণ আঁধার অশিব সঙ্গীত গায়।
নরমুণ্ডমালা পিশাচে গাঁথিছে,
অট্ট অট্ট হাসি দানবে হাসিছে,
ছিন্ন কন্থা উড়ায়ে প্রেতিনী শ্মশান-প্রান্তরে ধায়॥

গানের সুরে যেন কোন্ রক্ত-রাগিণীতে গীত হইতেছিল। ভয়-বিস্ময় যেন সে গানের অস্থি-মজ্জায় সংগ্রথিত। যাহার কণ্ঠ হইতে সে গান গীত হইতেছিল, সে যেন কোন্ অমৃত্ত অশিব দেবতা।

মহামায়া স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল,—"ও কি গান? ও গান কে গাহিতেছে?"

মোহনলাল বলিল,—"আমি কি জানি যাদু? বোধহয় ব্রহ্মচারী হইবে। শুনিয়াছি, সে বহুরূপী। কত ভেল্কী সে জানে—ঐ যে ময়রাপিসি বলিত—'কত ভেল্কী জান যাদু, কত ভেল্কী জান;—ইসারায় মজাও কুল—প্রাণ টেনে আন।'—তা ঠিক।"

মহামায়া অধিকতর কাতরে—অধিকতর করুণস্বরে বলিল,—"স্বামী, প্রভু! ও কি গান শুনিলাম? আমার বড় ভয় হইয়াছে—তুমি উহার কারণ বল। তোমাকে লইয়া আমার অধিকতর ভয়। সর্ব্বদাই তোমাকে হারাই হারাই মনে হয়। ও ত ভাল গান নয়,—বোধ হইতেছে যেন কোনও অশরীরী দেবতা ঐ অশুভ গানে আমাদের অশুভ বার্ত্তা শুনাইয়া গেলেন।"

সহসা মহামায়া শুনিতে পাইল, তাহারা যে কক্ষে রহিয়াছে. তাহার ছাদের উপর যেন কোনও বলবান্ ব্যক্তি জোরে জোরে পা ফেলিয়া চলিয়া যাইতেছে। মহামায়া আর থাকিতে পারিল না,—ভয়ে তাহার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিয়া উঠিল,—সে ছুটিয়া স্বামীর বক্ষে মুখ লুকাইল। মোহনলাল তাহাকে ফেলিয়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

মহামায়া সরিয়া গিয়া বলিল,—"আমাকে কি তুমি দেখিতে পার না?"

মোহনলাল মদ-স্খলিত বচনে বলিল,—"ওমা, তা আর পারি না। তোমার বাপের অন্নে আমি প্রতিপালিত, তুমি যা করিবে—আমার তাই শোভা পাবে। তুমি আমার মাথার মণি—শিরোধার্য্য।"

ম। আমায় ব্যঙ্গ করিতেছ?

মো। ও মা, তোমায় ব্যঙ্গ করিতে পারি—ব্যঙ্গ করিতে হয়, তোমার মাকে ডাকিব, নয় তোমার বাপকে! স্ত্রীকে আবার ঠাট্টা করে কে? প্রয়োজন বইলে শ্বশুর-শ্বাশুড়ীকেই ঠাট্টা করিতে হয়।

মহামায়া স্বামীর এমন কথা অনেক দিন শুনিয়াছে। ইহা লইয়া স্বামীর সঙ্গে তাহার অনেক দিন ঝগড়া-কলহ হইয়াছে। কিন্তু কেন আজি মহামায়া স্বামীর উপরে রাগ করিতে পারিল না! অন্তরবেদনা করুণাকারে স্বামীর উপরে পতিত হইল। কেন তাহা মহামায়া জানে না, কিন্তু সেই নেপথ্য সঙ্গীতে তাহার মনে হইতেছিল—ঐ অশিব-সঙ্গীত কোন অশিব ঘটনার পূর্ব্ব-গাথা। হয়ত তাহার স্বামীর দিন ঘনাইয়া আসিয়াছে—হয়ত কোন নরকের দূত তাহার স্বামীর কৃত কর্ম্মের—মহাপাতক-নিচয়ের ফলদানোন্মুখ হইয়া লইতে আসিয়াছে। হায়, তাহার স্বামীর নরক-যন্ত্রণা নিবারণ করিতে কি কেহ নাই? এক আত্মাকে রক্ষা করিতে—উন্নত করিতে অপর আত্মার প্রয়োজন। মহামায়ার যদি কোন জন্মার্জ্জিত কোন পুণ্য থাকে, তা দিয়া কি স্বামীর আত্মাকে উদ্ধার করা যায় না!

আর কিছু দিন—আর কিছু দিন তাহার স্বামী জীবিত থাকিলে অজিতনাথের চরণ ধরিয়া তাহার স্বামীর মহাপাতকের পায়শ্চিত্তের আয়োজন করিত। তিনি নিষ্পাপ ব্রহ্মচারী—যে কামিনীর আসক্তির প্রসারিত বাহু সরাইয়া ব্রহ্মচর্য্য রক্ষা করিতে পারে—আত্মব্রত অটুট রাখিতে পারে, এজগতে তাহার অসাধ্য কি আছে? সে মরজগতের পুণ্য দেবতা।

ঠিক এই সময় মোহনলালের যকৃতের বেদনা ধরিল।

মোহনলাল সে বেদনায় কাতর হইয়া শয্যায় ঢলিয়া পড়িলেন; কাতরে চীৎকার করিতে লাগিলেন,—মহামায়া বেদনার উপরে চিকিৎসক দত্ত একটা মালিস্ ডলিয়া ডলিয়া দিতে লাগিল।

অষ্টচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

পৌষমাসের গভীর নিশীথ সময়। চারিদিক্ নিস্তব্ধ,—কুয়াসায় সমস্ত জগৎ সমাচ্ছন্ন,—যেন হাওয়ার কাপড়ে প্রকৃতি সতী আপন অঙ্গ সমাচ্ছন করিয়া কোন গভীর অধ্যাত্মতত্ত্বের ধ্যানে নিমগ্ন। দূরে দীঘি-পুষ্করিণী গুলি কুয়াসা-জাল-জড়িত-আবিল চন্দ্রকিরণ মাখিয়া কোন ইন্দ্রজাল-তত্ত্বের সাধনা করিতে বসিয়াছে। অদূরে বহু পুরাতন—কত অতীতের স্মৃতি মাখান অশ্বত্থতরু দাঁড়াইয়া ঊর্দ্ধ মুখে কত দীর্ঘকালের মানবীলীলার স্মরণ করিতেছে।

বড় শীত,—স্বন্ স্বন্ করিয়া এক একবার উত্তরে হাওয়া বহিয়া, কুয়াসা-রাশিকে ভেদ করত হতাশ-বিহ্বল মানবের মত কোথায় চলিয়া যাইতেছে।

সেই দীর্ঘ, বিস্তৃত, প্রাচীন অশ্বত্থতরুতলের কুয়াসা রাশিকে আন্দোলিত বিঘূর্ণিত করিয়া একটা ঘূর্ণীবায়ু মণ্ডল পাকাইয়া দাঁড়াইল,—বাষ্পরাশি কয়েক বার আন্দোলিত বিক্ষোভিত ও উচ্ছ্বাসিত হইল,—আর একবার ঘূর্ণীবায়ু তাহার উপরে বহিয়া গেল। সেই বায়ু-মণ্ডল নিস্তব্ধ হইলে, হঠাৎ একটু শুভ্র ধূম আবির্ভূত হইল, এবং দেখিতে দেখিতে সে ধূমরাশি মানবমূর্ত্তিতে

পরিণত হইল। সে মানবের দীর্ঘকায়, দীর্ঘ বাহু, দীর্ঘ উরু, দীর্ঘ ললাট, দীর্ঘায়তন চক্ষু।

তাহার দীর্ঘ বাহুযুগল বিস্ফারিত ও আন্দোলিত হইল, দানবী-দীপ্তিপূর্ণ অনল-চক্ষু বিঘূর্ণিত হইল;—জলন্ত-গম্ভীর-মর্ম্মন্তুদ স্বরে—কাতর উন্মাদ কণ্ঠে ডাকিল—"রমণি! প্রাণের রক্ত দিয়া পুরুষ তোমার উপাসনা করে। আর তুমি? তুমি তোমার অবিশ্বাসের তীক্ষ্ণ ছুরিকাঘাতে তাহার বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া থাক! আমার সর্ব্বনাশ করিয়াছ;—আমিও তাহার প্রতিশোধ লইব। প্রতিহিংসা—প্রতিহিংসার আগুনে হৃদয় জ্বলিয়া যাই-তেছে। জীবনে মরণে, মরণে জীবনে এ জ্বালা সহ্য করিতেছি—এ জ্বালার চেয়ে শত নরকের জ্বালা সহ্য করা যায়। প্রতিহিংসা—প্রতিহিংসা—প্রতিহিংসার আগুন নির্ব্বাণ না করিয়া যাইতে পারিব না। যে প্রকারেই পারি, আমার প্রতিহিংসার আগুনে তোমাদিগকে পোড়াইয়া, আমার জ্বালার মত জ্বালা তোমাদের প্রাণে ঢালিয়া দিয়া তবে আমি উর্দ্ধরাজ্যে গমন করিব।"

সেই মূর্ত্তির উজ্জ্বল-তীব্র অনলচক্ষু আরও জ্বলিয়া উঠিল। তাহার ভগ্ন জীর্ণ দীর্ণ প্রাণের প্রতিহিংসার আগুন যেন শতমুখ সৃজন করিয়া, তাহার ঝলকে কাহাকে দগ্ধ করিতে চেষ্টা করিল। সে তাহার বাহুযুগল পুনরায় বিস্ফারিত আন্দোলিত করিয়া বলিল—এস তোমরা—একা আসিবে কেন? উভয়ে এস,—এ আগুনে তোমাদিগকে দগ্ধ করি। এখনও সেই পাপাত্মার অস্ত্রের ক্ষতদাহ অনুভব করিতেছি। প্রতিহিংসা—প্রতিহিংসা! যতক্ষণ প্রতিহিংসার সাধন করিতে না পারিতেছি, ততক্ষণ আমার উর্দ্ধগতি হইতেছে না। এখন কেবল ঐ আকর্ষণ

প্রতিহিংসা—প্রতিহিংসা! কিন্তু কে এমন সুহৃদ্ আছে—ব্রহ্মচর্য্য প্রাচীরটা একবার কাটিয়া দেয়। কত দীর্ঘ দিবস—পিছু পিছু ছুটিতেছি—কিন্তু ব্রহ্মচর্য্যের লৌহ-প্রাচীরে এ বুকের আগুন তাহার কাছে পঁহুছিতে পারিতেছে না।”

নিশীথ ইন্দ্রজাল ঘুচাইয়া গেল,—আকাশের শূন্যকক্ষে সেই উন্মাদ্-কাতর-কণ্ঠস্বর ডুবিয়া গেল। আবিল-চন্দ্র-কর-মাখান কুয়াসারাশি ঘূর্ণীবায়ুতে মণ্ডলে মণ্ডলে সমস্ত গাছের তলে তলে আচ্ছন্ন হইল।

উনপঞ্চাশৎ পরিচ্ছেদ।

অশরীরির সেই অদ্ভুত কাহিনী একজন শুনিতে পাইয়াছিল,—অশরীরির সেই শরীরপরিগ্রহ একজনে দেখিয়াছিল। যে দেখিয়াছিল, সে নীরদা।

নীরদা তখন কৃষ্ণগোবিন্দবাবুর বাড়ীর অন্তঃপুরোদ্যানে বকুল-কুঞ্জ বীথিকায় বসিয়া কি প্রকারে অপমানের প্রতিশোধ লইবে,—কি প্রকারে ব্যর্থ প্রণয়ের বিদীর্ণ ব্যথা ঘুচাইবে, কি প্রকারে অজিতনাথের মস্তক তাঁহার চরণতলে লুঠাইয়া লইতে পারিবে, তাহাই ভাবিতেছিল। সে এখন প্রায় রাত্রিতে নিদ্রা যাইতে পারে না,—নিশি জাগিয়া শয্যায় বসিয়া কেবলই ভাবে,—যে দিন ভাবনা অতিরিক্ত হয়—কক্ষতল ভাল লাগে না,—সেদিন উদ্যানে আসিয়া বসে। এ চিন্তা—এ অনলচিন্তা সে পরিত্যাগ করিবার ইচ্ছা করিয়াছে—অজিতনাথের অনিষ্টচিন্তা

হৃদয় হইতে দূর করিবার বাসনা করিয়াছে—কিন্তু পারে নাই। কেন পারে নাই, সে তাহা বুঝিতেও পারে নাই। এমন দুর্দ্দমনীয় বাসনা সময় সময় মানব-মানসে জাগিয়া বসে, যাহা সে ইচ্ছা করিয়াও দমন করিতে পারে না। বৈজ্ঞানিক বলেন, সে বাসনা তাহার জন্মান্তরীয় সংস্কার হইতে হয়।

নীরদা যখন অজিতনাথের অনিষ্টচিন্তায় নিমগ্ন ছিল, তখনই অদূরস্থিত অশ্বত্থ তরুতলে আভাসিকতনুর আবির্ভাব হইয়াছিল। আবিল জ্যোৎস্নায় নীরদা সে মূর্ত্তি দেখিয়াছিল,—সে দেখিয়া চিনিয়াছিল, যে মূর্ত্তি একদিন এই উদ্যানে তাহাকে রক্ত-ছোরা দিয়া অজিতনাথের প্রাণসংহার করিতে বলিয়াছিল,—এই সেই মূর্ত্তি। নীরদা বুঝিল,—এ মূর্ত্তি প্রেতযোনি। তাহার ভয় হইল,—উঠিয়া ধীরে ধীরে বাটীর মধ্যে চলিয়া গেল।

সে যখন দ্বিতীয় মহলার প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইল, তখন সেখানে কৃষ্ণগোবিন্দবাবু দণ্ডায়মান ছিলেন। তাঁহার মুখম্লান—চক্ষু কোটর প্রবিষ্ট—দেহভাব ঋজু।

সহসা নীরদাকে দেখিয়া কৃষ্ণগোবিন্দবাবু চমকিয়া উঠিলেন, তারপরে চিনিতে পারিয়া বলিলেন,—"তুমি? দিদিঠাকুরাণী এত রাত্রে তুমি কোথায় গিয়াছিলে?"

নীরদা থতমত খাইল। বলিল,—"বড় অসুখে ক্লান্ত হইয়া উদ্যানে বেড়াইতে গিয়াছিলাম।"

কৃ। কতক্ষণ গিয়াছ?

নী। বড় অধিক্ষণ নয়।

কৃ। সত্যকথা বল—কোন অদ্ভুত বিষয় দর্শন করিয়াছ কি?

নী। হাঁ—অতি অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়াছি। আপনিও কি তাহা দেখিয়াছেন?

কৃ। দেখিয়াছি,—তুমি কি দেখিয়াছ দিদিঠাকুরাণী স্পষ্ট করিয়া বল। কিছু গোপন করিও না,—যাহা দেখিয়াছ, যাহা শুনিয়াছ,—সত্য বল।

নী। আমি যাহা দেখিয়াছি, আমি যাহা শুনিয়াছি,—তাহা অদ্ভুত এখনও ভয়ে আমার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতেছে। বাটীসংলগ্ন উদ্যানের উত্তরভাগে যে দীর্ঘ অশ্বত্থ গাছ আছে,—

ব্যস্তভাবে কৃষ্ণগোবিন্দবাবু বলিলেন—"তারপর?"

নী। সেই গাছের তলায় কুহেলিকারাশির মধ্য হইতে এক মনুষ্যমূর্ত্তির সৃষ্টি হইল,—

কৃষ্ণগোবিন্দবাবু সমধিক আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া অধিকতর ব্যস্তভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"সে মূর্ত্তি কি স্ত্রীলোকের?"

নী। না—সে মূর্ত্তি এক দীর্ঘাকার পুরুষের।

কৃ। কি ভয়াবহ ব্যাপার! তারপরে?

নী। তারপরে সে মূর্ত্তি আবির্ভূত হইয়া, তাহার বাহুদ্বয় আন্দোলন করিয়া অনেক কথা বলিল। সব আমার মনে নাই। তাহার চক্ষুর দীপ্তি আগুনের মত—গলার স্বর মরণ-কাহিনীর মত। ভয়ে আমি সব কথা শুনিতে পাই নাই;—সব কথা বুঝিতে পারি নাই।

কৃ। বড় রহস্য—বড় অভূতপূর্ব্ব ঘটনা। ঘটনার মূলে কি আছে কে বলিতে পারে। যা কিছু মনে আছে তাই বল।

নী। দুই চারিটা মনে আছে। সে মূর্ত্তি বলিয়াছিল—"রমণী,—প্রাণের রক্ত দিয়া পুরুষ তোমার উপাসনা করে। আর

তুমি? তুমি অবিশ্বাসের তীক্ষ্ণ ছুরিকা দিয়া তাহার বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া থাক।—আমার সর্ব্বনাশ করিয়াছ—আমিও তাহার প্রতিশোধ লইব—প্রতিহিংসা সাধন না করিয়া ঊর্দ্ধরাজ্য যাইতে পারিব না।—আর পুনঃপুনঃ প্রতিহিংসা প্রতিহিংসা বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল।"

কৃ। উঃ, কি ভয়ঙ্কর দিদিঠাকুরাণী আরও বোধ হয় অনেক কথা বলিয়াছিল?

নী। হাঁ, অনেক কথা বলিয়াছিল। আগেইত বলিয়াছি, সব কথা আমার স্মরণ নাই।

কৃ। আরদুই একটা কথাও কি মনে নাই?

নী। না,—হাঁ, আর দুই একটা কথা মনে হইতেছে। সে একবার বলিতেছিল,—এখন কেবল ঐ এক আকর্ষণ! প্রতিহিংসা—প্রতিহিংসা! কিন্তু কে এমন সুহৃদ আছে,—ব্রহ্মচর্য্য-প্রাচীরটা একবার কাটিয়া দেয়। কত দীর্ঘ দিবস—পিছু পিছু ছুটিতেছি—কিন্তু ব্রহ্মচর্য্য লৌহ-প্রাচীরে এ বুকের আগুন তাহার কাছে পঁহুছিতে পারিতেছে না।"

কৃষ্ণগোবিন্দবাবু থর থর কাঁপিতেছিলেন। সেখানে বসিয়া পড়িলেন। বলিলেন,—"আর বলিতে হইবে না দিদিঠাকুরাণী—আমার কর্ণ বধির হইয়া গিয়াছে। আপনি চলিয়া যান।"

নীরদা চলিয়া গেল না। অতি করুণকণ্ঠে বলিল,—"আমি যদিও রমণী—যদিও সৎপরামর্শ দানে সম্পূর্ণ অপারগ—তথাপি আপনাদের গুরুদেবের কন্যা। পিতৃগুণ সন্তানে কিছু না কিছু সংক্রমিত হয়। আপনার গুরুদেব দেশবিখ্যাত পণ্ডিত ও প্রতিভাশালী ছিলেন,—আমি বুঝিতে পারিতেছি, আপনি

কেবল ঐ কথাতে এত ভীত হন নাই,—ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী আরও কোন কারণ আছে—দয়া করিয়া যদি আমার নিকট তাহা বলেন, আমি আপনাকে এবিষয়ে অনেক বলিতে পারিব।"

কৃষ্ণগোবিন্দবাবু সে কথার কোন উত্তর না করিয়া উদ্ভ্রান্ত-ভাবে চলিয়া গেলেন। নীরদাও তাহার নির্দ্দিষ্ট কক্ষে গমন করিল।

তখন সমস্ত বাড়ী নিদ্রিত ছিল, কেবল নীরদা ও কৃষ্ণগোবিন্দ বাবু স্বস্বকক্ষে বসিয়া চিন্তামগ্ন ছিলেন।

উভয়ের চিন্তা উভয় পথগামী। নীরদা ভাবিতেছিল,—"এত সেই মূর্ত্তি, যে মূর্ত্তি বাগানে আমার হাতে রক্তছোরা দিয়া অজিত-নাথের প্রাণ সংহার করিতে বলিয়াছিল,—আজিও বলিল, এমন সুহৃদ্ কে আছে, যে ব্রহ্মচর্য্যের প্রাচীর ভাঙ্গিয়া দিতে পারে,—প্রতিহিংসা,—বোধ হয় অজিতনাথের উপরেই তাহার প্রতি-হিংসা। কিন্তু আমার হাতে রক্তছোরা কেন দিয়াছিল? বোধ হয় আমি তাহার উপরে আসক্ত হইয়াছিলাম,—আমি আমার রূপের প্রলোভনে অজিতনাথের ব্রহ্মচর্য্য ভাঙ্গিয়া দিতে পারিব বলিয়া, ঐ প্রেতযোনি আশা করিয়াছিল,—কিন্তু বৃথা আশা! আমার রূপ তাহার চরণাঘাতে অপমানের আগুনে পুড়িয়া গিয়াছে। তাই জানিতে পারিয়া প্রেতমূর্ত্তি বোধ হয়, আর আমার কাছে আসে নাই! কিন্তু তবে কি তাহার পতন হইবে না? তবে অজিতনাথের দর্প ঘুচিবে না?"

তারপরে নীরদা মনে করিল,—"না না, অজিতনাথ মরিয়া কাজ নাই। মরিলে সব মিটিয়া যাইবে! আমি যে চক্রজাল বিস্তৃত করিয়াছি, সে জালে তাহাকে জড়াইয়া লইতে পারিলে,

তাহাকে দাসের দাস করিতে পারিব,—এই চরণতলে তাহার অহঙ্কার চূর্ণ করিয়া দিতে পারিব।"

কৃষ্ণগোবিন্দবাবুর চিন্তা অন্যমুখী, তাহার চিন্তা আত্মসংহারের মহান্ বিভীষিকা। কৃষ্ণগোবিন্দবাবু এই নিশীথ সময়ে কি কার্য্যে গৃহের বাহির হইয়াছিলেন,—তিনি জ্যোৎস্নালোকে স্পষ্ট দেখিতে পাইয়াছিলেন—দরোজার নিকটে তাঁহার মাতৃমূর্ত্তি। সে মূর্ত্তির কোন বৈলক্ষণ্য ঘটে নাই। মৃত্যুর কিছুদিন পূর্ব্বে নীরোগ দেহে তিনি যেমন ছিলেন,—এ মূর্ত্তি সেই মূর্ত্তি। তখন তিনি বিধবা।

কৃষ্ণগোবিন্দবাবুকে সে মূর্ত্তি অঙ্গুলি সঞ্চালনে ডাক দিয়াছিল। কৃষ্ণগোবিন্দবাবু সে আকর্ষণ অবহেলা করিতে পারেন নাই,—ভালমন্দ বিচার না করিয়া সেই মূর্ত্তির পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিয়াছিলেন। একদিন যেখানে বিশাখার নিকটে যে মূর্ত্তিকে দেখিয়াছিলেন—সেই স্থানে গিয়া সে মূর্ত্তি দাঁড়াইল। তিনিও দাঁড়াইলেন। তিনি মা বলিয়া ডাকিতে চাহিয়াছিলেন,—কিন্তু পারিলেন না। তাঁহার মুখ যেন রুদ্ধ—দেহ যেন অবসন্ন।

তাঁহার মাতৃ-মূর্ত্তি একবার তাঁহার দিকে চাহিয়া আকাশের দিকে অঙ্গুলী হেলন করিল—কৃষ্ণগোবিন্দবাবু সেদিকে চাহিলেন। যাহা দেখিলেন—তাহাতে তাঁহার হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। দেখিলেন,—বাষ্পময় মেঘের কোলে তাঁহার পিতা প্রেত দেহে অবস্থিত; পৃথিবীর অতি নিম্নতর স্তরে তাঁহার প্রাণের আকর্ষণ। সে আকর্ষণে তাঁহার উর্দ্ধগতি হইতেছে না। আর তাঁহার মাতাও সেই জন্য উর্দ্ধরাজ্যে গমন করিয়া জীবন-যজ্ঞের আহুতি দিতে পারিতেছেন না। তাঁহার মূর্ত্তি প্রশান্ত—আর পিতৃমূর্ত্তি ঘোর তমোমলিন—আকর্ষণাদি বিদগ্ধ। তাঁহার পিতা তাঁহার

দিকে করুণ নয়ন আকুল দৃষ্টিতে তাঁহার পানে চাহিতেছেন। সে দৃষ্টি যেন স্পষ্ট বলিতেছে,—"পুণ্যের কার্য্য কর—আমার প্রতিহিংসার পথ সুগম করিয়া দিয়া বংশধরের কার্য্য—সুপুত্রের কার্য্য কর।"

ধীরে ধীরে কৃষ্ণগোবিন্দ বাবুর মাতৃ-মূর্ত্তি অপসারিত হইল,—ধীরে ধীরে আকাশ-বাষ্প হইতে তাঁহার পিতৃ-মূর্ত্তিও সরিয়া গেল। কৃষ্ণগোবিন্দ বিস্ময় বিস্ফারিত নয়নে চারিদিকে চাহিলেন,—কোথাও কাহাকে দেখিতে পাইলেন না। উর্দ্ধ দৃষ্টে আকাশের দিকে চাহিলেন,—আকাশে যেন আগুণ লাগিয়াছে শত চেষ্টা-তেও সে আকাশ হইতে দৃষ্টি ফিরাইতে পারিলেন না। সে দৃষ্টি দাহজ্বরের প্রলাপ-কালে কোন কোন রোগীর চক্ষুতে দেখিতে পাওয়া যায়।

কতক্ষণ পরে তিনি একটু প্রকৃতিস্থ হইলেন। ভয়ে বিস্ময়ে হৃদয় কাঁপিতে ছিল,—ধীরে ধীরে গৃহে ফিরিলেন। তাহার মনে হইতেছিল,—এ সকল কি ভৌতিক কাণ্ড! যদিও ভৌতিক কাণ্ড হয়, তবে কি বিশাখা নির্দ্দোষ—বিশাখা যাহা বলিয়াছিল, তাহা কি সত্য? সত্য কি আমার পিতা মাতা প্রেতযোনি ধারণ করিয়া আছেন। সত্য সত্যই কি মানুষ মরিলে তাহার আত্মা পৃথিবীর তলে ঘুরিয়া বেড়ায়,—এ সকল কি সত্য, না কোন যাদুকরের যাদুবিদ্যা—শক্রর ষড়্‌যন্ত্র! এই সকল ভাবিতে ভাবিতে যখন তিনি বাটীর মধ্যে পঁহুছিলেন, তখন নীরদার সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইল। তিনি নীরদাকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন. নীরদা শয্যায় শুইয়া সুখী হইতে না পারিয়া অত্যল্পক্ষণ উদ্যানে গিয়াছিল। সে হয়ত তাঁহার মাতৃ-মূর্ত্তি দেখিতে পারে, এই

ভাবিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, কিন্তু সে যাহা বলিল—তাহা বলিবে বলিয়া তিনি আশা করেন নাই।

এখন শয্যার উপরে বসিয়া বিনিদ্র রজনী অতিবাহিত করিতে লাগিলেন,—আর ভাবনায় জর্জ্জরিত হইতেছিলেন। চিন্তায় তাঁহার সমস্ত হৃদয় সমাচ্ছন্ন হইয়াছিল।

তিনি ভাবিতেছিলেন—সত্যই কি প্রেতের উপদ্রবে বাড়ী পুরিয়াছে! সত্যই কি মৃত মানুষের আত্মা তাহার পার্থিব জীবনের অবশিষ্ট কার্য্য সাধন জন্য সূক্ষ্ম-শরীরে পৃথিবীতলে ঘুরিয়া বেড়ায়। বিশাখা যাহা দেখিয়াছিল,—যাহা বলিয়াছিল,—তখন তাহা বিশ্বাস করি নাই;—কিন্তু এখন ক্রমেই সে কথা বিশ্বাস হইয়া দাঁড়াইতেছে। বিশাখা বলিয়াছিল,—সে দিন ঐ মূর্ত্তি তাহাকে বলিয়াছিল, অজিতনাথের রক্তে প্রেততর্পণ হইবে—কিন্তু বিশাখার আত্মবলিদানে তাহা রক্ষা হইতে পারে। আজি আবার নীরদা বলিতেছে,—এক অপার্থিব বলিয়াছে, এমন সুহৃদ্ কে আছে যে, ব্রহ্মচর্য্যেরপ্রাচীর ভাঙ্গিয়া দিতে পারে—ব্রহ্মচর্য্যের প্রাচীর ভাঙ্গিয়া দিতে না পারিলে প্রতিহিংসার পরিতৃপ্তি হইতেছে না। এই সকল কথা একত্র করিলে, বুঝিতে পারা যায়—ঐ মূর্ত্তির প্রতিহিংসা অজিতনাথের উপরে। অজিতনাথ ব্রহ্মচারী—সম্ভবতঃ ব্রহ্মচর্য্যের পতন না হইলে—প্রতিহিংসা সাধনের উপায় নাই। হয়ত সে পতন বিশাখার মায়া হইতে পারে। কিন্তু এ সকল কি রহস্য—কি ব্যাপার! আমার এখনও জ্ঞান হইতেছে, এ সমুদায় ভেল্কি,—ইহার মূলে কোন এক গুপ্ত রহস্য নিহিত আছে।

সহসা দক্ষিণের ভেজান দরোজা নড়িয়া উঠিল। সে দিকে

চাহিয়া দেখিয়া কৃষ্ণগোবিন্দবাবু চীৎকার করিতে যাইতেছিলেন। সম্মুখে—দেওয়ালগাত্রে তাঁহার মাতৃ-মূর্ত্তি!

সে মূর্ত্তি দক্ষিণ হস্ত উত্তোলন করিয়া স্নেহ-কারুণ্য-কণ্ঠে—সেই চিরপরিচিত সুধামাখাস্বরে বলিলেন,—"বাবা, ভয় করিও না। আমি তোমার মা, আমায় দেখিয়া ভয় কি? তেমনই স্নেহ-ধারা এ হৃদয়ে এখনও সঞ্চিত আছে। মানুষ মরিলে মানুষের সকলই ফুরায় না। একটা কাজে তোমার কাছে আসিয়াছি। ভয় করিও না—নির্ভয়ে আমার সহিত কথা কও।"

ঘামিয়া, মুখ লাল করিয়া, নিশ্বাসে নিশ্বাসে, দমে দমে কৃষ্ণগোবিন্দবাবু বলিলেন,—মা মা, যদি দেখা দিয়াছ—তবে বল, সত্যই কি তুমি আমার সেই মা?"

মূ। হাঁ বাছা, আমি তোমার সেই মা।

বালকের ন্যায় কৃষ্ণগোবিন্দবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন,—"মা যদি আসিয়াছ, তবে আমাকে বলিয়া দাও—বুঝাইয়া দাও তুমি কেমন করিয়া আসিলে? তোমার মৃত্যু হইয়াছে—তোমার দেহ অগ্নিদগ্ধ করিয়া ভস্মকরা হইয়াছে, তথাপি তুমি ঠিক সেই মূর্ত্তিতে কি করিয়া আসিতে পারিলে? শাস্ত্রের কথা—প্রাচীন লোকের কথা না হয়, সত্য হউক—আত্মা না হয়, অবিনাশী,—কিন্তু দেহ? দেহত পুড়িয়া ছার-খার হইয়া গিয়াছে!"

প্রশান্তস্বরে সে মূর্ত্তি কহিলেন,—"বাবা, বিশ্বরহস্য বড়ই অদ্ভুত। আমি জ্ঞানী—একথা বলিয়া কেহই অহঙ্কার করিতে পারে না। মানব অসম্পূর্ণ—সুতরাং তাহার জ্ঞানও অসম্পূর্ণ। আমি সব বুঝি—একথা কখনও মনে স্থান দিও না। এ বিশ্বের অণু-পরমাণুতে রহস্য মাখা। কিছুই বুঝিবার উপায় নাই। আমি

যে মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া তোমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছি, ইহা বাস্তবিক আমার রূপ নহে—আভাসিক দেহ মাত্র। আমার এখন বাস্তবিক যাহা রূপ—তাহা তোমার চক্ষুর অগোচর। তোমাকে দেখা দিব বলিয়া, আমি এরূপ ধারণ করিয়াছি। সূক্ষ্মদেহীরা আভাসিক তনু গ্রহণে সক্ষম। আমার যে দেহ তোমরা পুড়াইয়া ফেলিয়াছ, তাহা স্থূলদেহ—আর এখন যে দেহ দেখিতেছ, ইহা সূক্ষ্মের পরিণতি—বা কাল্পনিক। এখনই অন্তর্হিত হইবে।"

কৃষ্ণগোবিন্দ বিস্ময়-বিহ্বলকণ্ঠে বলিলেন,—"মা, আমায় ডাকিয়া লইয়া আকাশ বাষ্পে যে মূর্ত্তি দেখাইয়াছিলেন, সে কি আমার পিতার আভাসিক মূর্ত্তি ?"

মৃ। হা—সে তোমার পিতারই মূর্ত্তি।

কৃ। বাবার মুখ অত ম্লান কেন ? চোখ অত করুণাকাঙ্ক্ষী কেন ?

মৃ। তোমার বাবা তোমার সাহায্য চান ?

কৃ। কিসের সাহায্য—বল মা, আমি যদি প্রাণ দিয়া তাঁহার সাহায্য করিতে পারি, তাহাতেও প্রস্তুত আছি। পরলোকে তাঁহার কিসের অভাব মা ? পরলোকেও কি মানুষের অভাব থাকে !

মৃ। থাকে বৈ কি। অপূর্ণ আকাঙ্ক্ষা, অপূর্ণ বাসনা লইয়া মানুষ মরিলে পরলোকের পথে তাহা পূরণের আকর্ষণ থাকে। অভাব-অভিযোগ পাপ-পুণ্য আসা-বাসনা সবই মানুষের সঙ্গে যায়। স্থূল দেহটাত বহিরাবরণ মাত্র। তোমরা জামা গায় দাও—জামাটা খুলিয়া ফেলিলে, তোমাদের আশা-বাসনা চিন্তা প্রভৃতি

যায় কি ? স্থূলদেহটাও ঐরূপ। যাহা কিছু সূক্ষ্ম শরীরের। মানুষ সূক্ষ্ম শরীর লইয়াই পরলোকগামী হয়।

কৃ। আমার পিতার কিসের অভাব বল মা,—আমি তাহা প্রাণ দিয়াও পূর্ণ করিব।

মৃ। তাহাতে প্রাণ দিতে হইবে না—কিন্তু আত্মাকে নিম্ন-স্তরে চালিয়া দিতে হইবে। আমি তাই নিষেধ করিতে আসি-য়াছি। তোমার অকল্যাণ হইবে,—তাহা করিলে অনেক দিন ধরিয়া বৈতরণীর এ পারে কাঁদিয়া কাঁদিয়া ফিরিতে হইবে।

কৃ। বুঝিতে পারিলাম না।

মৃ। বুঝাইবার শক্তিও আমার নাই। আমরা যে তোমাদের সহিত কথা কহি,—ইহাতে আমাদের বড় কষ্ট হয়। এখানকার বাতাস, স্থূল। আমরা সূক্ষ্ম,—কাজেই এ বাতাসে আমাদের কষ্ট হয়। সংক্ষেপে বলিয়া যাই—তোমার পিতা চান, প্রতিহিংসা সাধন করিতে। সে সাধনায় পাপের আয়োজন। যাহা পাপ-তাহা করিতে নাই। তোমার আত্মাকে রক্ষা করিতেই আমার এত কষ্ট সহ্য করা। তাহা না হইলে তোমার পিতার বাস্তবিক কোন ক্ষতি নাই।

কৃ। সে প্রতিহিংসায় ব্রহ্মচারী অজিতনাথ জড়িত আছে কি ?

মৃ। হাঁ, তাহারই জন্য তোমার পিতা রক্ত ছোরা লইয়া ঘুরিতেছেন ?

কৃ। বিশাখার কোন সংশ্রব আছে ?

মৃ। আছে।

কৃ। বিশাখা কে মা ?

মৃ। আমার বড় কষ্ট হইতেছে,—অদ্য চলিলাম। তোমার

বাপের সঙ্গে শীঘ্রই তোমার সাক্ষাৎ হইবে। তাঁহার কাছে ওসকল কথা শুনিতে পাইবে। আমি তোমাকে নিষেধ করিয়া গেলাম—আত্মঅধঃপতন সংসাধন করিও না। পুত্রস্নেহের বশবর্ত্তী হইয়াই আমার এত ছুটাছুটি।

কৃষ্ণগোবিন্দ আর একটা কি কথা জিজ্ঞাসা করিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু আর সে মূর্ত্তি নাই। কেমন করিয়া কোথা দিয়া সে মূর্ত্তি কোথায় অদৃশ্য হইল—কৃষ্ণগোবিন্দ বাবু তাহা বুঝিতে পারিলেন না। চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন,—দেখিতে পাইলেন, জানেলা গলিয়া উষার আলো গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। বাহিরে নহবত-খানায় ললিতের মধুর তান উঠিয়াছে।

পঞ্চাশৎ পরিচ্ছেদ।

—০—

অজিতনাথ তর্কালঙ্কার ঠাকুরের বাড়ী উপস্থিত হইয়া যে জন্য কৃষ্ণগোবিন্দ বাবুর নিকটে গিয়াছিলেন, তৎসম্বন্ধীয় সংবাদ প্রদান করিলেন।

তর্কালঙ্কার বলিলেন,—"আমি জানি, কৃষ্ণগোবিন্দ বড় এক গুঁয়ে লোক, সে কখনই আমাদের পরামর্শ শুনিবে না। বিশেষতঃ তাহার হৃদয়ে পাপ প্রবেশ করিয়াছে, সে বন্ধু-বাক্য গ্রহণ করিবে না। তাহার অধঃপতন অবশ্যম্ভাবী। তুমি বেশ করিয়া বুঝাইয়া বলিয়াছ ত?"

অ। আমার কিছু মাত্র ক্রটী হয় নাই। আমি বলিলাম, আপনি প্রতিভাশালী লোক—নবাবের আমলে আপনি যেরূপ

জমিদার ছিলেন, তাহা হইতে এখন আপনার ক্ষমতা অধিক হইবে। দেশের শাসনকার্য্যের ও কর আদায়ের ভার আপনার উপরে থাকিবে। আপনিই রাজা হইবেন,—কেবল ব্রহ্মচর্য্যের উপরে রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে—তাহারই উপরে প্রতিষ্ঠিত থাকিবে।

ত। তাহা শুনিয়া কি বলিল ?

অ। হাসিয়া উঠিলেন—বলিলেন, তোমরা পাগল—পাগলামী করিয়াছ। মোগলের কামানের মুখে সত্বরেই তোমাদের স্বপ্নরাজ্য উড়িয়া যাইবে। আমি বেচারা কেন মধ্য হ'তে প্রাণ দিতে যাই

ত। তুমি কি বলিলে ?

অ। আমি বলিলাম—দেশের জন্যে মরণ, সুখের মরণ। রোগে পড়িয়া বিছানায় মরার চেয়ে এ মরণে পুণ্য আছে।

ত। কৃষ্ণগোবিন্দ কি বলিল ?

অ। তিনি বলিলেন,—মরিলেই কি দেশের কাজ হয় ? তোমরা ভুল বুঝিয়াছ, ভুল করিয়াছ,—সত্বরেই সে ভুল কামানের মুখে শোধরাইবে। মনে করিয়াছ, দু'দিন স্বাধীনতা লাভ করিয়া দেশকে স্বাধীন করিয়াছ, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে—তোমাদের বিরুদ্ধে মোগল অনীকিনী সজ্জিত হইতেছে।

ত। সে কথায় তুমি কি বলিলে ?

অ। আমি বলিলাম, আমরা যদি মরি—মোগলের কামানের মুখে যদি প্রাণ দিই—আমাদের মত সুখের মরণ আর কে মরিতে পারিবে ? মাতৃ-ভূমির স্বাধীনতা দেখিয়া—মাতৃ-ভূমির স্বাধীন-ক্রোড়ে চির নিদ্রায় অভিভূত হইতে পারার চেয়ে সুখ আর কি আছে ? ক্ষণমাত্রও স্বাধীনতা লাভ স্বর্গসুখ হইতে সমধিক।

ত। উত্তরটা ভাল হয় নাই। সাধারণ লোকে ঐরূপ উত্তর করিতে পারে, কিন্তু তোমার মত উত্তর হয় নাই। ইহাতে নিষ্কাম ভাব নাই—নিজের বলিয়া যাহা, তাহাই সকাম। তুমি মাতৃ-ভূমির স্বাধীনক্রোড়ে মরার সুখ প্রাপ্ত হইলে, কিন্তু অপর সকলে আবার অধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইল। কাজ নিজের বলিয়াও করিবে না, পরের বলিয়াও করিবে না—যাহা হিতকর—যাহা আপাপবিদ্ধ তাহাই করিবে! বাস্তবিক যদি বুঝিতে পারা যায়, মোগলযুদ্ধে আমাদের পরাজয় নিশ্চিত,—তবে এ যুদ্ধ না করিয়া দেশের ও দেশের যাহাতে স্বার্থ বজায় থাকে, তাহা করিয়া লওয়াই কর্ত্তব্য।

অ। আপনি তবে সেইরূপই করিতেছেন না কেন?

ত। আমি চেষ্টার ক্রটী করি নাই। কিন্তু সাধারণে তাহা বুঝিল না।

অ। আমাদের কি এ স্বাধীনতা কিছুতেই রক্ষা হইবে না?

ত। হইতে পারে ব্রহ্মচর্য্যের উপরে এ স্বরাজ প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। ব্রহ্মচর্য্যব্রত অক্ষুণ্ণ থাকিলে, স্বরাজও থাকিবে।

অ। সে ভার আমার উপর।

ত। বর্ত্তমানে তাহাই বটে,—স্বার্থশূন্য, কামনা-বাসনাশূন্য ব্রহ্মচর্য্য ব্রতধারী তুমিই বর্ত্তমান সমাজের—বর্ত্তমান স্বরাজের আদর্শ। কিন্তু ব্যক্তিগত নেতায় সমাজ চলে না। যখন এই ধর্ম্ম—এই ব্রহ্মচর্য্য ব্রত ব্যক্তিগত না থাকিয়া জীবনে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হইবে, তখনই যথার্থ স্বরাজ প্রতিষ্ঠা হইবে। মনে করিও না, অবিবাহিত থাকিলেই ব্রহ্মচর্য্য ব্রত রক্ষা হইল,—আর বিবাহিত ব্যক্তি ব্রহ্মচারী হইতে পারে না। আর্য্যেরা

জনে জনে ব্রহ্মচারী ছিলেন। বিবাহিত জীবনেও তাঁহারা ব্রহ্মচারী ছিলেন,—স্বামিস্ত্রীতে ব্রহ্মচর্য্য ব্রত পালন করিতেন। গৃহ, দেবমন্দির—স্বামী হোতা, স্ত্রী ঋত্বিক্। প্রেম-ভক্তি, বিশ্বাস-সত্য, মানুষের গৃহের ন্যায়, দেবতার গৃহেরও বন্ধন-উপাদান। সূর্য্যালোকদীপ্ত বিমলপ্রভাতে, মলয়-সেবিত নিশীথ গর্ভবৈক্রান্তে জীবনের প্রেম ও পূর্ণতার জন্য স্বামী স্ত্রী মিলিয়া অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিতেন। ব্রহ্মচর্য্যে স্বরাজ প্রতিষ্ঠা হইত। এখন সে দিন নাই—এখন সর্ব্বত্রই পাশব ক্রীড়া—সর্ব্বত্র পাশবলীলা। কত কথা মনে আসে,—তাই বলিতেছিলাম, ভরসা অল্প—মুখে স্বরাজের কথা। কিন্তু পশুত্বে তাহা টিঁকিবে কি না সন্দেহ; ব্যক্তিগত সূত্রোপরি যাহার প্রতিষ্ঠা—তাহার বিসর্জ্জনে ক্ষণমাত্রও বিলম্ব ঘটে না। আমাদের দেশের লোক স্বরাজ প্রতিষ্ঠার অর্থ ভাল করিয়া বোঝে নাই, তাই এ বুড়া বামুনের কথা শুনিল না; আমি কিন্তু ভাল বুঝিতেছি না।

অ। স্বরাজের অর্থ আমাকে একদিন শুনাইবেন, বলিয়াছিলেন—অনুগ্রহ করিয়া তাহা আজি বলিবেন কি?

ত। আজি অনেক কাজ আছে। তোমার বোধহয় মনে আছে, দিল্লীর সেনাসমূহ বর্দ্ধমান পর্য্যন্ত আসিয়া পঁহুছিয়াছে,—নবাবসৈন্য সেখানে তাহাদের সহিত মিলিত হইয়াছে,—গঙ্গা পার হইয়া তাহারা বঙ্গ আক্রমণ করিবে। তাহার আর বিলম্ব নাই। এই সময় সতর্ক হইতে হইবে। আমি স্থির করিয়াছি, কতক গুলি সৈন্য লইয়া গঙ্গার নিকটে যাইব। তবে যদি আর নাই ফিরি—স্বরাজের কথাটা যখন তোমাকে বলিব বলিয়াছিলাম, এবং তুমি যখন প্রশ্ন করিলে, তখন সংক্ষেপে কথাটা বলি।

স্বরাজ প্রতিষ্ঠা অর্থে আত্মরাজ্য স্থাপন অর্থাৎ আপনার রাজার প্রতিষ্ঠা। এখন আপনি কে,—এবং আপনার রাজাই বা কে? ইহার বিচার-বিতর্কের প্রয়োজন। আপনি চৈতন্য পদার্থ—দেহ জড়। কিন্তু এই জড়দেহ জড় ইন্দ্রিয়াদি লইয়া সেই আপনার উপরে অর্থাৎ চৈতন্যের উপরে আধিপত্য করে.—পূর্ণ চৈতন্যসত্তা রাজা হইয়াও প্রজা জড় প্রকৃতির অধীন হইয়া পড়ে। একই চৈতন্যপদার্থ জড় দেহের উপর কর্ত্তৃত্ব করিতে পারিলে স্বরাজ প্রতিষ্ঠা হয়।

অ। ইহাতে দেশের কি হয়? ইহাত ব্যক্তিগত স্বরাজ প্রতিষ্ঠা।

ত। না, অজিতনাথ! ইহাই প্রকৃত দেশের হিতকার্য্য। যদি এই স্বরাজ প্রতিষ্ঠা হয়,—তবে স্বদেশ, স্বজাতি—ও ধর্ম্মের উন্নতি হয়। একদিন ভারতে এই স্বরাজ প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল,—বহু দিন ধরিয়া তাই ভারতের উন্নতি ছিল। যখনই স্বরাজ প্রতিষ্ঠার গোলযোগ ঘটিল, তখনই ভারতের পতন হইয়াছে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র সকলেই স্বরাজ প্রতিষ্ঠা করিতেন। সকলেই জড় ও চৈতন্য চিনিতেন। সকলেই জানিতেন—এ দেহ জড়, জড় আমি নহি,—আমি চৈতন্য। তাই ব্রাহ্মণ বিষয় বাসনা পরিত্যাগপূর্ব্বক বনে জঙ্গলে বসি[illegible] জগতের পদে—স্বদেশের চরণে জ্ঞানরাশি ঢালিয়া দি[illegible] ব্রহ্মবিদ্যা বিতরণ করিতেন। ক্ষত্রিয় স্বরাজ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন,—তাই জড়দেহ বলি দিয়া শরণাগত রক্ষা করিতেন, বাহুবলে, স্বদেশ, স্বজাতি ও স্বধর্ম্মের রক্ষা করিতেন। ধর্ম্মের জন্য—স্বরাজের জন্য—ঋত্বিকচরণে সর্ব্বস্ব দিয়া শ্মশান প্রান্তে শূকররক্ষা

করিতেন। বৈশ্য ধনরত্ন আহরণ করিয়া ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের চরণে ঢালিয়া দিতেন। শূদ্র যথোচিত খাটুনী খাটিয়া স্বদেশ ও স্বজাতির শিল্পবাণিজ্য ও জ্ঞানবিকাশের সহায়তা করিতেন।

তারপর?—তারপর স্বরাজ প্রতিষ্ঠা ভুলিয়া ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র সকলেই জড়ের অধীন হইল। অহংজ্ঞানে পূর্ণ হইল—জড়তত্ত্বের আলোচনায় হৃদয় পূর্ণ করিল—আত্মপ্রতিষ্ঠা ভুলিয়া গেল,—সকলেই বড় হইবে বলিয়া মত্ত হইল—স্বাধীনতার নামে উচ্ছৃঙ্খলতা ডাকিয়া আনিল—আরও অধঃপাতে গেল। ব্রাহ্মণ জ্ঞানবিতরণে কৌটিল্য অবলম্বন করিলেন—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়-বৃত্তি ধরিলেন—বিষয়লোভে ইন্দ্রিয়নিগ্রহ দূর করিলেন—ব্রহ্মচর্য্য দূরে গেল—ব্রাহ্মণ মরিয়া সঙ্কর হইলেন। ক্ষত্রিয়াদিও তাহাই। ব্রহ্মচর্য্য প্রতিষ্ঠা তাই প্রয়োজন,—তাই স্বরাজ প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে ব্রহ্মচর্য্যের প্রতিষ্ঠা প্রয়োজন। স্বার্থ থাকিলে স্বরাজ প্রতিষ্ঠা হয় না,—জগতে কোন জাতিই ক্ষুদ্র স্বার্থে উন্নতি লাভ করিতে পারে নাই। অতএব আমার বিশ্বাস, আমরা যে বঙ্গদেশ উদ্ধার করিয়াছি,—স্বাধীন করিয়াছি,—ইহা থাকিবে না। যখন এমন হইবে—দেশে ব্রহ্মচর্য্য প্রতিষ্ঠা হইবে, আবার ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্যাদি জন্মিবে—তখন স্বরাজ প্রতিষ্ঠা হইবে। স্বরাজ অর্থে একজন আপনার দেশের লোককে রাজা করা নহে,—সকলেরই পূর্ণ-চৈতন্যের প্রতিষ্ঠা।

অ। উচ্চ কথা বটে। এখন আমরা কি করিব?

ত। তোমরা ব্রহ্মচারি-আশ্রম রক্ষা করিও। কতক জেলালাবাদের ঐ দিকে যাইবে। কিন্তু একটি অনুরোধ অজিতনাথ!

অ। কি অনুরোধ,—আজ্ঞা করুন।

ত। কেবল তোমার উপরে সমস্ত নির্ভর—সে কথা যেন স্মরণ থাকে। তুমি সকলের নেতা—তুমি ব্রহ্মচারী—তুমি মাতৃ-সেবক—তুমি উজ্জ্বল প্রতিভা। কদাচ যেন তোমার পদস্খলন না হয়,—তুমি কোন ক্ষুদ্র স্বার্থের অধীন হইয়া কার্য্য করিলে সমস্ত ভরসা নির্ম্মূল হইবে। সমস্ত শ্রম পণ্ড হইবে। দেশের লোকের মধ্যে যে শক্তিসঞ্চয় হইয়াছিল,—দীর্ঘ কালের জন্য তাহা আবার নিভিয়া যাইবে।

অ। এমন হওয়ার কি আশঙ্কা করেন?

ত। করি।

অ। আমি সবিশেষ সাবধানে থাকিব।

ত। আশীর্ব্বাদ করি, তোমার চেষ্টা সফল হউক।

অ। এখন তবে বিদায় হই?

ত। হাঁ,—জঙ্গলাশ্রমে যাও—বারুদ-বন্দুক-অস্ত্র-শস্ত্র যেখানে যেখানে যাইবার কথা আছে,—পাঠাইবার বন্দোবস্ত করগে।

অ। আপনি কবে রওনা হইবেন?

ত। আমি ব্রাহ্মণপণ্ডিত মানুষ—কঞ্চির কলম ভিন্ন কখন লাঠিও হাতে করি নাই। যুদ্ধে যাওয়া আমার বিড়ম্বনা মাত্র,—তবে পরামর্শ দেওয়ার জন্য। অদ্য শেষ রাত্রেই রওনা হইব।

অজিতনাথ উঠিয়া গেলেন।

একপঞ্চাশৎ পরিচ্ছেদ

সে দিন অমাবস্যা রজনী। চতুর্দ্দিকে অন্ধকারের একাধিপত্য—কেবল আকাশের পূর্ব্বোত্তর কোণ হইতে একটা নক্ষত্র প্রাণ-পণে তাহার ক্ষীণরশ্মি জগতের পাছে ঢালিয়া দিয়া অন্ধকার বিনাশের চেষ্টা করিতেছিল, কিন্তু সে কার্য্য তাহার অসাধ্য দেখিয়া ক্রমে ক্রমে ম্লান হইয়া উঠিতেছিল। আকাশ মেঘ পরিশূন্য—এক একবার দমকা বাতাস বহিয়া যাইতেছিল।

রাত্রি দ্বিপ্রহর। সমস্ত গ্রাম সুপ্ত,—কৃষ্ণগোবিন্দ বাবু তাঁহার শয়নকক্ষে একা শায়িত। যে অশুভ রজনীতে তিনি ফৌজদার সাহেবের বাড়ী হইতে গ্রামে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন, সেই রাত্রি হইতে তাঁহার সুখ-নিদ্রা বিদূরিত হইয়াছে—দুশ্চিন্তায় প্রায় রাত্রিই অতিবাহিত হয়,—প্রায়ই নিশার শেষে তাঁহার একটু নিদ্রা হয়। বহুবিধ চিন্তায়—নানাবিধ উচ্ছ্বাসে রাত্রি অতিবাহিত হয়।

কৃষ্ণগোবিন্দ বাবু শয্যার উপরে শুইয়া শুইয়া নানাবিধ চিন্তা করিতেছিলেন। সহসা তাঁহার কক্ষের ছাদের উপরে মনুষ্য পদ-শব্দ হইতে লাগিল—তাঁহার বোধ হইল যেন কোন এক বলবান্ পুরুষ ছাতের উপরে চলিয়া বেড়াইতেছে। তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিলেন,—এবং একটা বন্দুকে গুলি পূর্ণ করিয়া লইয়া সিঁড়ির দিকে যাইবেন, এমন সময় হঠাৎ কীলকাবদ্ধ দরোজা খুলিয়া গেল,—ধীরে ধীরে এক দীর্ঘায়ত পুরুষ গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল।

গৃহমধ্যে কাষ্ঠাধারে উজ্জ্বল আলোক জ্বলিতেছিল। সবিস্ময়ে সে আলোকে কৃষ্ণগোবিন্দ বাবু দেখিলেন—সে তাঁহার পিতৃ-মূর্ত্তি। অন্য সময়ে হইলে, ভয়ে বিস্ময়ে তিনি কাঁপিয়া উঠিতেন। কিন্তু দুই তিন দিন মাতৃ-মূর্ত্তি দর্শন করিয়া, এবং তাঁহার নিকটে পিতার প্রেতযোনিতে অবনতির কথা শুনিয়াছিলেন বলিয়া বিস্মিত হইলেন না,—তবে সবিশেষ না হউক, কিঞ্চিৎ ভীত হইলেন। সভয় অন্তরে বলিলেন,—"আপনি বোধহয়, আভা-সিক দেহ ধারণ করিয়াছেন? আপনি বোধহয়, আমার পিতার সূক্ষ্মদেহী?"

মূর্ত্তি গম্ভীর স্বরে বলিল,—"তুমি ঠিক অনুমান করিয়াছ। আমি তোমার পিতা—অনেক দিন হইতে বড় কষ্টে ঘুরিয়া বেড়াইতেছি। সময় হয় নাই বলিয়া এতদিন তোমার কাছে আসিতে পারি নাই—বা আসি নাই। এখন সময় উপস্থিত। তুমি একটু চেষ্টা করিলে, আমার বুকের আগুন নিভাইতে পার। আমার প্রেতত্ব নিবারণ করিতে পার, এবং পুত্রের কাজ করিতে পার।"

কৃ। কি করিতে হইবে বলুন?

মূ। যাহা করিতে হইবে, তাহা মুখ দিয়া বলিতে পারি না। বুক ফাটিয়া যায়,—তুমি তোমার গৃহের দেওয়ালের দিকে চাহিয়া দেখ।

কৃষ্ণগোবিন্দ বাবু গৃহের দেওয়ালের দিকে চাহিলেন। সহসা গৃহস্থিত প্রজ্বলিত আলোক নির্ব্বাপিত হইয়া গেল,—সমস্ত গৃহ অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হইল। সেই অন্ধকারে দেওয়ালের গায়ে আগুনের অক্ষর ফুটিয়া উঠিল।

আট দশ ছত্র লেখা,—কৃষ্ণগোবিন্দ বাবু বিস্মিত হইয়া সে লেখা পাঠ করিলেন। সেই লেখা তাঁহার পিতার জীবিতকালের হস্তাক্ষর।

দেখিতে দেখিতে সে লেখাগুলি দেওয়ালের গায়ে মিশিয়া গেল—আবার দশ বারটি ছত্র সেইরূপ লেখা বাহির হইল, আবার মিশিয়া, আবার বাহির হইল। প্রত্যেকবারেই পৃথক্ কথা বাহির হইতেছিল,—অর্থাৎ আদ্যন্ত শৃঙ্খলাপূর্ণ একটি ইতিহাস;—সে সকল কথা কৃষ্ণগোবিন্দ বাবু যতই পাঠ করিতে লাগিলেন,—ততই শিহরিয়া উঠিতে লাগিলেন।

অনেকক্ষণ পরে আবার গৃহস্থিত আলো জ্বলিয়া উঠিল—কৃষ্ণগোবিন্দ বাবু দরজার দিকে চাহিয়া দেখিলেন,—তাঁহার পিতৃমূর্ত্তি অন্তর্হিত হইয়াছেন। দরোজা খোলা অবস্থাতেই আছে, কেবল বস্ত্রের পর্দ্দাখানি লম্বিত হইয়া গিয়াছে।

কৃষ্ণগোবিন্দ বাবু একেবারে স্তম্ভিত ও বিস্মিত হইয়া গেলেন। যাহা পাঠ করিলেন,—তাহা অতিশয় বিস্ময়কর ও অচিন্তনীয়। তাঁহার মনে হইল, নিশ্চয় ইহা কোন ইন্দ্রজাল হইবে। অথবা আমাকেই ভূতে পাইয়াছে,—কিন্তু বিশাখা যাহা বলিয়াছিল,—সে দিন মা যাহা বলিয়া গিয়াছিলেন,—সে সকলেও এই কথারই আভাস ছিল। আজি তাহার পূর্ণ ইতিহাস পাঠ করিলাম। পিতৃ-মূর্ত্তি দর্শন করিলাম। এক্ষণে কি করিব? তবে কি বাবা যাহা দেখাইয়া গেলেন—বাবা যাহা শিখাইয়া গেলেন—তাহাই করিব। কিন্তু মা ইহা করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন।

পরশুরাম পিতৃআজ্ঞায় মাতার কণ্ঠচ্ছেদ করিয়াছিলেন,—আর আমি মাতার কথায় পিতার কষ্ট ঘুচাইব না কেন?

সহসা দরোজার লম্বিত পর্দ্দা নড়িয়া উঠিল। কৃষ্ণগোবিন্দ বাবু সে দিকে চাহিয়া দেখিলেন,—তাঁহার সর্ব্বাঙ্গের শোণিত স্নায়ু-পথে অতি দ্রুততর বেগে ছুটিয়া গেল। দেখিলেন,—তাঁহার মাতার মূর্ত্তি, বামহস্তে লম্বিত পর্দ্দা সরাইয়া ধরিয়া দক্ষিণ হস্ত মস্তকে রাখিয়া দরোজায় ঠেশান দিয়া দাঁড়াইল।

মূর্ত্তি ভয়ঙ্কর। মস্তকের চুলগুলি উর্দ্ধ বিক্ষিপ্ত—চক্ষু দিয়া যেন অনলের ঝলক বহিয়া যাইতেছিল, কিন্তু গম্ভীর, স্থির।

দূর হইতে কে মেঘমন্দ্রস্বরে গাহিতেছিল ;—

দিগন্ত মগ্ন করাল মেঘে প্রবল ঝঞ্ঝা বয়,
বিকট তাণ্ডবে তাথেই তাথেই দামিনী দমকি যায়।
ঘুমালু তারকা নিশীথ গগনে,
আচ্ছন্ন চন্দ্রমা রক্ত আবরণে,
বিশ্ব যুড়িয়া ভীষণ আঁধার অশিব সঙ্গীত গায়।
নরমুণ্ডমালা পিশাচে গাঁথিছে,
অট্ট অট্ট হাসি দানবে হাসিছে,
ছিন্ন কন্থা উড়ায়ে প্রেতিনী শ্মশান-প্রান্তরে ধায়।

কৃষ্ণগোবিন্দ বাবুর প্রাণ অবসন্ন হইয়া পড়িল। ভয়ে, বিস্ময়ে মুখে ধূলা উড়িল। জড়িত করুণস্বরে বলিলেন,—"মা, মা, আমি ভীত হইয়াছি। আমার কর্ত্তব্য পন্থা ভুলিয়া গিয়াছি! কি করিব, বলিয়া দাও।"

মুহূর্ত্তমধ্যে গৃহের আলোক নির্ব্বাপিত হইয়া গেল। কৃষ্ণ-গোবিন্দ বাবু দেখিলেন, দেওয়ালের গায়ে আগুনের অক্ষর ফুটিয়া উঠিয়াছে—নরক ও স্বর্গ, যদি নরকে যাও—তোমার পিতৃ-উপদেশ মতে কাজ কর। যদিও স্বর্গ-দ্বার তোমার জন্য

আবদ্ধ—তুমি স্বদেশদ্রোহী; তথাপিও জন্মজন্মান্তরের সাধনাবলে আত্মোন্নতি করিতে পারিবে। কিন্তু চেষ্টা করিয়া যোগীর যোগ ভঙ্গ করিয়া স্বদেশের পায়ে অধীনতা-শৃঙ্খল পরাইয়া দিলে,—অনন্তকাল রৌরব নরক।

তারপরে দেওয়ালের অগ্নির অক্ষর নিভিয়া গেল—গৃহের আলোক জ্বলিয়া উঠিল। দরোজার পর্দ্দা ধরিয়া সে মূর্ত্তি তখনও দণ্ডায়মান। কৃষ্ণগোবিন্দ বাবু ডাকিলেন,—"মা!"

সে মূর্ত্তি বলিল,—"বাছা, স্মরণ রাখিও, আমি বিদেহী। যদিও পার্থিব সম্বন্ধ সম্পূর্ণ আমাদের মনে থাকে, যদিও স্নেহাদির আকর্ষণ কথঞ্চিৎ থাকে, তথাপিও পৃথিবীতে থাকিতে যেরূপ মূঢ় মমতার বশবর্ত্তী থাকা যায়, এ অবস্থায় তাহা থাকে না। কেন না, তখন মানুষ জানিতে পারে না, সকলেই আপন আপন। কেহ কাহারও পুত্র কন্যা স্ত্রী বা ভর্ত্তা নহে,—এ অবস্থায় তাহা জানা যায়। আমরা যে রাজ্যের লোক—সে রাজ্যে কত বিদেহী আত্মা ঘুরিয়া ঘুরিয়া আপন আপন কর্ম্মফল ভোগ করিতেছে। তাই বলিতেছিলাম,—আমার এখন যে অবস্থা, তাহাতে তোমার উপর স্নেহ থাকিলেও মূঢ় স্নেহ নাই। হাঁ, কি বলিতেছিলে—বল?"

কৃ। বলিতেছিলাম, বাবা যখন কষ্ট পাইতেছেন—যখন তাঁহার উর্দ্ধগতি হইতেছে না, তখন আমি পুত্র হইয়া তাঁহার কাজ না করিব কেন?

মূ। তাঁহার যে জন্য প্রতিহিংসা, তাহা পাপের কার্য্য,—এখনও পাপের কার্য্যে তোমাকে প্রবৃত্তি লওয়াইতেছেন—ইহার ফলে তাঁহার এবং তোমার উভয়েরই অনেক যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে। সঙ্গে সঙ্গে আমাকেও কষ্ট পাইতে হইবে।

কৃ। তিনি ঐকার্য্যে আমাকে নিযুক্ত করিতেছেন,—আমি কার্য্য সম্পন্ন করিতেছি—আমরা তৎফলে কষ্ট পাইতে পারি—আপনি কষ্ট পাইবেন কেন?

মূ। আমি তোমার পিতার পরিণীতা স্ত্রী। অনেকদিন ধরিয়া তোমার পিতাকে ধ্যান করিয়াছি—অনেকদিন ধরিয়া তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে ফিরিতেছি। আমার পাপ-পুণ্যে তিনি দায়ী—তাঁহার পাপ-পুণ্যে আমি দায়ী; অর্থাৎ দুইজনের অদৃষ্ট এক-সূত্রে গাঁথা। যাক্, আমি আর আসিব না—আসিতে আমার বড় কষ্ট হয়। তোমাকে সাবধান করিবার জন্য অনেক কষ্ট সহ্য করিলাম।

চক্ষুর পলক ফেলিতে না ফেলিতে সে মূর্ত্তি অন্তর্হিত হইয়া গেল।

মাতার জন্য কৃষ্ণগোবিন্দবাবুর প্রাণ বড়ই বিচলিত হইল। সে মূর্ত্তি—সে স্নেহ-করুণা-মাখা মূর্ত্তি আর দেখা যাইবে না ভাবিয়া কৃষ্ণগোবিন্দ বাবু শোকান্বিত হইলেন। তারপরে পিতা ও মাতার বিরোধী আদেশের বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন।

দ্বিপঞ্চাশৎ পরিচ্ছেদ।

প্রাগুক্ত ঘটনার কয়েক দিন পরে কৃষ্ণগোবিন্দ বাবু সংবাদ পাইলেন, বসন্তরাণী ও বিশাখা তাঁহাদের গ্রামে আসিয়া গ্রামের স্ত্রীলোকদিগকে স্বদেশপ্রীতি শিক্ষা দিতেছে। সংবাদ পাইয়া তিনি বিশাখাকে ডাকাইলেন।

বিশাখা আসিয়া কৃষ্ণগোবিন্দ বাবুর চরণে প্রণাম করিল কৃষ্ণগোবিন্দের মনে অনেক কথার উদয় হইল। অনেকক্ষণ বিশাখার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন,—"বিশাখা, তুমি নির্দ্দোষ, এতদিনে তাহা বুঝিতে পারিয়াছি। অনর্থক তোমাকে কষ্ট দিয়াছি;—আমাকে ক্ষমা করিও।"

বিশাখা নতমুখে বলিল,—"আপনি আমার প্রতিপালক অন্নদাতা, আমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কি? আমি কোন্ বিষয়ে নির্দ্দোষ বলিয়া আপনি জানিতে পারিয়াছেন?"

কৃ। তোমাকে সেই নিশাকালে দুর্গদ্বারে দেখিয়া দোষী বিবেচনা করিয়াছিলাম—তোমাকে বন্দী করিয়াছিলাম,—এখন জানিতে পারিয়াছি, তুমি নির্দ্দোষ,—তুমি যাহা বলিয়াছিলে, সমুদায় সত্য।

বি। আমি আপনার কথা ভাল করিয়া বুঝিতে পারিতেছি না! এখন কি প্রকারে জানিলেন আমি নির্দ্দোষ?

কৃ। যে কোন প্রকারেই হউক, জানিয়াছি।

বি। যদি একথা আন্তরিক হয়, আমি পরম প্রীত হইলাম। আমার আশ্রয়দাতা—আমার অন্নদাতা—আমাকে

নির্দ্দোষ বলিয়া জানিয়াছেন, এর চেয়ে সুখের কথা আর কি আছে ?

কৃ। হাঁ, আমি আন্তরিকই একথা বলিতেছি। এখন তুমি যদি ইচ্ছা কর, আমার বাড়ীতেই পূর্ব্বের স্থায় কন্যা-নির্ব্বিশেষে থাকিতে পার।

বি। আমি এ সংসারে থাকিতে বড় ভালবাসি। এবাড়ীর একটি ক্ষুদ্র বিড়ালও আমার বুকের স্নেহমাখা। কিন্তু আপনার জামাতা, অত্যন্ত অসচ্চরিত্র—তিনি আমাকে অশেষবিধ যন্ত্রণা প্রদান করিয়াছেন,—এখনও তিনি এই সংসারে আছেন, আমি এখানে থাকিলে তিনি আবার অনর্থ ঘটাইয়া তুলিবেন। তাঁহার অত্যাচারের কথা মনে হইলে এখনও প্রাণ ফাটিয়া যায়।

কৃ। না না, সে ভয় আর তোমার নাই,—এখন তিনি অনেকটা শান্ত হইয়াছেন। বিশেষতঃ বাড়ীর উপরে থাকিয়া তিনি কি স্বেচ্ছাচারী হইতে পারেন ? তবে তোমার যদি এখানে থাকিতে আর ইচ্ছা না হয়, তবে সে স্বতন্ত্র কথা। কেন না, তুমি এখন তর্কালঙ্কারের দলভুক্ত হইয়াছ—স্বদেশসেবায় ব্রতী হইয়াছ।

বি। না প্রভু, আমার মত লোকের সে সকল উচ্চভাব কোথায় ? মোহনলাল বাবুর অত্যাচার-বহ্নিতে পুড়িয়া মরিতে-ছিলাম,—বসন্তরাণী উদ্ধার করিয়া আনিয়া নিজের নিকটে রাখিয়াছেন। তিনি যেখানে যান, আমিও তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে সেই স্থানে যাই। আমি নিজে সে সকলের কোন ধার ধারি না—ধর্ম্মহীন, কর্ম্মহীন, উদ্দেশ্যহীন জীবন লইয়া জন্মিয়াছি—তেমনই চলিয়া যাইব।

কৃষ্ণগোবিন্দবাবু দেখিলেন, বিশাখা এখন মুখরা—সে লজ্জা-মাখান দৃষ্টির পরিবর্ত্তে এখন তাহার তীব্র চাহনি। কৃষ্ণগোবিন্দ বাবুর মনে হইতেছিল, বিশাখাকে রাখিয়া পিতার আদেশমত কার্য্য করিলে হয় না? আবার মাতার নিষেধ মনে হইতেছিল।

বিশাখা বলিল,—"যদি অনুমতি করেন, মাতাঠাকুরাণীর সহিত একবার সাক্ষাৎ করিয়া আসি।"

কৃ। স্বচ্ছন্দে—ইচ্ছা করিলে থাকিতেও পার।

বিশাখা বাড়ীর মধ্যে গমন করিল। তখন বেলা আর বড় অধিক ছিল না।

নীরদার সহিত তাহার প্রথমেই সাক্ষাৎ হইল। নীরদা বলিল—"কি লা, বহুদিন পরে আবার এবাড়ীতে এসেছিস্—কোথায় এবং কেমন আছিস্?"

বিশাখা হাসিল। বলিল,—"ভাল আছি।"

তারপরে সে চলিয়া গেল। বিশাখার হাসিতে নীরদা চমকিল,—তাহার মনে হইল, বিশাখা আমাকে দেখিয়া হাসিল কেন? অজিতনাথ আমাকে অপমান করিয়া চলিয়া গিয়াছে—ব্যর্থ প্রণয়ের বিষাক্ত ছুরিকায় আমার বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া গিয়াছে, হয়ত সে কথা বিশাখা শুনিয়াছে, তাই হাসিয়া গেল। নীরদা শেষে তাহাই সাব্যস্ত করিল এবং আপনাকে সমধিক অপমানিতা জ্ঞান করিল।

বিশাখা কর্ত্রীঠাকুরাণীর সাক্ষাৎ পাইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল। বিশাখাকে দেখিতে পাইয়া মহামায়া এবং বাড়ীর আরও অনেকগুলি কুটুম্বিনী তথা তাঁহাদের বালক বালিকা তাহাকে আসিয়া বেষ্টন করিল।

কর্ত্রীঠাকুরাণী বলিলেন,—"মা, তোর কি পাষাণ প্রাণ। আমাদের কথা একেবারে ভুলে গিয়েছিস্ ?"

বিশাখার চক্ষু পুরিয়া জল আসিল। বলিল,—"মা, আমি জ্ঞান হওয়া পর্য্যন্ত আপনাকে মা বলিয়া জানি—মহামায়াকে ভগিনী বলিয়া জানি—এই সংসার আপন সংসার বলিয়া জানি—ইহার ওদিকে আর যে কিছু আছে, তাহা জানিতাম না। ধর্ম্ম, কর্ম্ম, স্নেহ ভালবাসা—সকলই ইহার মধ্যে অবস্থিত তাহাই জানিতাম। তারপরে, আপনারা পায়ে দলাইলেন—আপনার জামাতা আমাকে রাত্রে ধরিয়া লইয়া গিয়া যথেষ্ট কষ্ট দিলেন। তবে সতীর মান সতী-পতি শঙ্কর রক্ষা করেন—তাই কোন প্রকারে ধর্ম্ম বজায় রাখিতে পারিয়াছি।"

মহামায়ার মুখখানি অত্যন্ত ম্লান হইয়া গেল। সে ভাঙ্গা ভাঙ্গা স্বরে বলিল,—"ভগিনি, তাঁহাকে ক্ষমা করিও। তাঁহার অবস্থা বড় শোচনীয় ?"

বি। কেন, দিদিঠাকুরুণ, তাঁহার কি হইয়াছে ?

ম। তাঁহার যকৃতে প্রবল বেদনা হইয়াছে, যখন বেদনা হয়, তখন তিনি বড় কষ্ট পান। আর যখন জ্ঞান হয়, তখন—

বি। তখন কি হয় দিদিঠাকুরুণ ;—আমি তোমাদের দাসী বিশাখা—আমার নিকটে কথা বলিতে সঙ্কুচিত কেন দিদি-ঠাকুরুণ ?

ম। তখন সেই কাল নেশা। মদের অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা—তাহাতেই মত্ত থাকেন। শয্যা হইতে আর বড় ওঠেন না।

বি। ভগবান্ তাঁহাকে সুমতি দিন। জীবনে অনেক মহাপাতক সঞ্চয় করিয়াছেন,—এখন যাহাতে তিনি কিছুমাত্রও

পুণ্য সঞ্চয় করিতে পারেন, প্রাণপণে একবার তাহার চেষ্টা করুন। নতুবা,—

ম। আর বলিও না বোন্ ;—নতুবা কি হইবে, তাহা আমি জানি বিশাখা। সেই জন্য সেই পুণ্যাত্মা ব্রহ্মচারীর চরণাশ্রয় লইয়াছি।

বি। কোন্ ব্রহ্মচারীর ?

ম। যাঁহার পুণ্যগন্ধে সারা বঙ্গ উদ্ভাসিত।

বি। ব্রহ্মচারী অজিতনাথের কি ?

ম। হাঁ।

বি। তিনি এ বাড়ীতে যাতায়াত করেন ?

ম। একদিন আসিয়াছিলেন,—আর একদিন আসিবেন বলিয়া গিয়াছেন—সে দিন আ'জ।

বি। আ'জ আস্‌বেন ?

ম। তাহাই বলিয়া গিয়াছেন।

বি। অসম্ভব—মুসলমানের ফৌজ পদ্মা পার হইয়াছে—অনেক গ্রাম আক্রমণ করিয়াছে। স্বদেশসেবকেরা মুসলমান-ফৌজের আক্রমণ রোধার্থ যুদ্ধ করিতেছে,—তিনি বড় ব্যস্ত ; আজি কি আসিতে পারিবেন ? কিন্তু তিনি আসিয়া জামাই বাবুর কি করিবেন ?

ম। আমি শুনিয়াছি, এক আত্মার উন্নতি জন্য অপর আত্মার সাহায্য প্রয়োজন। সে সাহায্য তিনি করিবেন ?

বি। জামাই বাবু যে সাহায্য গ্রহণ করিবেন ?

ম। তাঁহারা পতিতের ত্রাণকর্ত্তা—আসিলে বুঝিতাম। তবে যদি যুদ্ধ-ব্যাপারে লিপ্ত হইয়া না আসেন।

বি। যদি আসিবেন বলিয়া গিয়া থাকেন, সহস্র কার্য্যের মধ্যেও আসিতে পারেন।

ঠিক এই সময় এক দাসী আসিয়া বলিল,—"ব্রহ্মচারী ঠাকুর আসিয়া বহির্ব্বাটীতে অপেক্ষা করিতেছেন, কর্ত্তামার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে চাহেন।

কর্ত্রীঠাকুরাণী কথা না কহিতেই মহামায়া বলিল,—"শীঘ্র তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া আয়।"

দাসী কর্ত্রীঠাকুরাণীর মুখের দিকে চাহিল। তিনি মহামায়ার কথায় অনুমতি প্রকাশ করিলেন। দাসী চলিয়া গেল।

বিশাখার প্রাণের মধ্যে দ্রুত স্পন্দন হইতে লাগিল। কে জানে কেন সে ব্রহ্মচারীর নাম শুনিলে—সে ব্রহ্মচারীর দর্শন পাইলে বিশাখার এইরূপ দশাই হয়। হায়, কেন তাহার বুকের এ পোষমানান আবেগউচ্ছ্বাস!

কিঞ্চিৎপরেই দাসীর সহিত ব্রহ্মচারী অজিতনাথ তথায় আগমন করিলেন। বিশাখা সে মূর্ত্তির দিকে চাহিল। অজিত-নাথও সেই সময় চাহিয়াছিলেন,—চারি চোখে মিলিত হইল। সেই চারি চোখে কি বৈদ্যুতিক সঞ্চিত ছিল, তাহা কে বলিতে পারে,—কিন্তু উভয়ে ক্লিষ্ট, অবসন্ন ও কম্পিত-দেহ হইল।

উভয়েই আত্মসংযম করিল, কিন্তু অন্তর-কম্পন বিদূরিত হইল না। মহামায়া ব্রহ্মচারীর চরণে প্রণাম করিল। কর্ত্রী-ঠাকুরাণী সাদর আহ্বান করিলেন। দূর হইতে ক্ষুধিত ব্যাঘ্রীর মত নীরজা অজিতনাথকে লক্ষ্য করিল।

এদিকে সন্ধ্যা সতী দিক্-বধূর অঙ্গে ঘন কালিমা লেপন করিয়া জগতে আবির্ভূতা হইলেন। গৃহে গৃহে সন্ধ্যার প্রদীপ

জলিল—বাগানে মল্লিকা, চাঁপা, গন্ধরাজ ফুটিয়া মলয়সমীরে গন্ধ বিলাইতে লাগিল।

কর্ত্রী ব্রহ্মচারীকে অজিনাসন আনাইয়া দিলেন। অজিতনাথ সে আসনে বসিয়া অনেক ধর্ম্মকথার আলোচনা করিলেন। সকলে তাহা শুনিয়া পরম প্রীতিলাভ করিল। বিশাখা প্রাণ ভরিয়া সে বাক্য-সুধা পান করিল। নীরদা দূর হইতে তাহাদিগকে লক্ষ্য করিতেছিল।

কর্ত্রীঠাকুরাণী অজিতনাথকে জলযোগ করিতে অনুরোধ করিলেন। অজিতনাথ তাহাতে স্বীকৃত হইলেন না। বলিলেন —"মা, আমি বড়ই দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, আপনি আমার মাতৃস্বরূপা হইলেও বর্ত্তমানে আপনার গৃহে জলযোগ করিতে পারিলাম না। আমার জন্য নহে—স্বদেশের জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছি—স্বদেশদ্রোহীর বাড়ীতে জলপান পর্য্যন্ত করিব না।"

কর্ত্রী বিপন্না হইলেন। মহামায়া বলিল,—"আমি যে অনুরোধ করিয়াছিলাম ?"

অ। মোহনলাল বাবুকে কি আমার কথা বলিয়াছ ?

ম। না, তা বলি নাই।

অ। আ'জ তাঁহাকে আমার কথা বলিও—বলিও, অজিতনাথ আপনার সহিত বন্ধুত্ব করিতে চান—এবং মধ্যে মধ্যে আসিয়া আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চান।

ম। আর আপনার পতিত আত্মাকে উদ্ধার করিতে চান,— সে কথা বলিব না কি ?

অ। না। তিনি উদ্ধত যুবক—কখনও শিষ্যজীবন লাভের

জন্য চেষ্টা করেন নাই। তিনি ওরূপ বলিলে কখনই আমাকে তাঁহার নিকটে আসিতে দিবেন না। আমিও গুরু নহি—বন্ধুভাবে তাঁহাকে ধর্ম্মোপদেশ দিব—বন্ধুভাবে পাপের পথ হইতে ফিরাইব।

ম। তবে তাহাই। কিন্তু তিনি যদি তাহাতে অস্বীকৃত হয়েন?

অ। আমার সহিত বন্ধুত্ব করিতে?

ম। হাঁ?

অ। তাহাতে অস্বীকৃত কেন হইবেন। তিনি স্বার্থপর—তাঁহার স্বার্থের কিছু বন্দোবস্ত করা যাইবে।

ম। যদি স্বীকৃত হয়েন,—আপনি কবে আসিবেন?

অ। যদি বাঁচি এক সপ্তাহ পরে।

ম। সে কি কথা?

অ। আগামী চতুর্থ দিবসের সন্ধ্যাকালে মুসলমান ফৌজগণকে আক্রমণার্থ সদলে পাঁচুবিবির পাহাড়কিনারে গমন করিব। সেই দিবস এক মহাসমর বাধিবে। সেই সমরে যদি জয়লাভ হয়, তবেই বঙ্গবিজয় হইবে।

ম। আপনি কি আশা করেন, সে সমরে বঙ্গবাসী জয়লাভ করিতে পারিবে?

অ। হাঁ, সে আশা আমি সম্পূর্ণরূপে করিয়া থাকি।

ম। ভগবান্ আপনার আশা পূর্ণ করুন—বঙ্গদেশ বঙ্গবাসীর পূজাগ্রহণ করুক—বিদেশীর চরণতাড়ন হইতে অব্যাহতি পা'ক। কিন্তু মুসলমানের কামান-বন্দুকের সম্মুখে তিষ্ঠান কঠিন।

অ। জগতে এমন এক শক্তি আছে, যে শক্তির কাছে

মানবকৃত কৃত্রিম শক্তি সামান্য। সেই মহাশক্তি মূর্ত্তিমতী হইয়া আমাদিগকে রক্ষা করিতেছেন।

ম। আমরা সংসারী—অল্পবুদ্ধি—আপনাদের কথা বুঝিতে পারি না। তবে এই বুঝি, আপনারা জ্ঞানী—আপনারা ধার্ম্মিক, আপনারা যাহা করেন—তাহাতে দেবতা সন্তুষ্ট হন,—দৈববলে আপনারা পৃথিবীবিজয় করিতে পারেন।

অ। মোহনলাল বাবুকে বলিবে, যদি তিনি আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে স্বীকৃত হন—আমি আগামী দিনে আসিয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইব। অদ্য রাত্রি হইয়াছে—আমি চলিলাম।

অজিতনাথ উঠিয়া দাঁড়াইলেন। কামনাকুল-কটাক্ষে বিশাখার দিকে চাহিয়া অজিতনাথ চলিয়া গেলেন। দূরে আম্রবৃক্ষের ডাল হইতে একটা পেঁচক বড় কর্কশকণ্ঠে ডাকিয়া উঠিল। বিশাখা উঠিয়া অজিতনাথের পশ্চাদনুসরণ করিল।

মহামায়া বিশাখাকে জিজ্ঞাসা করিল,—"তুমি কোথায় যাও?"

বিশাখা বলিল,—"একটু পরেই ফিরিয়া আসিতেছি। যে কাজের জন্য এ গ্রামে আসিয়াছিলাম, অজিতনাথকে তাহার সংবাদ দিয়া আসি।"

সেদিন কৃষ্ণপক্ষের দ্বিতীয়া তিথি। তখন চন্দ্রদেব পূর্ব্বগগনে অতি উজ্জ্বল আলোক বিকীর্ণ করিয়া উদিত হইতেছিলেন।

বাবুদের বাড়ী ছাড়িয়া কিয়দ্দূর গমন করিলে এক আম বাগান,—আমবাগানের প্রান্তভাগ দিয়া একটি দীর্ঘিকা অনেকদূর পর্য্যন্ত বহিয়া চলিয়া গিয়াছে।

অজিতনাথ কিয়দ্দূর গিয়া একবার পশ্চাৎ ফিরিয়া চাহিয়া

দেখিলেন। দেখিলেন—তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ একটি স্ত্রীলোক আসিতেছে। তিনি ভাবিলেন হয়ত বিশাখা। তাঁহার বুকের মধ্যে দ্রুত স্পন্দন হইতে লাগিল। তিনি জ্যোৎস্নাফুল্ল আম্রবৃক্ষের তলে দণ্ডায়মান হইলেন। স্ত্রীমূর্ত্তি আসিয়া তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইল,—বাস্তবিক সে বিশাখা।

দীর্ঘিকার পার্শ্বে—আম্রকাননোপান্তে, অজিতনাথ ও বিশাখা একত্র দণ্ডায়মান হইল। নবোত্থিত নৈশফুল্ল তরল জ্যোৎস্না তাহাদের সর্ব্বাঙ্গে ছড়াইয়া পড়িল। বুঝি কত জন্ম-জন্মান্তরের সঞ্চিত সংস্কার সেঁ জ্যোৎস্নার সঙ্গে তাহাদের সর্ব্বাঙ্গ ছাইয়া ফেলিল।

দুইজনে দুইজনের দিকে চাহিল। দুইজনে "কেমন কি" হইয়া গেল। বসন্ত বিজনের সমবেত সুরভির মত একরূপ রসময়, মদিরাময়, অবসাদক সুরভি দিকে দিকে ভাসিয়া বেড়াইতেছিল, তাহাতে কামনা-বাসনার প্রবলপিপাসা উভয়ের হৃদয়ে পূর্ণ মাত্রায় বাড়িয়া পড়িল। কে জানে কেন—কত দিনের আচরিত-প্রতিষ্ঠিত ব্রহ্মচর্য্য বিচ্যুত হইল,—অজিতনাথ বিশাখার সেই অপ্সরো-রূপের উন্নত যৌবনপূর্ণ বক্ষের ভিতর প্রবেশ করিয়া মরিয়া যাইবার ইচ্ছা করিতেছিল।

ক্ষীণ অস্ফুট স্বরে বিশাখা বলিল,—"আ'জ বড় নিভৃতে পাইয়াছি, দয়া করিয়া আমার প্রাণের জ্বালা শুনিবে কি ?"

অজিতনাথ বসিয়া পড়িলেন। তাঁহার মাথার উপর দিয়া একটা পেচক কর্কশকণ্ঠে ডাকিতে ডাকিতে চলিয়া গেল। বায়ু অগ্নিমূর্ত্তি হইয়া দিগন্ত ছুটিল,—কোথাকার দুইটি অনল-চক্ষু যেন আকাঙ্ক্ষিত-বুভুক্ষিত দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। অজিতনাথের

বামবাহু ও বামচক্ষু নৃত্য করিতে লাগিল। কিন্তু তখন আকর্ষণাগ্নি জ্বলিয়া উঠিয়াছে।

অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া অজিতনাথ বলিলেন,—"বিশাখা, তোমার কি প্রাণের জ্বালা আমায় বল ?"

দীর্ঘায়ত চক্ষুর স্থির ভাস্বর চাহনিতে অজিতনাথের মুখের দিকে চাহিয়া আবেগ-কম্পিত-কণ্ঠে বিশাখা বলিল,—"কি বলিব ? পোষা জ্বালা না হয় প্রাণেই থাক্। এ জ্বালা নয়—জীবনের শান্তিবারি। তুমি কি শুনিবে প্রভু ?"

দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া অজিতনাথ বলিলেন,—"রাক্ষসি, প্রাণতমে, আমার সর্ব্বনাশ করিলে ? কে বলে ব্রহ্মচর্য্য অভ্যাসে ইন্দ্রিয়সংযম হয় ? এইত মন—সর্ব্বেন্দ্রিয়ের প্রধান মন—একেবারে অবশ হইল ! বিশাখা,—বুঝিয়াছি, আমিও যেমন অবশ হইয়াছি, তুমিও তাহাই হইয়াছ। আমার জ্বালা সহিতাম, কিন্তু তোমার যন্ত্রণা সহিতে পারিব না। আমি ব্রহ্মচর্য্য বিসর্জ্জন দিয়া তোমাকে লইয়া সুখী হইব।"

কোথা হইতে গম্ভীর অশরীরী বাক্যে কে জিজ্ঞাসা করিল,—"কিন্তু দেশের কি হইবে ? সারা বঙ্গে যে তোমাকে নেতা করিয়া তোমার মুখ চাহিয়া রহিয়াছে।"

অজিতনাথ লাফ দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন,—কোথায় মনুষ্য-চিহ্নও নাই।

অজিতনাথ বিশাখার মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"বিশাখা কে কথা কহিল ?"

বি। জানিনাত প্রভু ?

অ। মানুষ বলিয়া বোধ হয় কি ?

বি। কৈ নিকটে ত কোন মানুষের চিহ্নও নাই। পরিষ্কার জ্যোৎস্না—যতদূর দৃষ্টি চলে, ততদূর দেখা যাইতেছে।

অ। নিশ্চয় কোন মানুষ হইবে। নতুবা কথা কহিবে কে? আমার বোধ হয়, কোন মনুষ্য আমাদের অনুসরণ করিয়াছে—সে হয়ত অলক্ষিতে কোন বৃক্ষ-কাণ্ডে আসিয়া বনের মধ্যে-লুকাইয়া আছে।

বি। যদি মনুষ্যেও কথা বলিয়া থাকে, তথাপিও ঐ কথা দৈববাণীর তুল্য। তুমি সমস্ত বঙ্গের নেতৃত্বপদ গ্রহণ করিয়াছ—দেবের সিংহাসন লাভ করিয়াছ। কেন প্রভু, সামান্য রমণীর জন্য সে সিংহাসন হইতে বিচ্যুত হইবে? কেন প্রভু, দাসীর জন্য দেবত্ব হারাইয়া নরত্বে আসিবে? তর্কালঙ্কার ঠাকুরের মুখে শুনিয়াছি,—নিঃস্বার্থ না হইলে দশের নেতা হওয়া যায় না। নিঃস্বার্থ ব্রহ্মচারীরই একচেটিয়া। তুমি কেন সে ব্রত পরিত্যাগ করিবে প্রভু?

অ। সে ব্রত পরিত্যাগ করিব কি বিশাখা, পরিত্যাগ করিয়াছি। যখনই প্রাণে কামনা-বাসনা জাগিয়াছে,—যখনই তোমার ঐ অনিন্দ-সুন্দর মুখখানা বুকের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে, তখনই আমার ব্রতভঙ্গ হইয়া গিয়াছে।

বি। ইহার আগে আমি মরিলাম না কেন?

অ। বিশাখা, তুমি মনে করিতে পার, একটা রমণীর সুন্দর মুখ দেখিয়া যে ব্রত মুহূর্ত্তে ভঙ্গ হইয়া যায়, তাহার মূল্যই বা কি, আর তাহার সারবত্তাই বা কি? কিন্তু বিশাখা, তোমার চেয়ে শত শত সুন্দরী দেখিয়াছি—শত শত গুণবতী কামিনী দেখিয়াছি, কখনও প্রাণে একটু দাগও লাগে নাই। দুই একটি সুন্দরী

যুবতীর প্রাণভরা ভালবাসা বা বাসনাকর্ষণ বিচ্ছিন্ন করিয়াছি, আর ভাবিয়াছি—জগতের প্রকৃতির স্নেহ-বাঁধনে আবদ্ধ—জড় দেখিয়া জড় উন্মত্ত—মনে মনে কত হাসি হাসিয়াছি। তখন ভাবিতাম ভালবাসা প্রকৃতির পোষমানান দূতী। কিন্তু সে গৌরব—সে ভাব তোমাকে দেখিয়া সব গিয়াছে। বুঝি, হৃদয়-খানা চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া তোমার চরণ-তলে মিশিয়া গিয়াছে। আমি আর ব্রহ্মচারী অজিতনাথ নহি—আমি বিশাখা-বল্লভ অজিতনাথ. বিশাখা আমার হবে কি ?

বি। আমি ? না না, আমি তোমার নহি। আমি হিন্দু রমণী—আমি যাহাকে ভালবাসি, তাহাকে কেন নিম্নে টানিয়া আনিব। শোন অজিতনাথ,—আ'জ প্রাণ খুলিয়া বলি—আমি তোমায় বড় ভালবাসি। এমন ভালবাসা বুঝি লোকে বাসিতে জানে না। কিন্তু তুমি আমাকে পাইবে না।

অ। তোমাকে পাইব না বিশাখা ?

বি। না।

অ। কেন, বিশাখা ?

বি। কেন,—তা বলিব না। তবে পাইবে না। আমি তোমার হইলে তোমার অনিষ্ট হইবে—ইহা বলাই যথেষ্ট।

অ। আর তোমায় না পাইলেও আমার ইষ্ট হইবে না বিশাখা, আমার যে সর্ব্বনাশ হইবার তাহা হইয়া গিয়াছে জগৎ জোড়া যে প্রেমের সাধনা করিয়া আসিয়াছি—তাহা ক্ষুদ্র বিশাখার জন্য বিক্রিত হইয়া গেল। অসীম সসীমে হারাইলাম—কিন্তু আর উপায় নাই—

বি। এক উপায় আছে।

অ। কি?

বি। আমার মরণ এ হৃদয়েও দাবানল জ্বলিয়াছে—তুমিও কৃপা করিয়া দাসীকে ভালবাসিয়াছ—এ অবস্থায় আমি কি করিব? না মরিলে তোমাকে রক্ষা করিতে পারিব না।

অ। হরি হরি,—ক্ষুদ্র বিশাখার যে দৃঢ়তা আছে, আমার তাহাও নাই। ভগবান্, মানুষ কি এতই দুর্ব্বল!

বিশাখা সেখানে আর দাঁড়াইল না। ব্যথিতা হরিণীর মত আর একবার ভাল করিয়া অজিতনাথের মুখের দিকে চাহিয়া সে চলিয়া যাইতেছিল। অজিতনাথ বলিলেন,—"এখন কোথায় যাবে বিশাখা?"

বিশাখা বলিল,—"জমিদার বাড়ী।"

অজিতনাথ বলিল,—"আর একদিন আমি আসিব। আমায় আর একদিন দেখা দিয়া তারপরে যাহা ইচ্ছা হয়, করিও। মরিও না বিশাখা,—তুমি মরিলে আমিও বাঁচিব না। মরিয়া মারিও না।"

বিশাখা সে কথার কোন উত্তর করিল না। উত্তর করিতে পারিল না বলিয়াই উত্তর করিল না। তাহার কণ্ঠ তখন বাষ্প-রুদ্ধ হইয়া গিয়াছিল।

ত্রিপঞ্চাশৎ পরিচ্ছেদ

বাস্তবিক একজন তাহাদের অনুসরণ করিয়াছিল। কিন্তু যে অনুসরণ করিয়াছিল, সে পূর্ব্বোক্ত কথা বলে নাই। যে অনুসরণ করিয়াছিল সে নীরদা।

নীরদা আম্রকাননের ছায়াতলে লুকাইয়া অজিনাথ ও বিশাখার সমস্ত কথা-বার্ত্তা শ্রবণ করিল। তাহার দানবী প্রতিহিংসানল আরও জ্বলিয়া উঠিল। সে মনে মনে বলিল,—"অজিতনাথ, এই তোমার ব্রহ্মচর্য্য—এই তোমার আত্মসংযম। আমি যে প্রাণভরা ভালবাসা লইয়া তোমার চরণে জড়াইয়া পড়িয়াছিলাম—আমার দলিত, মথিত ও অপমানিত করিয়া চলিয়া গিয়াছিলে—আর বিশাখা—দাসী বিশাখার চরণে ধরিয়া সাধিতেছ! আর বেশী দিন নয়—সত্বরেই তোমাকে ইহার প্রতিফল ভোগ করিতে হইবে।"

নীরদা দ্রুতপদে জমিদারবাড়ী চলিয়া গেল। তখনও রাত্রি অধিক হয় নাই। তখনও বাড়ীর লোকজনের আহারাদি সমাপ্ত হয় নাই। নীরদা মোহনলালের কক্ষে প্রবেশ করিল।

মোহনলাল তখন সুরাসেবন করিয়া রৌপ্যফর্শিতে সুগন্ধি তামাকুর ধূমপান করিতেছিল।

নীরদা বলিল,—"জামাই বাবু, আপনার স্ত্রী কোথায়?"

মোহনলাল কিঞ্চিৎ জড়িতস্বরে বলিল,—"এই মাত্র নিচেয় গেলেন।"

নী। আমি কিছু কথা বলিবার জন্য আসিয়াছি,—তোমার মন কি এখন সুস্থ আছে?

মো। না, যে আগুন তুমি জ্বালিয়া দিয়াছ—তাহাতে বুঝি জীবনে আর সুখী হইতে পারিব না।

নীরদা বুঝিল, মোহনলালের তাদৃশ নেশা হয় নাই। আরও বুঝিল, বাস্তবিক সে যে উপায় অবলম্বন করিয়াছে, তাহা ব্যর্থ হয় নাই। যে ঔষধ দিয়াছে, তাহার ক্রিয়ারম্ভ হইয়াছে। নীরদা কৃত্রিম অভিমানস্বরে বলিল,—"জামাই বাবু আমি আগুন জ্বালিয়া দিয়াছি? তবে আর কোন কথা বলিব না। আমি যাহা দেখিয়া ব্যথিত হইয়াছি—তাহাই বলিয়াছি—আমি যাহা দেখিয়া প্রাণে প্রাণে কষ্ট পাইয়াছি,—তাহাই বলিয়াছি। যদি তাহাতে অন্যায় করিয়া থাকি—ক্ষমা করিও, আর বলিব না।"

মো। না না, তোমার কি অপরাধ? তুমি আমার ভালই করিয়াছ; কিন্তু—

নী। কিন্তু কি জামাইবাবু? কিন্তু তুমি তাহার প্রমাণ চাও, এই ত?

মো। না না,—আর প্রমাণ চাই না। প্রমাণ আমি নিজেই পাইয়াছি।

নী। কি প্রমাণ পাইয়াছ, জামাইবাবু?

মো। মহামায়া তাহাকে ভালবাসে, তাহা মহামায়ার কথাতেই বুঝিয়াছি। তাহার গুণ-গানে মহামায়ার প্রাণে যেন অত্যন্ত আনন্দ হয়। হতভাগিনী এইমাত্র আমার নিকটে সে পাপাত্মার সহস্র প্রশংসা করিয়া গেল।

নী। আপনি কি বলিলেন?

মো। আমি ভাল-মন্দ কিছুই বলি নাই। এখন কিছু বলিব না। দেখি,—একটা উপায় আমি স্থির করি।

নী। হাঁ, কিন্তু—কি বলিতেছিলে?

মো। বলিতেছিলাম কি—আমার অবস্থা এখন শোচনীয়। শরীরে সামর্থ্য নাই—এই সময় এই সর্ব্বনাশকর কাজ চক্ষুর উপরে দেখিতে হইল। এবাড়ী মহামায়ারই বাপের বাড়ী—এখানে আমার কেহ নাই,—যে এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত জন্য—প্রতিফল প্রদান জন্য আমার সহায় হইবে।

নী। তুমি কি মহামায়াকে হত্যা করিতে চাও?

মো। না না, আগে মহামায়াকে নয়,—আগে সেই পাপাত্মাকে, তারপরে মহামায়াকে।

নী। আমি তোমার সহায় হইব।

মো। তুমি? বিশ্বাস হয় না। তুমি স্ত্রীলোক হইয়া কেন একাজে যাবে?

নী। যাব,—আমি ব্যভিচার দেখিতে পারি না।

মো। বাধিত হইলাম। কিন্তু আর একজন চাই।

নী। কেন?

মো। একা তুমি কি করিবে? তাহার গায়ে অসুরের বল।

নী। তুমি কি আমার কিছুমাত্র সাহায্য করিতে পারিতে না?

মো। তা পারিব।

নী। তবে আজ যাই,—পরামর্শ আর একদিন হবে।

মো। আমিও তাহাকে বাগুরায় জড়াইয়া লইব। সে আমার ফাঁদে পড়িবে। মহামায়াকে দিয়া তাহাকে নিকটে লইব—অথবা তাহার সহিত বন্ধুত্ব করিয়া যে স্থানে ইচ্ছা লইয়া যাইব।

নীরদা চলিয়া গেল।

নীরদা চলিয়া গেলে কিঞ্চিৎ পরে মহামায়া আসিল।

মহামায়া স্বামীর নিকটে উপবেশন করিয়া অতি প্রশান্ত স্বরে বলিল,—"তোমার শরীর এখন কেমন আছে? আজ আর বেদনা ধরে নাই ত?"

মোহনলাল কিঞ্চিৎ রুক্ষস্বরে বলিল,—"না।"

ম। ভগবান্ তোমার রোগ আরোগ্য করুন। তোমার জন্যে আমার বড়ই ভাবনা হইয়াছে।

মো। আমার জন্যে তোমার কিসের ভাবনা?

ম। ভাবনা অনেক,—তোমার অসুখ দেখিয়া আমার বুকের রক্ত জল হইয়া যায়। মদেই এই সর্ব্বনাশ ঘটিয়াছে—তুমি কিন্তু মদ ছাড়িবে না!

মো। আমার অসুখ—আমার যন্ত্রণা, তা তোমার বুকের রক্ত জল হয় কেন?

ম। কেন হয়,—তুমি পুরুষ, মানুষ, তুমি তা বুঝিবে কেমন করিয়া? রমণীর বেদনা রমণী বুঝে।

মো। রমণী? রমণী নরকের মূল! রমণী পুরুষের সর্ব্বনাশ করিবার একমাত্র দ্বার স্বরূপ।

ম। এতদিন পরে কি তাহা বুঝিয়াছ? সেই রমণী আর সুরা লইয়া তোমার খেলা! যদি তখন বুঝিতে তবে এখন এমন সর্ব্বনাশ হইত না।

মোহনলাল সে কথার কোন উত্তর করিল না। মহামায়া ভাবিল, তাহার স্বামীর কৃতকর্ম্মের জন্য অনুতাপ হইতেছে। সমবেদনা ও সহানুভূতির স্বরে মহামায়া বলিল,—"জগাই মাধাই

উদ্ধার হইয়াছিল,—তুমিও উদ্ধার পাইবে। প্রাণ ভরিয়া ভগবান্‌কে ডাক,—তিনি পাপীর বন্ধু, অসহায়ের সহায়। অজিতনাথ—ব্রহ্মচারী অজিতনাথ পুণ্যাত্মা লোক,—তিনি তোমাকে সদুপদেশ দিবেন।”

মোহনলাল বিরক্তি-স্বরে বলিল,—“আমি অনেক সদুপদেশ জানি।”

ম। কিন্তু একটি আত্মাকে উন্নত করিতে হইলে আর একটি আত্মার প্রয়োজন। তাই গুরুর আবশ্যক।

মো। অজিতনাথকে তুমি গুরু করিয়াছ—তাতেই যথেষ্ট হইয়াছে। আমি অন্য লোক দেখিব।

ম। যদি তাঁহাকে পছন্দ না হয়, তর্কালঙ্কার ঠাকুরের নিকট উপদেশ লও। কিন্তু অজিতনাথের মত লোক আর হয় না।

মো। তুমি উঠিয়া যাও।

ম। কেন, তোমার কি এ সকল কথা ভাল লাগে না?

সহসা মোহনলালের মুখভাব পরিবর্ত্তিত হইল। যেন একটি নূতন চিন্তা তাঁহার মস্তিষ্কে স্ফূর্ত্তি পাইল। তিনি বলিলেন,—“অজিতনাথ কবে আসিবে?”

ম। দুই চারি দিনের মধ্যেই আসিবেন।

মো। খুব নিভৃতে তাঁহার সহিত আমার কয়টি কথা আছে। যদি তিনি আমার সন্দেহ ভঞ্জন করিতে পারেন—আমার প্রাণের পিপাসার শান্তি করিতে পারেন, আমি তাঁহার মত গ্রহণ করিব।

ম। নিশ্চয় পারিবেন। এই ঘরে তিনি আর তুমি দুইজনে বসিয়া ধর্ম্মালোচনা করিও। তুমি যদি মদ ছাড়, ধর্ম্মপথে যাও—

তোমার আমার হৃদয়ে শান্তি ফিরিবে, দানবের রাজত্ব দূর হইয়া দেবতার প্রতিষ্ঠা হইবে।

মো। তবে তাহাই হইবে,—অজিতনাথকে আমার নিকটে পাঠাইয়া দিও।

মহামায়া দেখিতে পাইল না,—কিন্তু কথা কয়টি বলিতে বলিতে মোহনলালের দন্তে দন্ত নিষ্পেষিত হইয়াছিল। চক্ষু দিয়া প্রতিহিংসার অনল ঝলসিয়া গিয়াছিল।

মহামায়া স্বামীর কথায় পরমানন্দিত হইয়া নীচের নামিয়া গেল। তাহার স্বামী অসৎপথ হইতে সৎপথে আসিবে—অধর্ম্মের রাজত্ব ছাড়িয়া ধর্ম্মের রাজ্যে প্রবেশ করিবে—তাহার আর আনন্দ ধরে না।

চতুঃপঞ্চাশৎ পরিচ্ছেদ।

মোগলসৈন্য সমস্ত বঙ্গদেশ ছাইয়া পড়িল। বঙ্গবাসিগণও নিশ্চিন্ত ছিল না,—তর্কালঙ্কার ঠাকুর স্বদেশসেবকের দল লইয়া দক্ষিণ বঙ্গে তুমুল সংগ্রাম-সাগরে মাতিয়াছেন,—তাঁহার প্রচণ্ড বেগে মোগলসৈন্য টিকিতে পারিতেছে না।

মধ্যবঙ্গে শঙ্কর নিজে বহু স্বদেশসেবককে লইয়া ভীষণবলে স্বদেশ রক্ষা করিতেছিলেন।

অজিতনাথ প্রধান নেতা,—অজিতনাথ মা বলিয়া ডাকিলে যে প্রবাহ উত্থিত করিতেন, যে উচ্ছ্বাস উঠিয়া পড়িত—তাহা আর হইতেছে না, তাঁহার প্রাণ স্বার্থ-কালিমায় সমাচ্ছন্ন হইয়া

পড়িয়াছে। অসীম প্রেম ক্ষুদ্র স্বার্থের পূতিগন্ধময় কামে পরিণত হইয়াছে। অজিতনাথের নেতৃত্বে কাজ ভাল হইতেছে না। মোগলসৈন্য অজিতনাথের সীমায় প্রবলবলে কার্য্য করিতে লাগিল,—দিন দিন গ্রাম সকল লুণ্ঠিত হইতে লাগিল।

অজিতনাথ সে সকল বিষয় চিন্তা করিবার সময় পাইতেন না। তাঁহার হৃদয়ের একমাত্র চিন্তা বিশাখা। যেখানে সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা মাতৃ-ভূমির মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল,—সেখানে ক্ষুদ্র বিশাখার ক্ষুদ্র মূর্ত্তি। যে হৃদয়ে সমস্ত বাঙ্গালার কল্যাণ-কামনা বর্ত্তমান ছিল, সেখানে বিশাখার সুখের কামনা জাগিয়া বসিয়াছে। যেখানে বরাভয়করা নৃমুণ্ডমালিনী করালকালিকার মহাশক্তি মূর্ত্তি ছিল, সেখানে কামকলা কামিনীর কামকলুষিত মূর্ত্তি প্রবেশ করিয়াছে,—কাজেই যে আবেগে স্বদেশসেবকগণ প্রাণ দিতে যাইত, সে আবেগ আর নাই, যে কথায় জীবন দিয়াও দেশের লোক পশ্চাৎপদ হইত না, সে কথা আর নাই; যে প্রতিভা ফুটিয়া মানব-মানসে অপার প্রতিভা-প্রবাহ ছুটাইত, তাহা নিবিয়া গিয়াছে। এক কথায় দেবতা অজিতনাথ,—মানুষ অজিতনাথ হইয়া গিয়াছে।

একদিন সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে এক বকুল বৃক্ষের তলদেশে বসিয়া অজিতনাথ গভীর চিন্তা করিতেছিল; সেই দিন কৃষ্ণ-গোবিন্দবাবুর বাড়ী যাইবার দিন বা যাইবার কথা ছিল।

অজিতনাথ একান্তে বসিয়া চিন্তা করিতেছিল। চিন্তা করিতেছিল,—আমার কি হইল, প্রাণান্তিক পরিশ্রম করিয়া বিবেক-বুদ্ধির সহিত পিশাচ-বুদ্ধির এত সংঘর্ষ সাধনা করিয়া কিছুতেই আত্মরক্ষা করিতে পারিলাম না। প্রাণের আকুল-

আকাঙ্ক্ষা কিছুতেই বিদূরিত হইল না। হায়, আমার চিত্ত এমন হইল কেন? ভগবান্‌কে কত ডাকিলাম,—আগে ডাকিলে সাড়া পাইতাম, এখন, একবিন্দু কৃপাও পাইলাম না,—প্রাণ বাঁধিবার শক্তিটুকুও ফিরিয়া আসিল না। কেহ চাহিল না,—কোন শক্তির সহায়তা পাইলাম না। হায়, বিশাখা; আমার সর্ব্বনাশ করিলে? দেশে মহাযুদ্ধ উপস্থিত—আর আমি তোমার চিন্তায় বিভোর! তোমার চিন্তায় ব্রহ্মচর্য্য ব্রত হারা হইয়া সর্ব্বকার্য্যে অকৃতকার্য্য হইতেছি।

অজিতনাথ একবার ভাবিল, যুদ্ধ করিয়া এ মহাসমরে মরণই ভাল,—আর বিশাখার নিকটে যাইব না। আবার সে চিন্তা—সে যুক্তি ভাসিয়া গেল, আর একবার—একটি বারের জন্য বিশাখাকে দেখিয়া আসিয়া মরিতে হইবে। নতুবা মরণের পরেও বিশাখার আকর্ষণে ঘুরিতে হইবে।

যেমন এই কথা ভাবা, অমনি উঠিয়া অজিতনাথ চলিয়া গেল।

কৃষ্ণগোবিন্দবাবু সংবাদ পাইয়াছিলেন, অজিতনাথ সেইদিন তাঁহার বাড়ী আগমন করিবেন। তিনি ভাবিয়া-চিন্তিয়া এক পরামর্শ আঁটিয়া রাখিয়াছিলেন। অজিতনাথকে পরাভূত বা নিহত করিতে পারিলে, তিনটি কার্য্য সমাধা হয়। প্রথমতঃ মোগল-সম্রাটের নিকট প্রতিপত্তি লাভ হয়, দ্বিতীয়তঃ পিতৃ আদেশ পালন করা যায়, তৃতীয়তঃ নিজ প্রতিষ্ঠা পুনঃ স্থাপিত হয়।

অজিতনাথকে তাঁহার বাড়ীতে আবদ্ধ করিয়া নিহত করিলেও অজিতনাথ আত্মরক্ষা করিতে পারে না, কিন্তু দেশের লোকে

তাহা হইলে তাঁহাকে নিহত করিবে। যদিও মোগল-সৈন্য যুদ্ধারম্ভ করিয়াছে,—যদিও মোগল-শক্তি জয়লাভ করে, তথাপি দেশের লোক ত দেশে থাকিবেই,—অজিতনাথকে নিহত করিলে তাঁহার জীবন বা প্রতিষ্ঠা নিরাপদ হইবে না। তবে—কৌশলে সে কার্য্য সাধন করিতে হইবে। সে কৌশল তাঁহার পিতৃ-আদেশ। কৃষ্ণগোবিন্দবাবু তাহারই উদ্যোগ-আয়োজন করিয়া রাখিলেন।

অজিতনাথ প্রায় রাত্রি চারি দণ্ডের পর কৃষ্ণগোবিন্দবাবুর বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। কৃষ্ণগোবিন্দ তাঁহাকে মহাসমাদরে অভ্যর্থনা করিলেন। মহাসমাদরে সে রাত্রে সেখানে থাকিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। অজিতনাথও আনন্দের সহিত স্বীকৃত হইলেন। দ্বিতীয় মহল্লায় এক সুসজ্জিত প্রকোষ্ঠে তাঁহার বাস-স্থান নির্দ্দিষ্ট হইল। বিশাখা সেখানকার পরিচর্য্যার ভার প্রাপ্ত হইল।

অজিতনাথ তাহাতে আরও আনন্দিত হইলেন। ক্ষণেক ধরিয়া বিশাখার অপ্সরা-রূপের জলন্ত জ্যোতি দর্শন করিয়া, তাহার সহিত ক্ষণেক ধরিয়া বিশ্রম্ভালাপ করিয়া বাটীর মধ্যে কর্ত্রীঠাকুরাণীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন। তৃতীয় মহল্লায় অর্থাৎ অন্দর মহলে প্রবেশ করিতে মহামায়ার সহিত অজিত-নাথের সাক্ষাৎ হইল। দরোজার শীর্ষদেশে আলো জ্বলিতেছিল,—সে আলোকে সমস্ত প্রাঙ্গণতল উদ্ভাসিত ছিল। মহামায়া অজিতনাথকে গুরুস্বরূপ দর্শন করিত। অজিতনাথের দর্শন পাইবামাত্র সে প্রণাম করিল। তারপরে দাঁড়াইয়া স্বাগত প্রশ্নাদি করিল।

নীরদা সংবাদ রাখিয়াছিল যে, অজিতনাথ অন্দর মধ্যে যাই-তেছে,—তাই সে তাড়াতাড়ি উপরে উঠিয়া তাঁহার গতি লক্ষ্য করিতেছিল। যেই সে প্রাঙ্গণে মহামায়া ও অজিতনাথকে দাঁড়াইতে দেখিল, অমনি ছুটিয়া মোহনলালের কক্ষে প্রবেশ করিল, এবং মোহনলালকে উপরের গবাক্ষ হইতে দেখাইল যে,—উভয়ে প্রেমালাপ করিতেছে। আগে হইতে সে পঙ্কিল পাপময় চিত্তে যে দাগ লাগিয়া উঠিয়াছিল, এখন তাহা পূর্ণরূপে ঘনকালিমায় সমাচ্ছন্ন হইল। মোহনলাল থর থর কাঁপিতে কাঁপিতে আপন শয্যায় উপবেশন করিল,—তারপরে নীরদা ও মোহনলাল উভয়ে অনেকক্ষণ বসিয়া বসিয়া এক পরামর্শ আঁটিল।

মহামায়া ও অজিতনাথ কর্ত্রীঠাকুরাণীর সহিত সাক্ষাৎ করিল, তারপরে তাঁহার আদেশানুসারে উভয়ে মোহনলালের কক্ষে চলিয়া গেল।

মহামায়া ও অজিতনাথ একত্রে—একসঙ্গে মোহনলালের নিকটে গমন করিল। সে দৃশ্য দেখিয়া মোহনলাল আরও জ্বলিয়া উঠিল। কোন প্রকারে আত্মসংযম করিয়া বলিল,—"আসুন মহাশয়, আপনার আগমন-প্রতীক্ষায় বসিয়া আছি।"

মহামায়া একখানা কম্বলাসন টানিয়া পাতিয়া দিল, অজিত-নাথ তদুপরি উপবেশন করিল। মোহনলালের সঙ্গে অনেক কথা হইল,—মোহনলাল হৃদয়ভাব গোপন করিয়া, বলিল—"একদিন নিভৃতে আপনাকে কতকগুলি কথা বলিব—আপনি সে গুলি শুনিবেন, তারপরে আমি আপনার নিকটে ধর্ম্মোপদেশ গ্রহণ করিব।"

অজিতনাথ সে কথায় স্বীকৃত হইল। তারপরে তথা হইতে উঠিয়া গেল।

আহারাদির পরে—যখন প্রতি কক্ষের প্রদীপ ক্ষীণরশ্মি হইল,—যখন কক্ষে কক্ষে নর নারী সকল সুষুপ্তির ক্রোড়ে শান্তি-সুখ উপভোগ করিতে লাগিল। তখন অজিতনাথের নির্দ্দিষ্ট কক্ষে বিশাখা ও অজিতনাথের কথোপকথন হইতেছিল। বিশাখা ও অজিতনাথ উভয়ে স্বাধীনতা পাইয়া এই গুপ্তমিলনের সুযোগ প্রাপ্ত হইয়াছিল। অদৃষ্ট বা ভবিতব্যতার নিগ্রহে অজিতনাথের প্রতিষ্ঠিত ব্রহ্মচর্য্যের বিচ্যুতি ঘটিল।

সেই রাত্রে কৃষ্ণগোবিন্দ বাবু স্বপ্নে তাঁহার পিতৃ-মূর্ত্তি দর্শন করিলেন। সে মূর্ত্তি তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়াছিল। কিন্তু পরদিন প্রভাতে অজিতনাথ যখন তাঁহার নিকটে বিদায় চাহিতে গেল, তখন তিনি বিদায় দিতে পারিলেন না—অজিতনাথের যে অধঃপতন এত শীঘ্র হইয়াছে, তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন না। অজিতনাথকে সেদিন থাকিয়া যাইবার জন্য অনুরোধ করিলেন।

অজিতনাথও তখন তাহাই চায়—অজিতনাথ স্বদেশ, স্বজাতি ও স্বধর্ম্মের কথা ভুলিয়া গিয়াছে। বিশাখার রূপের আগুনে আত্মবিক্রয় করিয়াছে। অজিতনাথ সেদিনও সেখানে অতি-বাহিত করিল।

সন্ধ্যার পরে মহামায়া এক দাসী পাঠাইয়া দিয়া অজিতনাথকে ডাকিয়া স্বামীর গৃহে লইয়া গেল। তারপরে সেখানে অজিত-নাথকে পঁহুছাইয়া দিয়া, সে তথা হইতে প্রস্থান করিল।

মোহনলাল বলিল,—"ঠাকুর, জীবনের প্রায় শেষ হইয়া

উঠিয়াছে, এখন ধর্ম্ম করাই কর্ত্তব্য; কিন্তু ব্যাপার আছে—তাহা মুখে বলিব না। আপনি আমার সঙ্গে যদি যাইতে পারেন, আমি আপনাকে দেখাইব—তারপরে স্বচক্ষে তাহা দেখিয়া তাহার যে ব্যবস্থা হয় করুন—অবশেষে আমি আপনার শিষ্য হইব।

অ। কোথায় যাইতে হইবে?

যো। এবাড়ীর পশ্চাৎ সংলগ্ন উদ্যানে।

অ। এখনি যাইবে কি?

যো। সকলে নিদ্রা যাক্—একটু রা'ত হোক্, আপনাকে ডাকিয়া লইয়া যাইব।

অ। তবে তাহাই।

যো। এখন আপনি যান,—আমি দ্বিতীয় মহল্লার দরোজার নিকটে গিয়া বাঁশী বাজাইব, আপনি উঠিয়া আসিবেন। কাজটা গোপনীয়—বুঝিয়াছেন ত? আপনাকে গোপনেই দেখিতে শুনিতে হইবে।

"তা" বুঝিয়াছি। এই বলিয়া অজিতনাথ উঠিয়া গেলেন।

পঞ্চপঞ্চাশৎ পরিচ্ছেদ।

রাত্রি দ্বিপ্রহর দরোজার নিকটে বাঁশী বাজিল,—অজিতনাথ উৎকর্ণ হইয়াছিল,—ব্যাধ-বাদিত বংশী-রবে হরিণের ন্যায় সে বাঁশী শ্রবণে অজিতনাথ উঠিয়া গেল। যাত্রাকালে গৃহকোণে একটা টীকটিকি বড় জোরে ডাকিয়া উঠিয়াছিল।

দরোজার নিকটে মোহনলাল দাঁড়াইয়াছিল, সে আগে আগে গেল, মোহনলাল তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিল।

নিভৃত উদ্যান। আকাশে অষ্টমীর চাঁদ উঠিতেছিল,—বিধবার হাসির মত ক্ষীণ জ্যোৎস্না উদ্যানের উপর পড়িয়া কুঞ্জে কুঞ্জে যেন কোন সুখের বাসরের অতীত স্মৃতিকে অন্ধকার হইতে খুঁজিয়া বাহির করিতেছিল। আকাশে বাতাস নিস্তব্ধ—অসংখ্য তারকা অবাক্ হইয়া মর্ত্ত্যের মুখপানে চাহিয়া ছিল।

মোহনলাল ও অজিতনাথ দ্রুতপদে উদ্যানমধ্যস্থ একটা কুঞ্জ-বীথিকায় উপস্থিত হইল। সেখানে একটি স্ত্রীমূর্ত্তি দাঁড়াইয়াছিল,—সে নীরদা। নীরদার মূর্ত্তি ক্ষুধিত ব্যাঘ্রীর মত। চক্ষু দুইটা হিংসার আগুনে জ্বলিতেছিল।

নীরদা ব্যাঘ্রের বিকট হাসি হাসিয়া বলিল,—"এস এস, ব্রহ্মচারী ঠাকুর! একদিন এহৃদয়ের পূর্ণতম ভালবাসা লইয়া ঐ পুকুরের পাড়ে তোমার পায়ে ধরিয়া সাধিয়াছিলাম—পায়ে জড়ান কাঁটার মত দূরে ফেলিয়া দিয়াছিলে, আর আজ বিশাখাকে লইয়া কি কাণ্ড করিতেছ? প্রতিহিংসা—প্রতিহিংসার আগুন নিবাইব—"

মোহনলাল অধিকতর রুক্ষস্বরে বলিল,—"পাপাত্মা, ভণ্ড, কুলকামিনীর প্রণয়-ইচ্ছা। এখনও মোহনলাল মরে নাই। কৌশল করিয়া এখানে আনিয়াছি—এইবার প্রতিফল নে।"

মোহনলাল তরবারি উঠাইল। মুহূর্ত্তমধ্যে অসুর-বলে তাহা কাড়িয়া লইয়া, ক্ষিপ্র গতিতে অজিতনাথ নীরদার হস্ত হইতে বন্দুক কাড়িয়া লইল। মোহনলালকে ধাক্কা মারিয়া ফেলিয়া দিয়া অজিতনাথ পলায়ন করিতেছিল, কিন্তু পারিল না।

সম্মুখে এক দীর্ঘকায় পুরুষ, ক্ষুধিত ব্যাঘ্রের মত দণ্ডায়মান,—তাহার বুভুক্ষিত • দানবী চক্ষুদ্বয় জ্বলিতেছে—দূরস্থ অস্ফুট আলেয়াদীপ্তির মত একরূপ আলোক নির্গত হইয়া চতুর্দ্দিক্ আলোকিত করিতেছিল।

উন্মত্ত ঝটিকার ন্যায় অজিতনাথ ছুটিয়া অন্যদিক্ দিয়া পলায়ন করিতে চেষ্টা করিলেন,—সে মূর্ত্তি আসিয়া তাঁহার হাত চাপিয়া ধরিল। সে হস্ত শীতল অস্থিময়—গোরস্থান হইতে যেরূপ সিক্ত বাষ্পময় শৈত্য উত্থিত হয়, সেইরূপ মৃত্যু-গন্ধি স্বেদবিন্দুযুক্ত।

অজিতনাথ উন্মত্তের মত চীৎকার করিয়া ডাকিল—"ভগবান্, আমায় রক্ষা কর।"

সে মূর্ত্তি এবার স্বীয় অপ্রচ্ছন্ন কণ্ঠে কথা কহিল,—সে স্বরে যেন সমস্ত নরক গর্জ্জন করিয়া উঠিল, বলিল,—"তুমি ডাকিলে ভগবান্ সুদর্শনচক্র লইয়া তোমায় রক্ষা করিতে আসিবেন, সে দিন তোমার আর নাই। এতদিন তোমার সে দিন ছিল বলিয়া তোমার কিছু করিতে পারি নাই। দীর্ঘ দিবস হৃদয়ে প্রতিহিংসার আগুন লইয়া বিদেহী অবস্থায় নরকযন্ত্রণা লইয়া ছুটিয়া ছুটিয়া বেড়াইতেছি। তুমি এরমধ্যে দুইজন্ম লাভ

করিয়াছ—আমি তোমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিতেছি। তোমার প্রবল বল ছিল, তাই কিছু করিতে পারি নাই। এখন তুমি স্বেচ্ছায়—সাধ করিয়া আপনার দুরদৃষ্ট বাছিয়া লইয়াছ—তাই আমি আমার হৃদয়ের প্রতিহিংসা সাধনের সময় পাইয়াছি। একবার তুমি আমায় হত্যা করিয়াছ—প্রায়শ্চিত্তের সময় দাও নাই, আত্মশুদ্ধির অবসর দাও নাই—অরক্ষিত অবস্থায় আমাকে মৃত্যুর অন্ধকারে অতর্কিতে ফেলিয়া দিয়াছিলে—আ'জ আর তাহা পারিবে না। আ'জ আমি বিদেহী—অবদ্ধ—প্রেত! ঐ দেখ, সেই আমার বুকের রক্তমাখা ছোরা। নীরদা! সে জন্মের চন্দ্রকলা—ছোরা নাও, পাপাত্মার বুকে আমূল বিদ্ধ কর।”

আবিষ্টার ন্যায় নীরদা সম্মুখ-পতিত একখানা ছোরা কুড়াইয়া লইল।

অজিতনাথের ধমনীর রক্ত শীতল হইয়া যাইতে লাগিল। অজিতনাথ চীৎকার করিয়া বলিল,—“আমি তোমার কি করিয়াছি—আমায় কেন মার?”

সে মূর্ত্তি বলিল,—“এজন্মে কিছু কর নাই। কিন্তু আর এক জন্মে আমায় হত্যা করিয়াছিলে—এখনও আমার বুকে সে ক্ষত চিহ্ন আছে। এ নীরদা,—তোমার ছোরা পাষণ্ডের বুকে বসাইয়া দাও। কে আছ—কে আছ মরণের-নরকের ভীষণ কিঙ্কর। এই অন্ধকার মায়া-যবনিকা অপসৃত কর—এই পাষণ্ডকে বুঝাইয়া দাও, মানুষ মরিলেই মরিয়া যায় না।”

কোন্ আকর্ষণে আকর্ষিত হইয়া নীরদা আসিয়া সেই ছোরা অজিতনাথের বক্ষে বসাইয়া দিল। সেই ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি লাফাইয়া অজিতনাথের কণ্ঠ জড়াইয়া ধরিল। অজিতনাথ বুঝিল, মৃত্যু

আসিয়া তাহার কণ্ঠরোধ করিল—সে ঢলিয়া মাটিতে পড়িয়া গেল।

সে মূর্ত্তি তখন মেঘ-মন্দ্রস্বরে বলিল—"যাও নীরদা, গৃহে যাও, এতদিনে "প্রেত তর্পণ" হইল। এই পাষণ্ডের রক্তে আমার প্রতিহিংসানল নির্ব্বাপিত হইল,—এক্ষণে আমি ঊর্দ্ধরাজ্যে যাইতে পারিব। মুহূর্ত্তে সে মূর্ত্তি অদৃশ্য হইল।

এত কাণ্ড হইয়া গেল,—নীরদা ভাল করিয়া তাহার কিছুই বুঝিতে পারিল না,—কেমন আবিষ্টের মত, সে এসকল কার্য্য দেখিয়া শুনিয়া গেল। কেমন স্বপ্নের মত এতটা ব্যাপারে তাহার জ্ঞান আসিল। তার পরে যখন সব নীরব হইল,—মোহনলালের চৈতন্ত হইল, তখন তাহারও জ্ঞান হইল।

এই সময় কৃষ্ণগোবিন্দ বাবু উদ্যানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি এক অস্বাভাবিক চীৎকার শুনিয়া সেখানে আসিয়াছিলেন।

জ্যোৎস্নালোকে দেখিলেন, উদ্যান-তলে অজিতনাথের দেহ পড়িয়া রহিয়াছে—তখনও সেই বলিষ্ঠদেহের বক্ষঃস্থল দিয়া রক্ত-ধারা গড়াইয়া পড়িতেছিল।

কৃষ্ণগোবিন্দবাবুকে দেখিয়া নীরদা চমকিয়া উঠিল। কি বলিতে যাইতেছিল, কৃষ্ণগোবিন্দবাবু বলিলেন,—"কিছুই বলিতে হইবে না, এরূপ যে ঘটিবে, আমি তাহা পূর্ব্ব হইতে জানিতাম।"

নীরদা বলিল,—"আপনি কি এ পুরুষকে চেনেন? অমন আশ্চর্য্য শক্তিশালী মানুষ আমি আর কখনও দেখি নাই। কেন তাঁহার কথা শুনিলাম, কেন তাঁহার আদেশে অজিতনাথকে খুন

করিলাম,—তাহা বুঝিতে পারি নাই। তিনি কোথা দিয়া আসিলেন, কোথায় চলিয়া গেলেন, তারও কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। অত বড় বলিষ্ঠ অজিতনাথ সেই পুরুষের স্পর্শমাত্র যেন গলিয়া গেল,—আপনি কি তাঁহাকে চেনেন ?”

কৃ। হাঁ চিনি,—তিনি প্রেত, বিদেহী,—আমাদের এ জগতের লোক নহেন।

নী। আপনি কিপ্রকারে এসব ঘটনা ঘটিবে তাহা জানিতে পারিলেন ?

কৃ। ঐ প্রেত-মূর্ত্তি আমাকে বলিয়াছিলেন। তোমার সহিত বিশাখার সহিত, অজিতনাথের সহিত আর ঐ প্রেতের সহিত পূর্ব্বজন্মের একটা ঘটনা ছিল,—সেই ঘটনাতেই এই কাণ্ড ঘটিয়া গেল।

নী। আপনি যদি জানেন, তবে আমাকে বলিয়া আমার কৌতূহল নিবারণ করুন।

কৃ। সকল কথা বলিব না,—সংক্ষেপে এবং কতকাংশ বলিতেছি শোন,—পূর্ব্ব জন্মে বিশাখা, তুমি এবং অজিতনাথ মথুরা জেলার মানুষ ছিলে। বিশাখা অজিতনাথের পত্নী ছিল,—তুমি অজিতনাথের উপর অত্যন্ত আসক্তা ছিলে,—অজিতনাথ কৃষ্ণভক্ত ছিল। তোমার স্বামী ছিল—ঐ প্রেত। ঐ প্রেতের দুই বিবাহ ছিল। তারপরে তোমার আসক্তির আকর্ষণে ক্রমে অজিতনাথ তোমার প্রণয়ী হয়,—তোমরা দুইজনে ঐ প্রেতকে সে জন্মে নিহত কর। অজিতনাথই সে কার্য্যের অধিনায়ক। তারপরে আর এক জন্ম কাটিয়া গিয়াছে,—সে জন্মে সকলেই দূরে। দ্বিতীয় জন্মে এক আভিরিণীর গর্ভে ঐ প্রেতের

মানবজীবনকালে—উঁহার ঔরসে অবৈধমিলনে বিশাখার উৎপত্তি। ইহার কারণ, পূর্ব্ব জন্মের মিলনে—যখন তোমাতে অজিতনাথেতে অবৈধমিলন—তখন বিশাখা স্বামীর প্রতি ঘৃণা করিয়াছিল।

অজিতনাথ কৃষ্ণভক্ত ছিল বলিয়া ব্রহ্মচারী,—সেই বলে এতদিন প্রেত উহার কিছু করিতে পারে নাই। কিন্তু পাপ-কর্ম্ম ফলদানের জন্য পশ্চাৎ পশ্চাৎ ঘুরিতেছিল—সময় পাইয়া সব করিয়া গেল।

আমি আগে জন্মান্তর, ভূতপ্রেত মানিতাম না—মানিলে এত অধঃপতন আমার হইত না। এখন গৃহে যাও।

নীরদা ও মোহনলাল গৃহে চলিয়া গেল। কৃষ্ণগোবিন্দও গৃহে গিয়া অজিতনাথের দেহ প্রোথিত করিবার ব্যবস্থা করিলেন।

বিশাখা সব কথা শুনিল, শুনিয়া সে মাটীতে পড়িয়া লুটিয়া লুটিয়া অজিতনাথের জন্য ক্রন্দন করিল। হায়, সে হতভাগী যদি সে মূর্ত্তির কথা শুনিয়া আত্মদান করিতে পারিত,—সে যদি অজিতনাথের সহিত মিলনের পূর্ব্বে মরিতে পারিত, তবে অজিতনাথকে অকালে কালের কবলে চলিয়া পড়িতে হইত না,—স্বদেশসেবকগণের নেতাও স্বার্থের আগুনে পুড়িয়া নরকে যাইত না।

ব্যাকরণের মতে 'নর' শব্দের উত্তর অল্পার্থক, 'ক' প্রত্যয় করিলে 'নরক' হয়। সংসারে যে নরত্বে অল্পতা আনিয়াছে—যে ক্ষুদ্রত্বের সাধনায় জীবন উৎসর্গ করিয়াছে,—সেই নরক। তাহার ধমনীর ভিতরেই তপ্ত বৈতরণী বহিয়া যায়। যত আহার—যত পানীয়ই তাহার আধ্যাত্মিক গৃহে সঞ্চিত থাকুক না কেন,—

তাহার আত্মা চিরদিনই পিপাসাময় উপবাসে কাঁদিয়া বেড়ায়।—তাই অজিতনাথের পুণ্যাত্মা স্বার্থে—ক্ষুদ্রত্বে প্রেততর্পণে নরকের পথে চলিয়া গেল।

তাহারই মহাপাতকে সমস্ত বঙ্গে পুনরায় মোগলশাসন প্রতিষ্ঠিত হইল,—স্বদেশসেবকগণ পুনরায় অধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইল। তবে স্বদেশানুরাগ বৃথা গেল না—মোগলবাদশাহ তাহাদিগকে কতকগুলি নূতন ক্ষমতা প্রদান করিয়াছিলেন, এবং শাসননীতির নূতনরূপে সংস্কার করিয়াছিলেন।

কৃষ্ণগোবিন্দবাবু জীবনে যে সকল পাপ করিয়াছিলেন, তাহা ধৌত করিবার জন্য জামাতা মোহনলালকে সমস্ত সম্পত্তি দান করিয়া সস্ত্রীক বৃন্দাবনধামে গিয়া বসতি করিলেন। বিশাখা তাঁহার সঙ্গে গমন করিয়াছিল।

মহামায়ার বিশ্বাস সত্যে পরিণত হইল, ব্রহ্মচারীর আত্মা তাহার স্বামীর পতিত আত্মাকে উন্নত করিয়া দিয়া গেল। পরলোকে সকল সংবাদ প্রত্যক্ষ করিয়া মোহনলাল জীবনাবশিষ্ট কাল ধর্ম্ম-কর্ম্ম আলোচনায় অতিবাহিত করিয়াছিল। মদ ছাড়িলে ব্যাধিও ছাড়িয়াছিল। নীরদা জীবনাশক্তি সংযত করিয়া মহামায়ার নিকটেই ছিল।

বসন্তরাণী বঙ্গভূমিতে বৈধব্য ব্রহ্মচর্য্য ব্রত প্রতিষ্ঠা ও প্রচার-জন্য তর্কালঙ্কারের নিকট ছিল।